নিবেদন।

পূর্ব্বপ্রকাশিত 'ফোয়ারা'র ন্যায় 'পাগলা ঝোরা' সম্বন্ধেও লেখকের আকিঞ্চন,—'ইহাতে আধিব্যাধি-শোকতাপ-ক্লিষ্ট সংসার-পথিকের এক দণ্ডের তরেও কি শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হইবে না'? 'ফোয়ারা'র ন্যায় এই পুস্তকেও অনেক স্থলে পরিহাস ও স্থানে স্থানে সরল সত্য কথা আছে; কোন্‌টুকু 'পরিহাস' ও কোন্‌টুকু 'পরমার্থ' তাহা অবশ্য রসজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন। যদি কোন গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠক 'পরিহাস'কে 'পরমার্থ' ভ্রম করিয়া লেখককে বিড়ম্বিত করেন, তাহা হইলে বলিতে বাধ্য হইব,—

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং   শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

'ফোয়ারা'র পুনর্মুদ্রিত রচনাগুলি ১৩১১ সাল হইতে ১৩১৭ সাল পর্য্যন্ত মাসিক-পত্রাদিতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত রচনাগুলি ১৩১৮ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত মাসিক-পত্রাদিতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশের তারিখের পৌর্ব্বাপর্য্য-অনুসারে রচনাগুলি সাজাইবার চেষ্টা করি নাই, কেন না, অনেকগুলি রচনা পরে প্রকাশিত হইলেও পূর্ব্বে লিখিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতে পারি, ১৩২৩ সালে প্রকাশিত রচনাগুলি প্রকৃতপক্ষে ২।১ বৎসর পূর্ব্বে খসড়া-আকারে ছিল, সময়াভাবে পরিষ্কার করিয়া লেখা হয় নাই। এইরূপ খসড়া-আকারে এখনও ২।৪ টি রচনা রহিয়াছে; কখন সম্পূর্ণ হইবে কি না জানি না।

আমোদর শর্ম্মা, বহুরূপী ও (মৃণালের) হেমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত রচনাগুলি সাহিত্যের সমজদারগণ বর্ত্তমান লেখকের লেখনীপ্রসূত বলিয়া সাব্যস্থ করিয়াছেন। যখন 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত' হইয়াছিলেন, তখন এক্ষেত্রেও দশের রায় মাথা পাতিয়া লইয়া উক্ত রচনাগুলি এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিলাম। তবে এইটুকু অভয় যাচ্ঞা করি যে, আমি যেমন তাঁহাদিগের অভিমত শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাদিগের মুখরক্ষা করিলাম, ভবিষ্যতে যদি এইসকল রচনার কোন দাবীদার যোটে, তখন যেন তাঁহারা আমার মুখরক্ষা করেন!

পুস্তকখানি হাস্যরসে আরম্ভ করিয়াছি, করুণরসে শেষ করিয়াছি। কিন্তু এই অসঙ্গতির জন্য আমি দায়ী নহি। বিশ্বেশ্বরের বিধানে আমার হাসির ফোয়ারা শুকাইয়াছে, চক্রীর চক্রে হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে, 'শ্যামের বাঁশী' মহাকালের বিষাণে পরিণত হইয়াছে, তাই সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পাগলা ঝোরা'র 'দুঃখগাথা'র ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—

'পরাণ ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে,
ছন্দছাড়া আজ্‌কে আমি যাচ্চি ম'রে মনের দুখে;
যাচ্চি ম'রে মনের দুখে পূর্ব্বসুখে স্মরণ ক'রে;
ঝারির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়্‌ছি ঝ'রে।'

কলিকাতা।
চৈত্র-সংক্রান্তি ১৩২৩

শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা।

উৎসর্গ।

যাহার নবীন-জীবনের সংস্পর্শমাত্রে
আমার শুষ্ক-জীবনে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ-উল্লাসে
সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ-চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছিল
ও
যাহার তিরোভাবে
এই শূন্যপ্রাণে আনন্দ-আবেগ চিরদিনের তরে তিরোহিত হইল ;
সেই শিশিরের মত নিষ্কলুষ ও অল্পায়ুঃ,
কৃতী ও কৃতবিদ্য, পরলোকগত প্রিয়পুত্র
৺শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এর
উদ্দেশে
এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম।

আঠারো ধারা

পাগলা-ঝোরা।

তামাকু-তত্ত্ব। *

(ভারতী, আশ্বিন ১৩২০)

'তামাক' একটি সর্ব্বজনবিদিত বস্তু। প্রাদেশিক ভাষায় ইহাকে 'তামুক' ও 'তামকুড়ু'ও বলে। আবার কলিকাতা অঞ্চলে যখন 'তামা' 'তাঁবা' হইয়া পড়িয়াছে, তখন তামাকেরও 'তাঁবাক' হইবার কথা; হইলে বিলাতি tobaccoর ও আদিম মার্কিন নাম tabaccoর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধিও হইত। 'তামাক' শব্দের অর্থ লইয়াও একটু গোল আছে, গাঁজা-খোরেরা গাঁজাকে 'বড় তামাক' নামে অভিহিত করেন! যাহা হউক,

নামে কি করে,
গোলাপে যে নামে ডাক, মধু বিতরে॥

তবে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজী কবিতার ভাষায় যেমন poetic diction বলিয়া একটা স্বতন্ত্র রীতি ছিল, সেইরূপ অস্মদ্দেশেও অনেক মনীষীর মতে সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিজস্ব ভাষা আছে। সে ভাষায় তামাকের নাম 'তামাকু'।(১) সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এই নামটি

---

* 'ফোয়ারা'য় 'পত্নীতত্ত্বে' ভোজনের ও 'পাণে' মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু অনবধানবশতঃ ধূমপানের ব্যবস্থা করি নাই। এক্ষণে সেই ত্রুটি সংশোধন করিলাম।

(১) তামাকুর শেষে 'কু' দেখিয়া কেহ 'কু' ভাবিবেন না, 'মাকু'র কুস্বপ্নও দেখিবেন না।

পছন্দ করিয়াছেন। আমরাও "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই নীতির অনুসরণ করিলাম।

কেহ কেহ এমন উপাদেয় বস্তুকে গ্রাম্য নামে নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া—(বিলাতী tobaccoর সঙ্গে সকল সম্পর্ক রহিত করিবার অভি-প্রায়ে ?)—'তাম্রকূট' এই সংস্কৃতায়িত শব্দটি উদ্ভাবন করিয়াছেন। অবশ্য (মোরগ) 'তাম্রচূড়ে'র সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। অনুমান হয়, 'তামরস' (পদ্ম) ও 'কালকূট' (বিষ) এই উভয় শব্দের সমন্বয় করিয়া কোন রসিকচূড়ামণি এবংবিধ নামকরণ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ দ্রব্যটি পদ্মমধু নহে, পদ্মবিষ !(২) যেমন মিঠেকড়া তামাকু সুখসেব্য, তেমনই এই মিঠেকড়া নামটিও সুভব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক, শব্দশক্তি-প্রকাশিকা বা ব্যাকরণ-বিভীষিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিব না। সে মায়া কাটাইয়াছি, আর সে জালে ধরা দিব না। এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

জগতে ধর্ম্মও যেমন বহু, নেশাও তেমনই বহু। সকল ধর্ম্মই যেমন একই আনন্দস্বরূপের সন্ধান মিলায়, সকল নেশাও তেমনই একই আনন্দ-স্বরূপের সন্ধান মিলায়। সকল ধর্ম্মেরই যেমন গোঁড়া আছে, সকল নেশারও তেমনই গোঁড়া আছে। তামাকু-সেবী যেমন বলেন—"গুড়ুকে গম্ভীরবুদ্ধি", তেমনই সিদ্ধি-সেবী অর্থাৎ ভাং-খোর(৩) বলেন—"সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে", গাঁজাখোর বলেন—"নেশার রাজা গাঁজা", "গাঁজা তোর পাতায় পাতায় রস।" তাই তিনি আদর করিয়া তাঁহার আরাধ্যদেবকে 'তুরিতানন্দ' নাম দিয়াছেন। গুলিখোর তাঁহার প্রিয়নিকেতনকে 'মুক্তি-

---

(২) এইজন্যই কি 'বিষবৃক্ষে' ঘন ঘন তামাকুর কথা আছে ?

(৩) ভাংখোর ও ভাঙ্গোর কি একই ? সদাশিব জানেন।

মণ্ডপ' বলেন। আফিংখোর(৪) তাঁহার পেয়ারের পদার্থকে 'কালাচাঁদ' আখ্যা দিয়াছেন। আহা কি মধুর বৈষ্ণব ভাব (অথবা 'বিশুদ্ধ' বাঙ্গালায়, বৈষ্ণবী ভাব)! কোকেনের হাল বড় জানা যায় না, বোধ হয় এতদিন কোন কোকেনখোর কবি ছড়া বাঁধিয়াছেন—

"ফাঁকে ফোঁকে কোকেন ফোকেন।
ঝোঁকে ঝোঁকে সগ্‌গে (স্বর্গে) ঢোকেন॥"

তাহার পর, সকলের সেরা সাখরচে-নেশার ভক্তগণ নিজের সম্প্রদায়ের বাহিরের লোককে নিতান্ত কৃপাপাত্র মনে করেন ও "চাষা না জানে মদের স্বাদ", "মদের মর্ম্ম বুঝবি কি রে বাঙ্গাল তোরা" ইত্যাদি বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। তাঁহাদের মতে, যাহারা সুরাসেবী নহে তাহারা অ-সুর! কেহ কেহ বা ভক্তির ভান করিয়া রামপ্রসাদকে ভেংচাইয়া গান ধরেন—

'সুরাপান করি নে রে, সুধা খাই যে কুতূহলে।' কেহ বা চণ্ডীপাঠ করিয়া শোধন করিয়া লইতেছেন ও অ-সুরগণকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেছেন,—

'গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।'

কেহ বা

'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা ধরণী-তলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা'

'সদ্যো মোক্ষ' লাভ করিতেছেন, জড়িতকণ্ঠে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ভৈরবীচক্র

(৪) ইংরেজ আফিংখোরের রাজা De Quincey উচ্ছ্বাসভরে বলিয়াছেন,— 'Thou hast the keys of Paradise, oh, just, subtle and mighty opium'. উক্ত লেখকের বিখ্যাত পুস্তকের The pleasures of opium নামক সমগ্র পরিচ্ছেদ পঠিতব্য। তবে সঙ্গে সঙ্গে The pains of opium নামক পরিচ্ছেদটিও পড়িয়া রাখা ভাল। কেননা, সাবধানের মা'র নাই।

ও পঞ্চমকারের দোহাই দিতেছেন, এবং কৌল, অঘোরী, বামাচারী বা বীরাচারী সাজিয়া, যাহারা 'মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্' বলে তাহাদিগকে 'পশু' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন ; আবার কেহ বা বেদোক্ত সোমরসের ভাণ্ডে সুরা রক্ষা করিতেছেন। (ইহাকেই কি বাইবেলে বলে—pouring new wine into old bottles ?)

গোঁড়ারা যাহাই বলুন, আমার কিন্তু মনে হয়, অন্যান্য হরেক রকম নেশার তুলনায় তামাকু বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ নেশা। যেমন নরমাংস, গোমাংস, শূকরমাংস, কুক্কুটমাংস প্রভৃতি অমেধ্য মাংসের তুলনায় মৃগমাংস বা ছাগমাংস, সেইরূপ মদ তাড়ী গাঁজা গুলি চরস চণ্ডু আফিম ভাঙ্গ মাজুম কোকেন প্রভৃতির তুলনায় নস্য ও তামাকু। আবার তামাকু-সেবনের নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে গুড়ুক টানাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা শুধু গন্ধটুকুই পান তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে, খাস অম্বুরী খাম্বিরা তামাকুর সদ্‌গন্ধ যজ্ঞ-ধূমের সহিত তুলনীয়,আর চরস-গাঁজা, বিড়ি বার্ডসাইএর ধূম শ্মশানের ধূমের মত। মদ বা তাড়ির গন্ধে ত অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়।

মানুষ নানামূর্ত্তিতে 'সর্ব্বশ্রম-সংহারিণী তামাকুদেবী'র(৫) ভজনা করে। শুখা দোক্তা খৈনি স্ফূর্ত্তিরগুলি চুরট সিগরেট বার্ডসাই তামাক-পোড়া গুল নস্য সবই তামাকুর রূপান্তর। বেদজ্ঞের মুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদের ন্যায় চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া-ছিলেন—তামাকুর্জড়াকুর্গুড়াকুর্নাসাকুঃ। অস্যার্থঃ—তামাকু অর্থাৎ শুখা দোক্তা খৈনি। জড়াকু অর্থাৎ জড়ান তামাকপাতা যথা, চুরট সিগরেট বিড়ি বার্ডসাই। গুড়াকু অর্থাৎ গুড় দিয়া মাখা গুড়ুক-তামাক। নাসাকু অর্থাৎ নস্য। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'যে

---

(৫) বিষবৃক্ষ ১০ম পরিচ্ছেদ। এই প্রসঙ্গে উক্ত পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত তামাকু-দেবীর স্তবটি পঠিতব্য।

যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।' অর্থাৎ কিনা 'যে ভাবে দেখিবে কৃষ্ণে সেই ভাবে পাবে।' কিন্তু যেমন শ্রীভগবানের নানা মূর্তির মধ্যে দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্তিই শ্রীচৈতন্যের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, সেইরূপ তামাকুর নানা মূর্তির মধ্যে গুড়ুক-মূর্তিই চৈতন্যশীল জীবের সমধিক প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। ইংরেজ কবি বায়রন হুকার গুণগান করিয়াও চুরটের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার উপাদেয় কবিতাটি পাদটীকায় উদ্ধৃত করিলাম।(৬) কিন্তু তাঁহার ন্যায় ম্লেচ্ছের সিদ্ধান্ত আমরা হিন্দুসন্তান ঋষিবাক্য(৭) বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারি না। আমরা নব্যবঙ্গের শিক্ষাদীক্ষার গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ে রায় দিয়া গুড়ুক-তামাকেরই জয়-ঘোষণা করিব।

কেহ কেহ হুকার হুঙ্কার-জনক নাম শুনিয়া হয়ত নাসিকা সঙ্কুচিত করিবেন অর্থাৎ নাক সিট্‌কাইবেন। তাঁহাদিগকে পরবর্তী শ্লোকদ্বয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

---

(৬) Sublime tobacco ! which from east to west
Cheers the tar's labour or the Turkman's rest,
Which on the Moslem's Ottoman divides
His hours, and rivals opium and his brides ;
Magnificent in Stamboul, but less grand,
Though not less loved, in Wapping or the Strand ;
Divine in hookas, glorious in a pipe,
When tipped with amber, mellow, rich and ripe ;
Like other charmers, wooing the caress
More dazzlingly when daring in full dress,
Yet thy true lovers more admire by far
Thy naked beauties—Give me a cigar.—*The Island.*

(৭) ইদানীং "সনাতনী পন্থা"র জনৈক প্রবীণ হিন্দু দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে ম্লেচ্ছর্ষি আবিষ্কার করিয়াছেন। বোধ হয় দিব্যজ্ঞানের মাত্রা আর একটু চড়িলে তিনি আকাশ-কুসুম শশশৃঙ্গ বন্ধ্যাপুত্র—এমন কি ডুমুরের ফুল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন।

ব্রহ্মা কমণ্ডলুমথো ভগবান্ স্ববংশীং
ধুস্তূরপুষ্পমদদাৎ শ্রবণান্ মহেশঃ।
ইত্থং ত্রিভিঃ স-কলিকা রচিতা হি হুক্কা
পূর্ব্বং পুরন্দরসদস্যমরানুরোধাৎ ॥
লোকানাং গদশান্তয়েঽজনি ভুবি শ্রীতাম্রকূটামৃতং
ব্রহ্মাদাৎ স্বকমণ্ডলুং শ্রবণতোধুস্তূরপুষ্পং শিবঃ।
দৈত্যারি র্মুরলীঞ্চ বহ্নিবরুণৌ তত্রাবতীর্ণৌ স্বয়ম্
বীণায়াং কিমু নারদো গুরু গুরু ব্রহ্মাক্ষরং গায়তি ॥

ইহা হইতে তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, এই ধূম-যন্ত্রের অংশত্রয় খোল, নল্‌চে ও কলিকা যথাক্রমে ব্রহ্মার কমণ্ডলু, নারায়ণের বংশী ও মহাদেবের কর্ণভূষণ ধূতুরাফুলের রূপান্তর—অতএব হিন্দুর চক্ষে পরম-পবিত্র। গল্প আছে যে, পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই মানুষের প্রেতাত্মা ঠিক আড়াই দণ্ডে যমালয়ে পৌঁছিয়া যায়, স্থানের দূরত্বের তারতম্য অনুসারে কালের তারতম্য হয় না; এই বিষয়ে খট্‌কা বাধাতে গুরু শিষ্যকে বুঝাইয়াছিলেন যে, যেমন হুকাই হউক আর গড়গড়াই হউক আর ফরশী আল্‌বোলাই হউক, সকল ধূমযন্ত্র হইতে ঠিক এক টানেই ধূম নির্গত হয়, এই রহস্যও তদ্‌বৎ। কিন্তু আমরা যমালয়-প্রয়াণের সহিত ধূমপানের তুলনা অনুচিত বিবেচনা করি। আমরা বলি, কাশীযাত্রা যেমন লুপলাইন, কর্ডলাইন, গ্র্যাণ্ড কর্ডলাইন তিন পথেই হয়, ধোঁয়াযাত্রাও সেইরূপ হুকা, গড়গড়া ও ফরসী তিন পথেই হয়। হুকা গ্র্যাণ্ড কর্ড, সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথ—আমপাতার নলটি মোগলসরাই হইতে কাশী ফ্যাংড়া লাইনটুকু; গড়গড়া কর্ডলাইন, আর—ফরশী লুপলাইন। (কুণ্ডলায়িত সট্‌কা লুপের প্রতিরূপ নহে কি?)

জানি, তামাকু-সেবনের অপকারিতা-সম্বন্ধে বিস্তর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-

নিবন্ধ পুস্তকপুস্তিকা লিখিত হইয়াছে। তৎপাঠে ধূমপানবিরত নিরীহ ভদ্রসন্তানগণ যথেষ্ট বুকে বল পাইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির দাপটে এ পর্য্যন্ত কোন ধূমপায়ী তামাকু ছাড়িয়াছেন, এরূপ কোন রিপোর্ট বা রিটার্ন পাই নাই। দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার অভাবেই অবশ্য এ সব যুক্তিতর্ক মাঠে মারা যাইতেছে। সেই জন্যই, বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ্ আপামর সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-প্রচারকল্পে যে ব্যবস্থা করিতে অভিলাষী, তাহা অত্যন্ত সমীচীন মনে করি।

ইহাও জানি যে, অনেকে তামাকুর নিষ্কারণ-শত্রু—এজগতে কোন্ বস্তু বা ব্যক্তির বিরুদ্ধবাদী নাই? যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও শত্রু ছিল, তখন 'উৎকৃষ্ণ' তামাকুরও যে শত্রু থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সুরাপান-নিবারিণী, নীলফিতাধারিণী, সুনীতিসঞ্চারিণী, সর্ব্ব-নেশা-সংশোধিনী প্রভৃতি সভার সভ্যগণ তামাকুকেও মদ তাড়ি গাঁজা গুলি চরস চণ্ডু ভাঙ্গ আফিম মাজুম কোকেনের(৮) সঙ্গে একগোত্র (অর্থাৎ এক গোঠের গরু) বলিতে প্রস্তুত।

যাহা হউক, এরূপ লোকনিন্দা সত্ত্বেও তামাকু-সেবনের প্রথা যে কস্মিন্ কালে পরিত্যক্ত হইবে, তাহার কোন লক্ষণ দেখি না। বহু লোকের বিশ্বাস যে, তামাকু আবহমান কাল এদেশে প্রচলিত আছে। ইহা যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মার্কিন মুল্লুক হইতে ইউরোপে ও ইউরোপ হইতে এসিয়া-খণ্ডে আমদানী হইয়াছে, আমরা ম্লেচ্ছের ভুক্তাবশিষ্ট মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে খাইতেছি, এই ঐতিহাসিক তথ্য বহু হিন্দু আমলে আনেন না। প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণার উপর কি বিকট বিতৃষ্ণা!

---

(৮) কেহ কেহ বা টানের চোটে কাফি কোকো চা এমন কি সোডা-লেমনেড্‌কেও ঐ দলে ফেলেন। ঘোলের সরবতটা বাকী থাকে কেন?

বাস্তবিক এই নির্দ্দোষ অথচ আয়েসী নেশার সত্যযুগে সৃষ্টি হইয়াছে,—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ইংরেজ কবি কূপার (Cowper) একস্থলে বলিয়াছেন যে, তামাকু সত্যযুগে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু সে কোন কাযের কথা নহে।

সহৃদয় ইংরেজ-জাতি প্রথম হইতেই তামাকুর গুণগ্রাহী। তামাকু সত্যযুগে সৃষ্ট হউক আর না হউক, ইহা যে স্বর্গীয় বস্তু, এ কথা বহু ইংরেজ লেখক একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। তবে অবশ্য ইঁহাদিগের দৌড় চুরট ও পাইপ পর্য্যন্ত, গুড়ুকমাহাত্ম্য ইঁহাদিগের অজ্ঞাত। রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলে বিলাতে তামাকুর প্রথম প্রচলন হয়। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি স্পেন্‌সার ('divine tobacco') 'দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় তামাকু' বলিয়া ইহার গুণগান করিয়াছেন। তখনকার নাটক-কারেরাও তামাকুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।(১) কর্ম্মবীর র‍্যালে, হকিন্‌স্, ড্রেক প্রভৃতি সকলেই তামাকুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। র‍্যালে যখন বধ্যভূমিতে নীত হয়েন তখনও ধূমপান করিয়া 'জরামরণমোক্ষায়' ইত্যাদি গীতার বচন সার্থক করিয়াছেন। বিলাতে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে রাজবিধি দ্বারা তামাকুসেবীদিগকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ভক্তগণ অবিচলিত ভক্তিসহকারে কমলাকান্তের ন্যায় 'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ' এই নীতিবাক্য অনুসরণ করিয়াছিলেন। এলিজ্যাবেথের উত্তরাধিকারী প্রথম জেম্‌স্ অসূয়াপরবশ হইয়া তামাকুর অযথা নিন্দাবাদ করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে হাতে হাতে ফলও পাইতে হইয়াছিল। প্রজাগণ চক্রান্ত করিয়া সুরঙ্গের মধ্যে বারুদে আগুন লাগাইয়া তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিবার অভিসন্ধি

(১) কেবল শেক্‌স্‌পীয়ার এ বিষয়ে নীরব ছিলেন। ইহাকে কি 'Silence is gold' বলিব?

করিয়াছিল। মাতৃপুণ্যবলে তিনি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তাঁহার পণ্ডিত-মূর্খ (the wisest fool in christendom) অপবাদ ঘুচে নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে সুপণ্ডিত বর্টন (Burton) ও বার্ক্লে (Barclay) তামাকুকে 'সর্ব্বাতিশায়ী সর্ব্বব্যাধিহর সুদুর্লভ' 'সকল গাছের রাণী' 'পবিত্র' 'স্বর্গীয়'(১০) প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কূপর যদিও একটা কাঁচা কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তামাকু সত্যযুগে অজ্ঞাত ছিল, তথাপি তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে এই ঘোর কলিকালে তামাকুবিহনে জীবনের ভার দুর্ব্বহ হইত।(১১) ঊনবিংশ শতাব্দীতে বায়রন তামাকুর গুণগান করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছি। তাঁহার মতে তামাকু 'মহতো মহীয়ান্' ('Sublime')। চার্লস্ ল্যাম্ব বায়রনের

---

(১০) "divine, rare, super-excellent tobacco which goes far beyond all the panaceas, is a sovereign remedy in all diseases"—*Burton.*

'The princess of all plants', 'this sacred herb,' 'this heavenly plant', 'divine tobacco'—*Barclay.*

(১১) "Tobacco was not known in the golden age, so much the worse for the golden age. This age of iron, or lead, would be insupportable without it."—*Cowper.*

এই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। (দেবীচৌধুরাণী, ১ম খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।) 'সর ওয়াল্‌টর রালের আবিক্রিয়ার পর, কোন্ বুড়া তামাকু ব্যতীত এ ছার, এ নশ্বর, এ নীরস, এ দুর্ব্বিষহ জীবন শেষ করিতে পারিয়াছে? আমি গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মরা ভাল হয় নাই—তার আর কিছু দিন থাকিয়া এই পৃথিবীর দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করাই উচিত ছিল।'

বিপরীত প্রকৃতির লোক হইলেও তামাকুর অকপট অনুরাগী ছিলেন; চিকিৎসক-কর্ত্তৃক তামাকু-সেবনে নিষিদ্ধ হইয়াও তিনি ভক্তির মাত্রা অণুমাত্র কমান নাই। তবে চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। তাই ল্যাম্বের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে সুরাপানের কালিমা দৃষ্টিগোচর হয়। টেনিসন, বকল, কার্লাইল, এমারসন প্রভৃতি জ্ঞানিগণ তামাকুর গুণানুরক্ত ভক্ত ছিলেন। একজন অজ্ঞাতনামা কবি ধূমপান করিতে করিতে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি তামাকুর ভিতর অধ্যাত্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইংরেজীরসজ্ঞ পাঠককে কবিতাটি উপহার দেওয়ার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

SMOKING SPIRITUALISED.

This Indian weed, now withered quite,
Though green at noon, cut down at night,
Shows thy decay ;
All flesh is hay.
Thus think, and smoke tobacco.

The pipe, so lily-like and weak,
Does thus thy mortal state bespeak ;
Thou art e'en such,—
Gone with a touch.
Thus think, and smoke tobacco.

And when the smoke ascends on high,
Then thou behold'st the vanity

Of worldly stuff
Gone with a puff.
Thus think, and smoke tobacco.

And when the pipe grows foul within,
Think on thy soul defiled with sin ;
For then the fire
It does require.
Thus think, and smoke tobacco.

And seest the ashes cast away,
Then to thyself thou mayest say,
That to the dust
Return thou must.
Thus think, and smoke tobacco.

কবি-শক্তির অভাববশতঃ ইহার পদ্য-অনুবাদ করিয়া পাঠকের মনস্তুষ্টি করিতে পারিলাম না দেখিয়া, আমার কর্ম্ম-সহচর (Colleague) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী কর এম এ মহাশয় কৃপাপরবশ হইয়া কবিতাটির একটি পদ্য অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

ধূমপানের অধ্যাত্মতত্ত্ব।

আজি রসহীন বিশীর্ণ মলিন
যে ছিল যৌবনে সরস নবীন
শুষ্ক পর্ণ হায় হৃদয়ে জাগায়—
নশ্বর এ দেহ ক্ষুদ্র তৃণ-প্রায়!

ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

(যেন) নলিনীর দল দুর্ব্বল এ নল—
ভঙ্গুর এ দেহ বলে অবিরল
তোমারো এমতি জীবনের গতি
একটি পরশে ফুরাবে নিয়তি !
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

ধূমের কুণ্ডল লক্ষি নভস্তল
উঠিবে যখন বুঝিবে সকল—
এ ধরা-বৈভব বৃথায় গৌরব
একই ফুৎকারে বিনষ্ট সে সব।
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

(হেরি) নলের ভিতর ক্লেদ থরে থর
পাপে কলুষিত তোমারো অন্তর
স্মরিও তখন ; অনল পাবন
করিতে নির্ম্মল হয় প্রয়োজন।
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

(যবে) ভস্মে পরিণত দূরে নিক্ষেপিত
হেরি, আপনারে বলিবে নিয়ত—

এই সুকুমার দেহ, এ ধূলার,
হবে পরিণত ধূলায় আবার।
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

কেহ কেহ বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্র দত্তের মত, তামাকও খান মদও খান—যেমন গদাধরচন্দ্র দুধও খাইত, তামাকও খাইত। কিন্তু আমরা এইরূপ দুই নৌকায় পা দেওয়া নিরাপদ্ মনে করি না। কেহ কেহ বা কৃষ্ণকান্ত রায়ের মত তামাকু ও আফিম উভয়ের সমন্বয়-সাধনে সদাপ্রয়াসী। তাঁহাদিগের মতে, যেমন ত্রেতায় রামলক্ষ্মণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবলরাম, কলিতে গৌরনিতাই ধর্ম্মতত্ত্বে দ্বন্দ্বভাবে বিরাজিত, তেমনই নেশাতত্ত্বে তামাকু ও আফিম। ইহা শক্তিসাধনায় আমিষ ও নিরামিষ বলির ন্যায়, অথবা দাবা খেলায় দুযোড় হইয়া বসার ন্যায় হইলেও, এরূপ দোরোখা ধরণ আমাদের মনঃপূত নহে। যাঁহারা আফিম ও মদ একত্র চালাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে De Quincey-র মহাবাক্যটি স্মরণ করাইয়া দিব— I do not readily believe that any man having once tasted the divine luxuries of opium will afterwards descend to the gross and mortal enjoyments of alcohol. এই চিন্তাশীল লেখক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে উভয় নেশার যে তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন, অধিকারীদিগকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কেহ কেহ আবার স্থলপথে জলপথে ও ব্যোমযানে যান। কিন্তু আমরা এরূপ ত্রিমার্গগামী স্বভাবের পক্ষপাতী নহি। অনেকে আবার তামাকুর সকল রূপের (tobacco in any form) পক্ষপাতী। উদার হিন্দুধর্ম্মে যেমন নারায়ণের সকল মূর্ত্তিই পুজিত—(অনেক সম্প্রদায়ে

শুধু কৃষ্ণ বা শুধু রাম পূজিত)—ইঁহাদেরও তেমনি শুকা দোক্তা গুড়ুক তামাক চুরট সিগরেট এমন কি নস্য পর্য্যন্ত বাদ পড়ে না। এরূপ সর্ব্ব-দ্বারী স্বভাবও আমাদের বিবেচনায় সমীচীন নহে। ইঁহাদিগকে 'এক এব সুহৃদ্ হুক্কা' এই বচনটি স্মরণ করাইয়া দিই। ফলতঃ, তামাকু যদি নিরীহ ভালমানুষটি না হইয়া একটা কুরুক্ষেত্র বাধাইতে প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় সে জলদ-গম্ভীর-স্বরে সকলকে বলিত—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ॥

মোট কথা, অভ্যাসযোগ ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ ধ্যানযোগ কর্ম্মযোগ রাজগুহ্যযোগ জ্ঞানকর্ম্ম-ন্যাসযোগ সব গোলযোগের এখানে নিবৃত্তি।

তামাকুপন্থীরা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদিগের সাধনার প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করেন। তদ্‌যথা—

তাম্রকূটং মহদ্‌দ্রব্যং সেবনে চ মহৎ ফলম্।
অশ্বমেধসমং পুণ্যং টানে টানে ভবিষ্যতি॥

শ্লোকটি কল্কিপুরাণে বা মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে অনুসন্ধেয়। তাঁহারা আরও দেখান যে, কলিহুকা ও কলিকা, এবং কলিকাতা, কল্কী অবতার ও কলিযুগোৎপত্তি—এগুলি ভাষাতত্ত্বে নিকটসম্পর্কিত। (আবার ভাষাতত্ত্ব আনিয়া ফেলিলাম। জাত-ব্যবসা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না।)

ফলতঃ তামাকু-সেবন আমাদের দেশের ধাতের সঙ্গে এমন মিশিয়াছে, আমাদের অস্থিমজ্জায় এমন প্রবেশ করিয়াছে যে, কেমন যেন মনে হয় উহা আমাদের নিতান্তই আপনার জিনিশ। আমরা পাণ তামাক(১২) এক কোঠায় বা এক পর্য্যায়ে ফেলি। বরং অশুচি অবস্থায় পাণ খাওয়ার নিষেধ আছে, কিন্তু তামাকু-সেবনের কোন অবস্থায়ই নিষেধ নাই। "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা" ইত্যাদি।

নেশা হইলেও ইহা সাত্ত্বিক নেশা। ভগবান্ নিজ বিভূতিবর্ণনায় যেমন বলিয়াছেন—"বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽহম্" তেমনই আরও বলিতে পারিতেন "নেশানাং তাম্রকূটোঽহম্!" বাস্তবিক, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। অর্থাৎ কলিতে মানুষ অন্নগতপ্রাণ নহে, তামাকু-গত-প্রাণ।

সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে গুড়ুক টানা ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে নস্য লোসা(১৩) নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিরই একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। অতিথি-

(১২) পাণের অপর নাম তাম্বূলে এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়।

(১৩) নস্য লওয়ার অভ্যাস কেবল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অধ্যাপক-শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল (নস্যপ্রিয়াঃ পণ্ডিতাঃ)। এখন ধীরে ধীরে 'সভ্য' সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতেছে। বিলাতে একসময়ে স্ত্রীপুরুষে নস্য লইতেন।

অভ্যাগতকে বা চলিত কথায় এস জন ব'স জনকে তামাকু দেওয়া গৃহস্থের পঞ্চযজ্ঞেরই অন্তর্ভুক্ত।(১৪) যেমন অধ্যয়ন-মধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা, তেমনই তামাকু খাওয়া ও খাওয়ান বর্ণাশ্রমীর অবশ্য-কর্ত্তব্য সদাচার।(১৫)

অধ্যাত্মতত্ত্বের ন্যায় তামাকুতত্ত্বেও অধিকারিভেদ আছে। যেমন উপনয়নাদি সংস্কারের পূর্ব্বে বেদে অধিকার জন্মে না, তেমনই সাবালক না হইলে তামাকু-সেবনেও অধিকার নাই। অনধিকার-চর্চ্চায় স্বাস্থ্য-নাশ ও তৎসঙ্গে ধর্ম্মনাশ হয়, কেননা শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।(১৬) পক্ষান্তরে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধর্ম্মে মতি হয়, তেমনই গুড়ুকেও মতি হয়। বৃদ্ধ বয়সে উভয় প্রবৃত্তিরই গাঢ়তা জন্মে। তাই স্থবির-দিগের এক হাতে জপমালা, অন্য হাতে হুকা।

স্ত্রীলোকের তামাকু-সেবনে অধিকার নাই, কিন্তু তামাকু সাজার অধিকার আছে—যেমন স্ত্রীজাতির প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া দেবার্চ্চনে অধিকার নাই, কিন্তু পূজার আয়োজন করার অধিকার আছে। তবে যেমন নারীজাতির বেদে অধিকার নাই বলিয়া তাহাদিগকে পুরাণ-পাঠের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষেত্রেও নারীজাতি গুড়ুক খাওয়ার পরিবর্ত্তে দোক্তাতামাক, তামাকপোড়া ও গুল ব্যবহার করিতে

---

(১৪) আমরা জানি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর পর নূতন করিয়া তামাকু ধরিয়াছিলেন—পাছে কোন ভদ্রলোক তামাকুর অপ্রচলনে বৈঠকখানায় না বসেন। ইহাই প্রকৃত সাত্ত্বিক তামাকু-সেবন।

(১৫) রঙ্গালয়ে ধূমপান নিষেধ, এইজন্যই কি সুরুচিসম্পন্ন লোকেরা তথায় যান না?

(১৬) ভদ্রঘরের ছেলেরা কখন শৈশবে তামাকু খাইত না, কিন্তু এক্ষণে সিগরেট খাইতেছে। কালের ধর্ম্ম!

পারেন। ব্রহ্মবাদিনীগণের বেদে বিদ্যা ছিল, সেইরূপ মেড়ুয়াবাদিনীগণও গুড়ুক টানে।

লেখক তামাকু-সেবনে লোককে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গ শিখাইতে লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি বিলক্ষণ জানেন, মদ্যমাংসাদির মত, এই বিষয়েও 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।' ফলতঃ তিনি সমাজে যেমন যেমন দেখিতেছেন, তেমন তেমন লিপিবদ্ধ করিতেছেন। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দোষকম্।

হুকা-কলিকা বনাম চুরট সিগরেট।

এক ছিলিম তামাকু সাজিয়া প্রথম একবার টানিবার পর আবার যতবার হাত ঘুরিয়া আসে, ততই তাহা বেশী মজে। সেই হিসাবে, তামাকুতত্ত্বের যতই অধিক বার আলোচনা করা যাইবে ততই তাহা মিষ্ট লাগিবে। তজ্জন্য বক্তব্য শেষ করিয়াও আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিশেষতঃ এখনকার যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সাধারণকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য এই কথাটির অবতারণা না করিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে।

আজকাল দেখিতেছি, হুকা-কলিকার বদলে চুরট সিগরেট বিড়ি বার্ডসাইএর বেশী বেশী চল হইতেছে। এমন কি, যাঁহারা কখন হুকায় মুখ দেন না, তাঁহারাও ফ্যাশানের খাতিরে সিগরেট টানিতেছেন, এরূপ দৃশ্যও বিরল নহে। যুক্তিতর্ক, বাদপ্রতিবাদ, তুলনায় সমালোচনা, প্রভৃতিও হইতে দেখি। যথা—

সৌখীন ছোকরা বাবুরা বলেন,—হুকা-কলিকায় ফৈজত ঢের, বড় লেঠা, নানান্ নটখটি; তামাক-টিকা চাই, হুকা-কলিকা চাই; তামাক হয়ত ভ্যালসা, টিকা হয়ত ভিজা, খোল দিয়া হয়ত জল পড়ে, নলচে হয়ত

বন্ধ, কলিকা হয়ত ভাঙ্গা, জলটা হয়ত ঝাল হইয়া গিয়াছে, ঠিকরে হয়ত কোথায় পড়িয়া গিয়াছে—অনেক অসুবিধা পোহাইতে হয়, অনেক সময় অপব্যয় হয়, হাত নোংরা হয়, যা'র তা'র হুকায় খাইতে গা ঘিন ঘিন করে, মশারি বিছানা পোড়ে, দাড়িতে আগুন ধরে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর—এক প্যাকেট হাওয়াগাড়ি সিগরেট ও এক বাক্স দুয়ানি-মার্কা দিয়াশলাই পকেটে রাখ, বস্, রাজারও রায়ত নও, মহাজনেরও খাতক নও। তোফা আরাম, যত ইচ্ছা জ্বাল আর খাও (প্রায় 'ঢাল আর খাও' এর ধাক্কা)। এই সম্বল লইয়া চাই কি দক্ষিণমে[illegible] (দক্ষিণ দ্বারেরই কাছাকাছি) গেলেও আটক নাই।

পক্ষান্তরে সিগরেটের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। ডাক্তার চুণীবাবু হয়ত বলিবেন, সিগরেটে স্বাস্থ্যের হানিকর অনেক রকম জিনিশ থাকে। কিন্তু এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহারই মত বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক-গণ স্বচ্ছন্দে অকুতোভয়ে সুস্থশরীরে খোসমেজাজে বাহালতবিয়তে সিগরেট টানিতেছেন, তাহাও দেখিতেছি। হুকায় যে ভাবে তামাকু খাওয়া হয়, মাখা তামাকুকে যে ভাবে নরম করিয়া ফেলা হয়, জলের ভিতর দিয়া টানিবার সময় ইহার বিষাক্ত ভাগকে যে ভাবে কাবু করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ইহার উগ্রতা অনেকটা কমিয়া যায়, সুতরাং মাদকতাশক্তিও অনেকটা নষ্ট হয়, ইত্যাদি যুক্তিও প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ হইল বড় বড় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, আমরা অব্যবসায়ী, এ সব কথা আমাদের মুখে ভাল শুনাইবে না। আমাদের সাবেক গুড়ুক খাওয়া ও হালের সিগরেট টানা—এই দুইটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বিজ্ঞানের স্বাস্থ্যতত্ত্বের নজীর তুলিব না, সুনীতির বা সুরুচির দোহাই দিব না। আশা করি, এই মন্তব্য সুধী-সমাজে নিরপেক্ষ ও অপক্ষপাতী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আমার মনে হয়, এই দুইটি সামান্য ব্যাপারের তুলনায় সমালোচনা করিলে ভারতীয় সভ্যতা ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভেদটা বেশ ফুটিয়া উঠে। অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের ন্যায়, এক্ষেত্রেও ভারতীয় সমাজতন্ত্রতা ও ইউরোপীয় ব্যক্তিতন্ত্রতা স্পষ্টীভূত। কথাটা খোলসা করিয়া বুঝাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখুন, সিগরেটে সবই তৈয়ারী থাকে, কিছু করাকর্ম্মার দরকার হয় না, ঠিক যেন হোটেলে খাওয়া। অতএব ইউরোপীয় সমাজের স্পষ্ট ছায়া। তাহার পর সিগরেট একা একা টানিতে হয়, কাহাকেও ভাগ দেওয়া চলে না।(১৭) নিজের পকেট হইতে সিগরেট-কেস ও দিয়াশলাইএর বাক্স বাহির করিলাম, নিজে দিয়াশলাই জ্বালিলাম, নিজে সিগরেট ধরাইলাম (স্বয়ংসিদ্ধ যাহাকে বলে), তা'র পর নিজে হুস হুস করিয়া টানিলাম, আর নিঃশেষ করিয়া টানিতে টানিতে যখন ঠোঁটে ঈষৎ উত্তাপ অনুভব করিলাম, তখন দূরে ছুড়ে ফেলিয়া দিলাম, বস্ আপৎশান্তি। কাহারও তোয়াক্কা নাই, কাহারও খাতির নাই, কাহারও মুখাপেক্ষা নাই, দশজনকে ভাগ দেওয়া নাই। পার্শ্বস্থ ব্যক্তি-বর্গের লাভ—ধূমের যন্ত্রণা, দুর্গন্ধের লাঞ্ছনা ও কচিৎ উড়ো ছাই গায়ে পড়া। ইউরোপীয় সমাজের স্ব-স্ব-প্রধান ভাবের হুবহু নকল। অবশ্য সিগরেট-কেস হইতে বাহির করিয়া এক একটি সিগরেট পার্শ্বস্থ ভদ্রলোকদিগকে দিয়াশলাই সমেত offer করা যায় বটে, কিন্তু এক হুকায় বা এক কলিকায় তামাক খাওয়ার মত ইহাতে তেমন হৃদ্যতা হয় কি ? হুকা বা কলিকা যেমন অসঙ্কোচে গ্রহণ করা যায়, সিগরেট তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে যেন কেমন একটা দীনতা-প্রকাশ হয়।

---

(১৭) কোন কোন স্থলে একটি সিগরেট দুই ইয়ারকে টানিতে দেখিয়াছি—কিন্তু আশা করি আমার পাঠকবর্গের মধ্যে এমন লোক কেহ নাই।

আর তামাকু—এক কলিকা তামাকু অনেকক্ষণ পোড়ে, বহু লোক প্রতিপালন হয়, সিগরেট এক মিনিটে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, একজন বই খাইতে পারে না। তামাকু এক কলিকা সাজ, তৈয়ারি তামাকু দশজনকে পরিবেষণ কর, অপরিচিত লোকও চাহিয়া খাইবে, লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিবে না, মানের হানি হইবে না। ইতর জাতি হইলে কলিকা খুলিয়া প্রসাদ দাও, জাতিভেদের কঠিন নিয়মও তামাকুর কল্যাণে কতকটা শিথিল হইয়া যায়—যেমন 'কয়লাকো ময়লা ছোটে যব আগ করে পরবেশ'। তামাকু সাজিবার সময় কেহ বা হুকার জল ফিরাইল, কেহ বা নল্‌চেয় ছিঁচকে দিল, কেহ বা ঠিকরের চেষ্টায় গেল, কেহ বা টিকে ধরাইল, কেহ বা কড়া ও নরম তামাকু ঠিকমত মিশাইয়া লইল, কেহ বা তামাকু সাজিল, কেহ বা কলিকায় ফুঁ দিল, কেহ বা আমপাতার নল তৈয়ারি করিল, সকলে মিলিয়া মিশিয়া কায করিতেছে—ঠিক হিন্দু-পরিবারের তথা হিন্দু-সমাজের প্রতিরূপ। ফল কথা, ইহাতে কেমন সৌহার্দ্দ্য, কেমন হৃদ্যতা, কেমন অন্তরঙ্গতা, কেমন সামাজিকতা, কেমন 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাব, বলুন দেখি?

তবে দৈবাৎ দুই এক জন লোক দেখা যায় বটে, তাঁহারা অপরের উচ্ছিষ্ট হুকায়, এমন কি অপরের টানা কলিকায়, খান না—যেমন অনেকে স্বপাক ছাড়া আহার করেন না। সেটা অবশ্য নিষ্ঠার পরা কাষ্ঠা, স্পর্শদোষ-পরিহারের উৎকট চেষ্টা, অথবা বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ব্যাসিলি-নিবারণের বিধিমত ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার, অতএব ধর্ত্তব্য নহে। ফরশি আলবোলা গড়গড়া গুড়গুড়ির বেলায় এরূপ বারইয়ারি ভাব থাকে না বটে, ওসব যন্ত্রও নিতান্ত নিজস্ব (বা reserved)—কিন্তু সেটা বড়মানুষি, আমীরি। বঙ্কিমচন্দ্র পদগৌরব ও বংশ-গৌরবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেবেন্দ্র দত্ত,

কৃষ্ণকান্ত রায়, রমণ বাবু, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি ধনীদিগের প্রসঙ্গে আলবোলা গড়গড়া সট্‌কার গুণ গায়িয়াছেন। আমরা 'রামচাঁদ শ্যাম-চাদে'র মত সাধারণ গৃহস্থের কথাই বলিতেছি।(১৮)

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গুড়ুকের পূর্ব্ববর্ণিত সামাজিকতা গুণ থাকাতে কেহ বাড়ী আসিলে আমরা তাহাকে তামাকু সাজিয়া দিয়া অভ্যর্থনা করি। (ইদানীং চা ও সিগরেট এই সনাতনী প্রথার লোপ করিতে বসিয়াছে।) অতএব, যাঁহারা প্রাচীন সমাজের পক্ষপাতী, আশা করি, তাঁহারা পূজার বাজারে স্বদেশীমেলায় এক আধ সের ফৌজদারী বালাখানার মিঠেকড়া তামাকু কিনিয়া পল্লীভবনে ফিরিবেন ও দশজন প্রতিবেশীকে খাওয়াইয়া হিন্দুগৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। বলা বাহুল্য, আমার এই অনুরোধ খাঁটি নিঃস্বার্থ পরোপকার—কেননা, 'জনম অবধি হম' 'ও রসবঞ্চিত'। তথাপি যেমন

অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্।
অনধিগত-পরিমলা হি হরতি দৃশং মালতীমালা॥

তেমনি অজ্ঞাতস্বাদ হইলেও মশলাদার তামাকু ঘ্রাণেই আমাকে মস্‌গুল করিয়াছে। আর শাস্ত্রেও আছে—ঘ্রাণেই অর্দ্ধভোজন!†

---

(১৮) ইষ্টমন্ত্রজপ ও পাড়ার বারইয়ারি পূজায় যে প্রভেদ, ফরসী গড়গড়া গুড়্‌গুড়িতে ও হুকায় সেই প্রভেদ। ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্।

† ওল্‌ড্‌ ক্লাবের তৃতীয় সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পঠিত (৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১৩)।

মশক-সঙ্কট।

(সাধক, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২১)

পুরাণাদিতে দেবগণের বাহনের কথা শুনা যায়। কিন্তু

'দেবতা অসুরগণ
ক্রমে হয় অদর্শন
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।'

এই কবিবাক্য যখন কালমাহাত্ম্যে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন বাহনগণের অবস্থা ত আরও শোচনীয়। ভগীরথের মর্ত্তে গঙ্গানয়নের পর হইতে দেবরাজের বাহন ঐরাবতের জারীজুরী ভাঙ্গিয়াছে; এখন তাঁহার প্রপরাপসং-পৌত্রগণ আর রাজোচিত বাহন নহেন, গোরাপল্টনের রসদ বহিতে নিযুক্ত; অথবা, গঙ্গার উপর পূর্ব্বের দাদ তুলিবার জন্য, পুল বাঁধিবার সাজসরঞ্জাম লোহালক্কড় বহিতে ব্যগ্র। উচ্চৈঃশ্রবার অধস্তনগণকে ছেকড়াগাড়ীতে যুতিয়াছে। শিবের বাহন বৃষভের বংশধরগণ মিউনিসিপ্যালিটির ময়লাফেলা গাড়ী টানিতেছে। শীতলার বাহন রজকের ভার বহিতেছে। শমন-বাহন মহিষের কাঁধে যোঁয়াল চড়িয়াছে। গণেশের বাহন মূষিক প্লেগ-ডাক্তারদিগের হিড়িকে ধাঙ্গড়ের হাতে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইতেছে। ভগবতীর বাহনকে চিড়িয়াখানায় পূরিয়াছে। বিষ্ণুর বাহন গরুড়কেও অদ্ভুত প্রাণী বলিয়া তথায় ধরিয়া রাখার চেষ্টা চলিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া ব্রহ্মার বাহন রাজহংস মানস-সরোবরের জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। 'ডুবিয়া অতলজলে রাজহংস মরে।'

সুতরাং এই অরাজক অবস্থায় মশককুল প্রাণিজগতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?

পূর্ব্বকবিগণ মশকমাহাত্ম্য না মানিয়া উহাদিগের সাতিশয় অবমাননা করিয়াছেন। স্বয়ং বেদব্যাস পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড লিখিতে বসিয়া, 'রাবণারি-কথাবার্দ্ধৌ মশকো মাদৃশঃ কিয়ান্' বলিয়া নিজের 'বৈষ্ণব বিনয়' দেখাইতে গিয়া, মশককে নগণ্যজ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বুড়া বামুন বিষ্ণুশর্ম্মা কলমের টানে মশককে খলের সঙ্গে(১) এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া তাহার মানহানি করিয়াছেন। কবির কথায় সাহস পাইয়া বাজে লোকেও 'মশা মেরে হাত কাল করা,' 'মশা মারতে গালে চড়,' 'মশা মারতে কামান পাতা' প্রভৃতি প্রবাদবাক্যে মশার ক্ষুদ্রতা উপলক্ষ করিয়া ফষ্টিনষ্টি করিয়াছে। এই পুনঃ পুনঃ অবমাননায় বিবৃদ্ধমন্যু হইয়া মশক অধুনা সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া 'বাংলার মাটী বাংলার জলে' অবতীর্ণ। 'কা'র সাধ্য রোধে তা'র গতি!' তথাকথিত নিকৃষ্টজাতিকে পদদলিত করিয়া রাখিবার দিনকাল আর নাই!

আসল কথা, মশকের উৎপত্তির প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণে অবগত নহেন বলিয়াই এ সম্বন্ধে লোক-সমাজে অনেক প্রকার হাস্যকর অনুমান (থিওরি) প্রচলিত আছে। সাধারণের ভ্রান্তি-অপনোদনের জন্য, সাহিত্য-পরিষদের সংগৃহীত একখানি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি হইতে নিম্নোদ্ধৃত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"যখন শ্বেতদ্বীপ হইতে সমাগত বীরজাতি বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতবর্ষে প্রথম বসবাস আরম্ভ করিলেন, তখন শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসকদিগের সুচিকিৎসার অমোঘ ফল দেখিয়া ভারতবাসিগণ বিস্ময়াপন্ন ও আনন্দোৎ-

(১) প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসং
কর্ণে কলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রম্ ॥
ছিদ্রং নিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ
সর্ব্বং খলস্য চরিতং মশকঃ করোতি ॥

ফুল্ল হইল। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' তাঁহার নিজ পরিবারমধ্যে উক্তবিধ চিকিৎসার আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ ফলের কয়েকটী উদাহরণ দেখিয়া তাঁহাদিগের গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। (সে সকল ঘটনা ইতিহাসে উঠিয়াছে।) ক্রমে এই জাতি এদেশে রাজ্যস্থাপন করিলে, তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীদিগের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বহুলোক রোগমুক্ত হইতে লাগিল, অকালমৃত্যু একেবারে বাঙ্গালাদেশ হইতে তিরোহিত হইল।

"যমরাজ বৎসরের পর বৎসর প্রেতপুরীতে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ-হ্রাস হইতেছে দেখিয়া, কারণ-অনুসন্ধানের জন্য স্বীয় বাহন মহিষকে ধরাধামে পাঠাইলেন। মহিষ নানা জনপদ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বাঙ্গালাদেশে উপনীত হইল। এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির উর্ব্বরক্ষেত্রসম্ভূত তৃণশষ্পদর্শনে মহিষ নিজকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া পরমসুখে রসনাতৃপ্তিকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। ইত্যবসরে সবল নীরোগশরীর বঙ্গীয় কৃষকগণ ভোজননিরত মহিষকে কৌশলে রজ্জুবদ্ধ করিয়া ক্ষেত্রকর্ষণ হলচালন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিল। মহিষ এই অতর্কিত বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। এইরূপে বহুদিবস গত হইলে, একদিন মহিষ ক্ষেত্রপালকে কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরপ্রস্থিত দেখিয়া সেই অবসরে রজ্জুবন্ধন ছিন্ন করিয়া মহাবেগে স্বদেশ-অভিমুখে ধাবিত হইল এবং নির্ব্বিঘ্নে তথায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রভুর নিকট, নূতন প্রণালীর চিকিৎসার প্রভাবে বাঙ্গালীজাতির স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনলাভের কথা এবং বলিষ্ঠকায় বঙ্গীয় কৃষককুলের হস্তে নিজের নিগ্রহের কথা নিবেদন করিল।

"যমরাজ প্রমাদ গণিলেন। তিনি অবিলম্বে মহিষারূঢ় হইয়া চিন্তাকুলচিত্তে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট প্রয়াণ করিলেন এবং তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিয়া মহিষের প্রমুখাৎ শ্রুত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তচ্ছ্রবণে

মহাদেব একবার চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া যমরাজের বাহনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালাদেশের আর্দ্রভূমির কর্দ্দমাক্ত মহিষ-দেহ হইতে এক মহাকায় বীরভদ্রসদৃশ পুরুষ সমুদ্ভূত হইলেন এবং 'অয়মহং ভোঃ'

'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তু মিহ প্রবৃত্তঃ।'

বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন।

"সেই ভীমদেহদর্শনে ও বিকটহুঙ্কারশ্রবণে যমরাজ এবং তাঁহার বাহন আতঙ্কে কম্পান্বিতকলেবর হইলেন। তখন মহাদেব উভয়কে অভয়-প্রদানার্থ ত্রিশূলাস্ফালনে ভীমদর্শন পুরুষের বিরাট্ দেহ বহুসহস্র সূক্ষ্ম খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। তদ্দর্শনে যমরাজ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। অনন্তর মহাদেব স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে যমরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"'বৎস, আশ্বস্ত হও। এই বীরদেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি বাঙ্গালা দেশে অবতীর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ করিবে, তোমার রাজ্য আবার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। যে বীরপুরুষের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ইহাদিগকে সৃষ্টি করিলাম, তাঁহার প্রতাপে তোমার ও তোমার বাহনের কম্পজ্বর উপস্থিত হইয়াছিল, সামান্য মানব সে অমোঘ প্রতাপ সহ্য করিতে পারিবে না। এই বিবেচনায় সেই বিরাট্ দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সংহারকার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে মহিষদেহ হইতে ইহা-দিগের উদ্ভব, তজ্জন্য নরলোকে ইহারা মষক-নামে(২) পরিচিত হইবে।

(২) 'মহিষের অপভ্রংশ 'মষ' (উচ্চারণ 'মোষ')—তদুত্তর অল্পার্থে কণ্ করিয়া 'মষক' অর্থাৎ মহিষদেহোদ্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব, ইতি ব্যাকরণবিভীষিকাকারের টিপ্পনী। কেহ কেহ যেমন ধ্বংস না লিখিয়া ধ্বংশ লেখেন, পিসি মাসি বা পিষি মাষি (পিতৃষ্বসা মাতৃষ্বসার অপভ্রংশ) না লিখিয়া পিশি মাশি লেখেন; সেইরূপ মষক 'মশক' লিখিত হইয়া থাকে। এটি বাণানসমস্যা। মাহেশ ব্যাকরণে 'মষক' বাণানই আছে।

বাঙ্গালাদেশের আর্দ্র নিম্নভূমির কর্দ্দম ইহাদিগের শরীরের উপাদান, যম-বাহন মহিষের দেহ হইতে ইহাদিগের উদ্ভব, যমালয়ে প্রেরণ ইহাদিগের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য, কম্পজ্বর ইহাদিগের আক্রমণের অবশ্যম্ভাবি ফল, আর—অনুপ্রাসের অনুরোধে, কৃষকগণই মষকগণের আক্রোশের প্রধান পাত্র এবং মাষকলাই মষকের আক্রমণজনিত জ্বররোগের কুপথ্য।'

"মহাদেবের অভয়বাণী শ্রবণানন্তর যমরাজ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মহিষবাহনে হৃষ্টমনে স্বপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।"

ইহাই হইল প্রকৃত মশক-তত্ত্ব। সেই হইতে বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়ার মরসুম। অতএব ম্যালেরিয়ার গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে যথা-বিধি মশক-প্রসাদনের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কবি(৩) বলিয়া গিয়াছেন,—

'জপ তপ আর দেব-আরাধনা
পূজা হোম যাগ প্রতিমা-অর্চ্চনা
এ সকলে এবে কিছুই হ'বে না।'

আমরা সেই তালে তাল দিয়া বলি—

'মশক-রাজেরে কর রে পূজা।'

কবিবাক্যের ভাষ্য করিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, আধিব্যাধি-নিবারণের জন্য আর এখন চণ্ডীপাঠ, শিবস্বস্ত্যয়ন, গ্রহযাগ, নারায়ণ-শিলাকে তুলসীদান ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ফল নাই; এমন কি, শীতলা মনসা ওলাবিবিও আর আমলে আসেন না; এখন নববিজ্ঞানসম্মত রোগনিদান-নির্ণয়ে মশক, মূষিক ও মক্ষিকা এই ত্রিমূর্ত্তি বিরাজিত। "নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে

(৩) কথায় কথায় কবির কথা তুলিতেছি। অনেকে কবিকল্পনাকে নিরবচ্ছিন্ন খেয়াল মনে করেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে কবিরা ত্রিকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ। ইহা শুধু হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত হইলে "শিক্ষিত" লোকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু গোরাগুরু কার্লাইল বলিয়া গিয়াছেন, কবি Seer অর্থাৎ ভবিষ্যদ্রষ্টা। এ প্রমাণ অমান্য করিবে, কোন্ 'শিক্ষিত' লোকের এমন বুকের পাটা?

তুভ্যম্।” ইহা ছাড়া, তেত্রিশ কোটি দেবতার স্থান আজ অসংখ্য জীবাণু (ব্যাসিলি) অধিকার করিয়াছেন। একজন কবি কবুল জবাব দিয়াছেন:— ‘মক্ষিকা সামান্য প্রাণী, কিন্তু তা’রে শ্রেষ্ঠ মানি।’ জানি না, কবে কবিকুল মশকের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেও এইরূপ খোলসা কথা বলিলেন; জানি না, কবে তাঁহারা অন্নদামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, মনসামঙ্গল, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি মামুলী ধরণের কাব্যরচনা ছাড়িয়া মশকমঙ্গলের পালা ধরিবেন।

যাহা হউক, তাঁহাদিগের মুখ চাহিয়া বসিয়া না থাকিয়া, যথাশক্তি মশক-রাজের স্তবপাঠ করিতে চেষ্টা করি।

“হে যমকিঙ্কর ম্যালেরিয়া-জ্বরের জনক মশক, এই অধম অকৃতী জনের পূজা গ্রহণ কর। তোমার দাপটে তোমার এই অনুরক্ত ভক্ত (?) দেশত্যাগী। তুমি প্রসন্ন হও, তোমায় নমস্কার করি। তুমি ক্ষুদ্র হইয়াও বিরাট্‌পুরুষ, ‘অণোরণীয়ান্’ হইয়াও ‘মহতো মহীয়ান্’, কৃষ্ণাঙ্গ হইয়াও প্রবল-প্রতাপ, ক্ষণজীবী ও ক্ষীণজীবী হইয়াও অমরকীর্ত্তি। অতএব তোমায় নমস্কার করি। সত্য বটে, ব্যাঘ্রভল্লূক-বন্যবরাহাদি হিংস্রজন্তু, ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুক্কুর, বিষধর সর্প, মনুষ্যের প্রাণহানি করে; কিন্তু তোমার সংহারকার্য্যের পরিমাণের তুলনায় তাহা যৎসামান্য। অতএব তোমায় নমস্কার করি। সত্য বটে, হস্তিযূথ বঙ্গের কোন কোন অংশে আকস্মিক উৎপাত করে, কিন্তু কচিৎ কখনও তাহাদিগের দ্বারা মানুষের প্রাণ বিনষ্ট হয়; তুমি মহাবল হস্তিযূথ অপেক্ষাও পরাক্রমশালী। অতএব তোমায় নমস্কার করি। সত্য বটে, পঙ্গপাল শস্যনাশ করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ ঘটায়, কিন্তু তাহারা মনুষ্যকে ধনে প্রাণে মারে না; তুমি পঙ্গপাল অপেক্ষাও ক্রূরকর্ম্মা। অতএব তোমায় নমস্কার করি। সত্য বটে, জীবাণু বা ব্যাসিলির বিষে কলেরা বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক ও সাংঘাতিক রোগ সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তোমার লঘুহস্ততার তুলনায়

তাহাদের কৃত লোকধ্বংস নগণ্য। অতএব তোমায় নমস্কার করি। আর ওসব অণুবীক্ষণগ্রাহ্য জীবাণু সাকারবাদী হিন্দুর নিকট কখনও পূজা পাইবে না। অতএব অখণ্ড বঙ্গে তুমিই একমাত্র উপাস্য—'নেদং যদিদমুপাসতে'—তুমিই এই কলিকালে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' অতএব তোমায় নমস্কার করি।

'নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যোঽমিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥''

অনেকক্ষণ ব্যাজস্তুতি করিলাম। এই বার দুইটা শাদা কথা বলিয়া শেষ করি।

কবি নহি যে ভীমবেগে আয়স-লেখনী চালনা করিয়া ম্যালেরিয়া ও মশকের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ ঘোষণা করিব এবং বীররসের অবতারণায় গৌড়-জনকে প্রবুদ্ধ করিব। সুতরাং কবিবন্ধুদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি যে, তাঁহারা দশাননবধ, শিশুপালবধ, মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি মহাকাব্য-রচনায় সময় ও শক্তির অপব্যবহার না করিয়া—('বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার' যে চারিদিকেই)—দেশকালপাত্রোপযোগী 'মশকসংহার' কাব্য লিখুন। আর এই প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়কে করযোড়ে প্রার্থনা করি, 'কুমার-সম্ভবে'র ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ না করিয়া 'মশক মারিলে ম্যালেরিয়া অসম্ভব' এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত চিকিৎসকের সাহিত্যিক কর্ত্তব্য পরিপালন করুন।(৪)

(৪) ডাক্তারেরা পরকে (advice gratis) বিনামূল্যে (অমূল্য ?) উপদেশ দেন। আমরাই বা তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে উপদেশ দিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িব কেন? "কভি লা পর ঘোড়া, কভি ঘোড়ে পর লা।"

আর দেশের আপামরসাধারণকে আহ্বান করিতেছি, আসুন আমরা সমবেত চেষ্টায় মশকের মায়ারূপধারী রাক্ষসের কবল হইতে সোণার বাঙ্গালাকে রক্ষা করি। ঐ শুনুন, বিশেষজ্ঞগণ তারস্বরে বলিতেছেন, এ শক্রর সহিত সম্মুখ-সমরে বর্ম্মচর্ম্ম শিরস্ত্রাণ ধারণ করিতে হইবে না, সামান্য মশারির সাহায্যে শক্র দমন হইবে; ইহার জন্য "তূণীরকৃপাণে পূজা" করিতে হইবে না, শেল শূল ভিন্দিপাল আস্ফালন করিতে হইবে না, পাশুপত অস্ত্র, জৃম্ভক অস্ত্র, একাঘ্নী, নিক্ষেপ করিতে হইবে না, কামান পাতিতে হইবে না, কেবল দিন কতকের জন্য 'তেলা মাথায় তেল ঢালা' বন্ধ করিয়া ক্যানিস্তার ক্যানিস্তার কেরসিন লইয়া খাল বিল ডোবা পুকুরে হুড় হুড় করিয়া ঢালিতে হইবে এবং ঝোপজঙ্গলে বনেবাদাড়ে অগ্নি-সংযোগ করিয়া খাণ্ডবদাহনের পুনরভিনয় করিতে হইবে। 'যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল', তথাপি জননী জন্মভূমির এইটুকু কার্য্য সাধিতে পারিবে নাকি?

বাঙ্গালা দেশের নিরীহ বৈষ্ণবদিগকে বলিতেছি, যদি তাঁহারা ইহা-দিগকে 'কৃষ্ণের জীব' ভাবিয়া এই মশকযজ্ঞে যোগদান করিতে দ্বিধাবোধ করেন, তবে তাঁহারা মশকদমনের জন্য বিরাট্ হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোল তুলুন ও ভক্তিভরে গদ্গদকণ্ঠে বিপদ্ভঞ্জন শ্রীমধুসূদনকে একমনে ডাকুন— "হে হরে মুরারে, মধুকৈটভারে, হে ভূভারহারিন্, সুদর্শনধারিন্, হে কেশিমথন, দৈত্যদলন, কালীয়দমন, কংসনিসূদন, পূতনানিধনকারণ, এই অদ্ভুতকর্ম্মা দৈত্যের গ্রাস হইতে মুক্ত কর। 'নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।'"

আর বাবা ভোলানাথ, সদাশিব, পাগল শঙ্কর, যমরাজের প্রতি আশ্রিত-বাৎসল্যবশতঃ যে সংহারক জীবের সৃষ্টি করিয়াছ, একবার রুদ্রমূর্ত্তিধারণ করিয়া মহাকাল-বেশে তাহার সংহার সাধিয়া 'সপ্তকোটি' বাঙ্গালীকে

নির্ভয় ও নিরাময় কর, তোমার তারকেশ্বর-নাম সার্থক কর। আমরা 'গঙ্গাজলে বিল্বদলে' তোমার পূজা দিব। তবে যদি 'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্' এই নীতিস্মরণে নিজের সৃষ্ট জীবকে নিজে বিনষ্ট করিতে কষ্ট বোধ কর, তবে কুমার-কার্ত্তিকেয়কে তারকাসুরের ন্যায় দুর্দ্দান্ত মশকাসুর-সংহারে নিয়োগ কর। অথবা তোমার ভক্ত সব্যসাচী অর্জ্জুনকে নিবাতকবচের ন্যায় অসংখ্যেয় মশকবংশ ধ্বংস করিতে আদেশ কর।

আর মা কাঙ্গালী বাঙ্গালীর রাজরাজেশ্বরি জননি, দশভুজে দুর্গে, দশপ্রহরণধারিণি, অসুরসংহারিণি, রক্তবীজনাশিনি, শুম্ভনিশুম্ভনিসূদনি, মহিষমর্দ্দিনি তোকেও বলি—মা, যদি বৎসর বৎসর এই বিষম জ্বরের প্রকোপের সময় তোর এত সাধের বাঙ্গালাদেশে আসিস, তবে তোর সন্তানগণের এ দুর্দ্দশা কেমন করিয়া চক্ষে দেখিস মা? মা, সঙ্কটা, জ্বরে জীর্ণ ক্ষীণতনু বাঙ্গালীকে এই মশকসঙ্কটে নিস্তার করিয়া, মহিষাসুরের ন্যায় বীরবিক্রান্ত এই মশকাসুরকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়া, কলিতে আবার চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রকট কর।

মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেহি নমোঽস্তু তে॥
স্তবন্তো ভক্তিপূর্ণং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

শ্যামের বাঁশী।

(নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)

"বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে ত্রিভঙ্গমুরারি শ্যামের রাধানামে সাধা বাঁশী বাজিত—আর সে বাঁশীর স্বরে যমুনা উজান বহিত, ব্রজগোপীগণ কুল-মান লজ্জাভয় ত্যজিয়া, সংসারের খুঁটিনাটি কায ফেলিয়া, নিত্যকৃত্যে জলাঞ্জলি দিয়া, ত্বরিতচরণে, স্রস্তবসনে, আকুলমনে, উদাসপ্রাণে, সেই রাধারমণ বংশীবদনের সঙ্গে মহারাসে মিলিবার জন্য, লীলানন্দরসে মজিবার জন্য, বনপথে ছুটিত, কণ্টক কঙ্কর কুশাঙ্কুর কিছুই গ্রাহ্য করিত না। সাফ কবিকল্পনা! আর কবিকল্পনা যেমন হয়—কালিদাস, শেক্‌স্‌পীয়র, জয়দেব, ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু, সর্ব্বত্র যেমন দেখি—সব আদিরসে ওতপ্রোত, কামিনী ও কামনা তাহার সর্ব্বস্ব। যমুনা উজান বহার কথা ত রঞ্জিকা গঞ্জিকার রঙ্গীন স্বপন, গোপীগণ ফ্রী লভের (free love) সাকারা মূর্ত্তি, আর কৃষ্ণটি একেবারে ডন জুয়ানের দ্বাপরের সংস্করণ! এই সব লইয়া আবার ভক্ত ভাবুক ভাগবতগণ বড়াই করেন—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান'।"(১)

শাক্তবংশে জন্মিয়া, ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া, জনৈক বৈষ্ণব বন্ধুর অনুরোধে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধান্তর্গত রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়াছিলাম ও পাঠান্তে তাঁহার নিকট এই তীব্র মন্তব্য প্রকটন করিতেছিলাম, এমন সময় খঞ্জনী বাজাইয়া গৌরদাস বাবাজী দ্বারে সাড়া দিলেন। বাবাজীর গলা বড় মিঠা, আবার ধরণধারণ অনেকটা হাল ফ্যাশানের। তাই বাবাজী আসিলে আনন্দলাভ করিতাম। আজ কিন্তু ঠিক এই

(১) পাঠক মহাশয়ের নিকট সানুনয় অনুরোধ, এইটুকু পড়িয়াই লাঠি ধরিবেন না, শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া লেখক দণ্ডনীয় কি না স্থির করিবেন।

সময়ে বাবাজীর সাড়া পাইয়া একটু থতমত খাইলাম। বাবাজী সব কথা শুনিয়া ফেলিয়াছে না কি? যদিও আমি ধর্ম্মসম্বন্ধে স্পষ্টবাদী, স্বাধীনচিন্তাশীল, কুসংস্কারবর্জ্জিত বীরপুরুষ (শত্রুপক্ষ নাকি অসাক্ষাতে বলে,—'কালাপাহাড়') তথাপি, কেন জানি না, গৌরদাস বাবাজীকে একটু মনে মনে ভয় করিতাম।

বাবাজী আমাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন—"বাবুজী, পাগলের মত কি কতকগুলা প্রলাপ বকিতেছিলেন, পাষণ্ডের মত কি অজস্র অকথা-কুকথা বলিতেছিলেন?" [উঃ! লোকটার কি বুকের পাটা! আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বজাধারী, আমাকে কি না বলে পাষণ্ড!] "আপনি নাকি শান্তিপুরের পবিত্র মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন? নদীয়ার পুণ্য-ভূমিতে না আপনার নিবাস?" [বাবাজী ভুলিয়াছিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় জগাইমাধাইও নদীয়ার অধিবাসী ছিলেন।] "আচ্ছা, আপনি ত ইংরেজী-বিদ্যাবিশারদ; টেনিসনের খণ্ডকবিতাগুলির রূপক-ব্যাখ্যায় মজবুত ও মসগুল।" [বাবাজী আবার এ সব খবরও রাখে?] "আর আপনার মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার এই শ্যামের বাঁশীর মর্ম্মার্থটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না? ধিক্ আপনার বিদ্যাবুদ্ধিকে!"

আমি কীল খাইয়া কীল চুরি করিয়া বেশ একটু সপ্রতিভভাবেই বলিলাম—" তা' বাবাজী, তুমিই না হয় আমার মত ইংরেজীনবীশকে রাসলীলার গুহ্যতত্ত্বটা বুঝাইয়া দাও। পাষণ্ডকে উদ্ধার করিয়া তোমার গৌরদাস নাম সার্থক কর।" বাবাজী গাঢ়স্বরে বলিলেন—"তবে শ্রবণ করুন।

"এই শ্যামের বাঁশী রণভেরী নহে, জয়ঢকা নহে, 'বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে' নহে, শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্য শঙ্খও নহে; ইহা 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ' বলিয়া মানুষকে কঠোর কর্ত্তব্যপালনে উদ্‌বুদ্ধ করে না, 'যুধ্যস্ব'

বলিয়া জীবকে সংসার-সংগ্রামে আহ্বান করে না, অথবা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত যোগ্যতমের উদ্‌বর্ত্তন (Survival of the fittest) নীতিও ঘোষণা করে না”—[বাবাজীর মুখে ইংরেজী বুলি শুনিয়া তাক্ লাগিয়া গেল। কালে কালে কতই দেখিব !] “ইহা এই শ্যামা জন্মদা কর্ম্মভূমি ভারতভূমির বেণুবনের যদৃচ্ছাজাত বাঁশের বাঁশী। আহা ! সরল বাঁশের বাঁশী কি গুণ জানে !” [বলিতে বলিতে বাবাজী ভাবে গদ্‌গদ হইলেন। ভাবিলাম, এইবার বাবাজীর দশাপ্রাপ্তি হয় আর কি ? যাহা হউক, আমার মত ‘পাষণ্ডে’র নিকটবর্ত্তিতা দশাপ্রাপ্তির তাদৃশ অনুকূল নহে বলিয়াই হউক, অথবা প্রাতে শূন্যোদরে তুরিতানন্দের সেবার সুযোগ পান নাই বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার আরাধ্য দেবতার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য-প্রভাবেই হউক, বাবাজী খুব সামলাইয়া লইলেন।]

সামলাইয়া লইয়া বাবাজী বেশ একটু জোর গলা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

“ব্রজগোপীগণ কেহ ঘরের পাট করিতেছেন, কেহ রান্না চড়াইতেছেন, কেহ দুধ জ্বাল দিতেছেন, কেহ কাপড় কাচিতেছেন, কেহ কুটনা কুটিতেছেন, কেহ বাঁটনা বাঁটিতেছেন, কেহ আহারে বসিয়াছেন, কেহ পতিসেবা করিতেছেন, এমন সময় শ্যামের বাঁশী বাজিল—আর অমনি হাতের কায ফেলিয়া সব উধাও হইয়া ছুটিল—ইহা কি আপনার কাছে নিতান্তই অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় ? ইহা কি আদিরসাশ্রিত অভিসার ভিন্ন আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না ?

“এই আর্য্যভূমিতে চারিযুগ ধরিয়া অসংখ্য সাধুসন্ন্যাসী সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, লোকালয় ত্যাগ করিয়া, গিরিকন্দরে নিভৃতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরমপুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন ও আছেন, তাঁহারা এই শ্যামের বাঁশীর স্বরসুধার আস্বাদ পাইয়াই গৃহত্যাগী হয়েন নাই কি ? এখনকার

রেল-মেল জাহাজ-ষ্টীমারের আমলের সৌখীন তীর্থযাত্রার বহুপূর্ব্ব হইতে কত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী অক্লান্ত কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিয়া, বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করিয়া, দুর্গম পথে পদব্রজে শতসহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া, শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম-দর্শনে চলিতেছে, গয়াকাশী শ্রীবৃন্দাবন নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, হরিদ্বার কনখল, হৃষীকেশ, সাবিত্রী, গঙ্গোত্রী, বদরিকাশ্রম, কেদারখণ্ড, চন্দ্রনাথ, পরশুরামকুণ্ড প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে উপনীত হইতেছে, এই একাগ্রতা ও ঐকান্তিকী ভক্তির ভিতর কি শ্যামের বাঁশীর স্বরলহরীর উচ্চগ্রাম কর্ণগোচর হইতেছে না ?

"অথবা এই জপ তপ ও তীর্থযাত্রাকে যদি নব্যশিক্ষাগর্ব্বে আপনারা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেন, তবে বলি—

"সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলকামনায়, জরামরণব্যাধিশোকতাপের উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া, কান্তাসাহচর্য্য ও রাজভোগ তুচ্ছ করিয়া, 'জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তো শাক্যসিংহ যবে ত্যজিল গার্হস্থ্যে', তখন তিনি এই শ্যামের বাঁশীর আকুল আহ্বানে গৃহে অতিষ্ঠ হইয়া মহাভি-নিষ্ক্রমণ করেন নাই কি ? আবার যখন ভগবান্ বুদ্ধের পবিত্র নামে সমাজে ঘোরতর অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন কলুষিত অধো-নীত সমাজকে উদ্ধার করিবার মানসে কিশোর শঙ্কর পুত্রগতপ্রাণা জননীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন, তখনও কি তিনি এই শ্যামের বাঁশীর উদাত্ত স্বরে উত্তেজিত উচ্ছ্বসিত হয়েন নাই ? আর এই সোণার বাঙ্গালার সোণার গৌরাঙ্গ যখন সুপবিত্র ভাগীরথীতটে পুণ্যধাম নবদ্বীপে পাষণ্ড-উদ্ধারের জন্য, 'জীবে দয়া নামে রুচি' প্রচার উদ্দেশ্যে, হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া, স্নেহময়ী মাতা ও পতিব্রতা পত্নীর মায়া কাটাইয়া গৃহের বাহির হইলেন, তখনও সেই শ্যামের বাঁশীর পাগল-করা সুর তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে নাই কি ?

"এ সব দেবাত্মা অবতারের কথা ছাড়িয়া দিলেও যখন দেখি, বিপন্নের আর্ত্তিপ্রশমনের জন্য, রোগীর শুশ্রূষার জন্য, নৃশংস সমররাক্ষসের হস্তে নিগৃহীত সৈনিকের সেবার জন্য, কারাবাসীর কষ্টনিবারণের জন্য, মহামনাঃ হাউয়ার্ড ও ফাদার ডামিয়েন, সেবাব্রতধারিণী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর প্রভৃতি উৎসৃষ্টপ্রাণ, তথনও কি বুঝিতে বাকী থাকে যে, এ সকলকেই 'সেই বাঁশীর স্বরে উদাস করে, বল কে কা'রে ধরে' রাখে'? সে দিনও যে দামোদরের প্রবল বন্যায় বিপন্ন বিধ্বস্ত গ্রামবাসীদিগের বিপদুদ্ধারের জন্য দলে দলে বিদ্যালয়ের যুবক চিরাভ্যস্ত বিদ্যাচর্চ্চা ত্যাগ করিয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিল, সে ক্ষেত্রেও সেই শ্যামের বাঁশীর করুণ রাগিণী তাহাদের কাণে বাজে নাই কি?

"যাক, এ সব গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা হয় ত আপনার কর্ণে খড়মের শব্দের মত 'খটখটায়তে'। সাধারণ মানবের সাধারণ জীবনের ভিতরও একবার সন্ধান করিয়া দেখুন দেখি, শ্যামের বাঁশীর সুরের রেশ শ্রুতিগোচর হয় কি না?

"আচ্ছা, আপনার ব্যবসায়ের কথাই ধরুন না কেন? গুরু প্রতিদিনের অভ্যাসমত মনে মনে সাহিত্য-গণিত-দর্শন-বিজ্ঞানের কোন কঠিন প্রশ্ন সমাধান করিতেছেন, এমন সময় প্রীতিভাজন ছাত্র পাঠ লইতে আসিল, আর গুরু অমনি প্রিয় শিষ্যের আহ্বানে সেই কঠিন প্রশ্ন অসমাহিত রাখিয়া, নিত্যানুষ্ঠিত আলোচনাকার্য্য স্থগিত করিয়া, শিষ্যকে সস্নেহে বিদ্যাদানে ব্রতী হইলেন, এই গুরুশিষ্য-সংবাদে সেই প্রেমময় পুরুষের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন না কি? আবার পড়ুয়া বালক প্রভাতে স্নেহময় গৃহশিক্ষক বা অভিভাবকের ডাক শুনিয়া, সুকোমল শয্যাতল ত্যাগ করিয়া, সাগ্রহে তাঁহার সস্নেহ উপদেশ-বাক্য গ্রহণ

করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, এও সেই লীলাময়ের বংশী-রব নহে কি ? মা ঘরে বসিয়া গৃহস্থালীর কায করিতেছেন আর দূরে ক্রীড়াঙ্গনে আদরের শিশুটী 'মা, মা', বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, অমনি মা হাতের কায ফেলিয়া রাখিয়া, ছুটিয়া গিয়া, শিশুকে কোলে তুলিলেন, এই স্নেহের উচ্ছ্বাসের ভিতরও আর এক ভাবে শ্যামের বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইতেছেন না কি ? আবার কিশোর বালক খেলাঘরে ঘরকন্না সাজাইয়া আপন মনে খেলা করিতেছে, এমন সময় স্নেহময়ী মা তাহার নাম ধরিয়া আদর করিয়া ডাকিলেন, আর শিশু ধূলাখেলা ছাড়িয়া মাএর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এখানেও আর এক ভাবে সেই শ্যামের বাঁশীর সাড়া পাইলেন না কি ? বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগত বালক অন্দরে মাএর কাছে বসিয়া খাবার খাইতেছে, আর সদর দ্বারে ক্রীড়াসঙ্গীদিগের সঙ্কেতধ্বনি শুনিল, মুখের গ্রাস মুখেই রহিল, অমনি বালক সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিল, এই বাল্যপ্রণয়ে, এই সৌহার্দ্দ্যের আকর্ষণে, শ্যামের বাঁশীর বিচিত্র রাগিণী শুনিতে পাইতেছেন না কি ? আপনাদের গ্রীক পুরাণে প্রেমিকপ্রবর লীয়াণ্ডার (Leander) বিল্বমঙ্গলের ন্যায় সাঁতারিয়া অকূল পাথার পার হইয়া প্রিয়ার সহিত মিলিত হইতেন, ইহাতে হয় ত শ্যামের বাঁশীর আওয়াজ স্পষ্ট শুনিতে পান, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর যখন মাতার বিমল স্নেহস্মরণে অধৈর্য্য হইয়া অকুতোভয়ে দামোদরের প্রবল স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া মাতৃচরণান্তিকে উপস্থিত হইলেন, এখানেও কি শ্যামের বাঁশীর, স্নেহের আহ্বানের, সাড়া পাইতেছেন না ? ফলতঃ, প্রেম, স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, মৈত্রী, শ্রদ্ধা, ভক্তি, এ সবই ত সেই ভগবানের ডাক, সেই শ্যামের বাঁশী, সেই

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।"

গৌরদাস বাবাজী শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই ভিন্ন ভিন্ন রস একত্র মিশ্রিত করিয়া এক অত্যদ্ভুত মহাদ্রাবক প্রস্তুত করিতেছিলেন বুঝিলাম, তাহাতে এই পাষাণ-হৃদয় গলিয়া গেল, সুতরাং রসসঙ্কর লক্ষ্য করিয়াও লক্ষ্য করিলাম না।(২)

বাবাজী বলিতে লাগিলেন—"দেখুন, এই স্বর শুনিলে মানুষ সংসারের খুটিনাটি কার্য্য বিস্মৃত হয়, পার্থিব ভোগবিলাসে, পার্থিব কর্ম্মকলাপে ডুবিয়া থাকে না, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া পারমার্থিক প্রেমরাজ্যের দিকে ধাবিত হয়। শুধু তাহা কেন? এই স্বর হৃদয়ের তারে ঠিকমত ঝঙ্কৃত হইলে, এই প্রেমের আহ্বান হৃদয়ে স্থায়িভাব পাইলে, যমুনা উজান বহে, প্রকৃতির নিয়মের বিপর্য্যয় হয়, দস্যু রত্নাকর সাধু ভক্ত ঋষিতে পরিণত হয়, উদ্ধত ক্ষত্রবলে বলীয়ান্ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের চরণে লুঠাইয়া পড়েন—জগৎ ভরিয়া জয়ধ্বনি উঠে—'বাল্মীকির জয়'—কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রেমের জয়, মধুর রসের জয়; বিশ্ব তখন মধুময় হয়,—মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু মধু মধু।

"এই প্রেম যখন বিশ্বজনীন হয়, তখনই মহারাস। সেই মহারাসে বুদ্ধ-শঙ্কর, গৌরনিতাই, নানক-কবীর, তুকারাম-তুলসীদাস, বিজয়কৃষ্ণ-শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ-কাঙ্গালহরিনাথ নাচিয়াছিলেন। ইহাই বৈষ্ণবের রাধাভাব—ইহা অভিসার নহে, কামকেলি নহে, এই সঙ্কেতস্থান আপনাদের ইংরেজী কবিতা ও কাহিনীর trysting-place বা place of assignation নহে।"

---

(২) একা গৌরদাস বাবাজীর অপরাধ কি? আজকাল অনেক নামজাদা লেখকই শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য এইরূপ খিচুড়ি পাকাইতেছেন। ইঁহারা সকলেই এক এক গৌরদাস, অর্থাৎ ইংরেজের চেলা, ইংরেজী ভাবের ঘিয়ে ভাজিয়া সংস্কৃত ডিস্ (dish) সাজাইতেছেন।

বাবাজীর হৃদয়-যমুনা দুই কূল ছাপাইয়া আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল [পাঠক হয় ত বলিবেন, 'শিলা জলে ভেসে যায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়']—এমন সময়ে অদূরে কলেজের ঘড়ীতে দশটা বাজিল। আমি আবার কর্ম্মকোলাহলময় বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিলাম। বলিলাম,—"বাবাজী, আর না, তোমার রচিত আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় প্রেমের জগতে বিচরণ করা চলিবে না, ব্যবহারিক জগতে, কর্ম্মজীবনে আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে,—'ঐ বাজে হোরা'—উহা কর্ম্মের ভেরীরব, কর্ত্তব্যের সঙ্কেতধ্বনি, উহাতে প্রেম স্নেহ মাধুর্য্য কবিত্বরস আছে কি না, জানি না, কিন্তু উহা যে বস্তুতন্ত্রতাময় কঠোর সত্য, ইহা বিলক্ষণ বুঝি।"

ধর্ম্মে মতি।

(ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২৩)

ভক্তিভাজন জ্যেঠা মহাশয়ের সহিত যখনই দেখা হইত, তখনই তিনি বলিতেন—"আর কেন, বাপাজী? এখন বয়স হইয়াছে,—শাস্ত্রপাঠ, তীর্থদর্শন, সদাচারপালন, পূজা-অর্চ্চা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে মন দাও, পর-কালের ভাবনা ভাব। 'চতুর্থে কিং করিষ্যতি'(১) শ্লোকটা মনে আছে ত?" পূজনীয় জ্যেঠা মহাশয় হিতোপদেশের বৃদ্ধব্যাঘ্রের ন্যায়—[বিষ্ণু-শর্ম্মার এই বৃদ্ধব্যাঘ্রই কি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের original?] 'প্রাগেব যৌবন-দশায়াম্' বহু অনাচার-অত্যাচার করিয়া গলিতনখদন্ত অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে 'গঙ্গাতীরে নিত্যস্নায়ী নিরামিষাশী চান্দ্রায়ণ-ব্রতচারী' তপস্বী হইয়াছেন। বয়সের দোষে অগ্নির জোর কমিয়াছে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ডিসেন্‌ট্রি, ডায়রিয়া, ডায়াবেটিস্ প্রভৃতি ডকারাদি রোগ খুব চাগিয়াছে, সাগু বার্লি খাইলেও চোঁয়া ঠেকুর উঠে; সুতরাং ধর্ম্ম ভাবিয়া নিষিদ্ধ মাংস ও তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপচার ত্যাগ করিয়া এক্ষণে এমন সদাচার-পরায়ণ হইয়াছেন যে, কম্বলের আসন নিত্য কাচেন (কি ভাগ্যি লোম বাছেন না) এবং গঙ্গাজলও তিনবার ধুইয়া তবে খান!

পক্ষান্তরে, তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের দন্তপংক্তিদ্বয় অদ্যাপি অব্যাহত আছে; তবে তিন বৎসর পূর্ব্বে ল্যাংড়া আম অসম্ভব সস্তা হওয়াতে, আঁঠীর সজ্ঘর্ষে একটি দন্ত ঈষৎ নড়িতেছে। ইহাতে যদি কেহ বলেন,

---

(১) প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনম্। তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি॥

দেহ-ইমারতের বনিয়াদ টলিয়াছে, তবে নাচার। ফলতঃ, যে দশকে[২] বাঙ্গালীর বল-বুদ্ধি-ভরসা ফরশা হইয়া যায়, সেই দশক উত্তীর্ণ হইয়া, যে দশকে সাধারণতঃ চক্ষুর জ্যোতিঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, সেই দশকে পৌঁছিয়া আমার বয়স থমকিয়া আছে; যে দশকে বনবাসের ব্যবস্থা আছে, সে দশকে উপস্থিত হয় নাই। এখন পাঠকবর্গ বিচার করুন, আমার বয়সে ভাটা পড়িয়াছে কি না।

যাহা হউক, 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া' কলেজের কেতাবে পড়া এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া পূজ্যপাদ জ্যেঠা মহাশয়ের উপদেশ-পালনে কৃতনিশ্চয় হইলাম। ভাবিলাম, এই বেলা দিন থাকিতে পরকালের জন্য কিঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয় করা, অথবা ধন-বিজ্ঞানের ভাষায়,—[বিংশ শতাব্দীতে এই বিজ্ঞানই নাকি ভারতের দুর্দ্দশা-নিবারণের একমাত্র পথ, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়]—বৈতরণীর খেয়ার কড়ি সংগ্রহ করা সুবিবেচনার কার্য্য।

আর কালবিলম্ব না করিয়া, বাজে নভেল পড়া এক দম ছাড়িয়া, শাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করিলাম। 'বঙ্গবাসী'র সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশের কল্যাণে কার্য্য অতি সহজ হইল। মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ, হাতীমার্কা সালসার বিজ্ঞাপন—কিছুই ছাড়িলাম না। শাস্ত্রপাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম না, শাস্ত্রের উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিতেও লাগিলাম। কোথাও-কোথাও নব অনুরাগে শাস্ত্রের উপদেশের এক কাঠি উপরেও উঠিলাম। যথা, শাস্ত্র বলিয়াছেন—আত্মানং রথিনং বিদ্ধি; আমি নিজেকে রথী কেন, মহারথী মনে করিতে লাগিলাম। 'সোঽহং'-জ্ঞানে হৃদয় পূর্ণ হইল, জগতে আমি ছাড়া আর কিছুই নাই, জগৎ আমাতেই রহিয়াছে, এই তত্ত্ব—ফরাশী রাজার 'I am the State'এর মতনই—আয়ত্ত করিলাম।

(২) বল বুদ্ধি ভরসা। তিন দশকে ফরশা॥

যেখানে খট্‌কা বাধিত, সেখানে ইংরেজীর সহিত মিলাইয়া লইতাম, সকল খট্‌কা দূর হইত। [ইংরেজীই আমাদের কষ্টিপাথর; ইংরেজীর সঙ্গে না মিলাইলে ভরসা পাওয়া যায় না,—জ্ঞান খাঁটি কি ঝুঁটা; বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির শাস্ত্রব্যাখ্যায় এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে।] যখন শাস্ত্রে পড়িলাম, দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ, অমনই ইংরেজীর সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম, ইংরেজীতেও রহিয়াছে—Ye are the temple of the living God ; বুঝিলাম এটি খাঁটি সত্য। আবার শাস্ত্র-বচন 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' শুধু যে—আত্ম রেখে ধর্ম্ম, তবে সর্ব্ব কর্ম্ম—এই চলিত বাঙ্গালা প্রবাদ-বাক্যের সহিত এক তাহা নহে, ইহা ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ও গ্রীক জাতির অনুসৃত mens sana in corpore sano (Sound mind in sound body) এই প্রবচনের সহিতও অভিন্ন, সুতরাং অভ্রান্ত। দেহকে হেয় অবজ্ঞেয় মনে করা যে বৌদ্ধ-প্রভাবের ফল, ইহা ত্রিবেদী মহাশয়ের মৌলিক গবেষণার(৩) সাহায্যে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

এই জন্য 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্' জানিয়াও দুর্লভ পরান্ন পাইয়া শরীরের উপর দয়া করি নাই; প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যম্, শ্বঃকার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যম্, গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, প্রভৃতি নীতিবাক্য অবহেলা করি নাই; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরীর-পোষণও যে ধর্ম্মসাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ, শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকাতে ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। ইহার জন্য 'এক দিন ঘি-রুটি, দশ দিন দাঁতকপাটি' বহুবার ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও দমিয়া যাই নাই; কেন না, মতান্তরে, শরীর-নিগ্রহই নিঃশ্রেয়স-লাভের সোপান—ইহাও জানি। অতএব গুরুভোজনের পর সংযম উপবাসাদি অনুষ্ঠান সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। ব্রাহ্মণের উপবাসের পর ষোড়শোপচারে পারণ এবং ভোজের পর

(৩) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ সঙ্কলিত 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য।

লঙ্ঘন, বিধবার দশমীর রাত্রির জলযোগের পর নিরম্বু একাদশী এবং নিরম্বু একাদশীর পর দ্বাদশীর প্রাভাতিক জলযোগের ন্যায়

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্‌।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥

যাহা হউক, শাস্ত্রার্থবোধে ও শাস্ত্রের নিদেশ-পালনেই আমার সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি পর্য্যবসিত হইল না। শুভানুধ্যায়ী জ্যেঠা মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় পুণ্য-সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর প্রবলতর হইতে লাগিল। অবশেষে তীর্থযাত্রা করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। ইংরেজী শিক্ষার প্রসাদাৎ তীর্থদর্শন, পূজা-অর্চ্চা প্রভৃতিকে ঘোরতর কুসংস্কার বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি। কথায়-কথায় যৌবনের প্রিয় কবির বাক্য উদ্ধৃত করিতাম,—'জপতপ আর দেব-আরাধনা, পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা, এ সকলে এবে কিছুই হবে না।' ইংরেজী মেজাজের বশবর্ত্তী হইয়া কোন তীর্থক্ষেত্রে কখন পা দিই নাই। লম্বা ছুটি হইলে মধুপুর-শিমুলতলা বা পচম্বা-ঘাটশিলায় বায়ুসেবন করিয়াছি, দার্জ্জিলিং-শিমলার শৈত্যাবাসে মাথা ঠাণ্ডা করিয়াছি, কিন্তু গয়া-কাশী-প্রয়াগ-হরিদ্বার ত দূরের কথা, বৈদ্যনাথ-তারকেশ্বর, এমন কি, কলিকাতার কাণের কাছে কালীঘাট পর্য্যন্ত কখন দর্শন করি নাই। এত কথায় কায কি, নদীয়াজেলার লোক হইয়াও কখন নবদ্বীপমুখো হই নাই। মহাপ্রসাদের প্রয়োজন হইলে কসাই-কালীর শরণ লইয়াছি, মালপূয়ার প্রয়োজন হইলে বঙ্গীয়-মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারে ছুটিয়াছি, তথাপি শাক্তের পীঠে বা বৈষ্ণবের পাটে ধন্না দিই নাই।

কিন্তু এবার গুরুকৃপায় আমার সুবুদ্ধি হইল। 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতম্‌' হইল, তীর্থপর্য্যটনে মতি হইল, স্বর্গের সোপান-প্রণয়নের প্রবৃত্তি জাগরিত হইল, গুরুর গুরু জ্যেঠা মহাশয়ের

উপদেশ-বীজ ফলিল। 'শনৈঃ পন্থাঃ' এই বাক্য স্মরণ করিয়া প্রথমেই পথখরচার পাঁচ আনা ও পূজার পাঁচ পয়সা পুঁজি লইয়া ট্র্যামযোগে কালীঘাটে প্রয়াণ করিলাম। নিকটে হইলেও কালীঘাট মাহাত্ম্যে কম নহে। ইহা একান্ন পীঠের অন্যতম, সুতরাং শাক্তের ভক্তিকেন্দ্র। আবার প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রকট প্রমাণে, কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত এই স্থানই প্রাচীন কপিলক্ষেত্র। পরন্তু এই কালীঘাট বা কালীঘাটা হইতেই ক্যালক্যাটা বা কলিকাতা নামের উৎপত্তি। যাক্, প্রত্নতত্ত্বের তর্ক না তুলিয়া এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে মাকে দর্শন করিলাম এবং পাঁচ পয়সার পূজা দিলাম। সামান্য হইলেও ইহা ভক্তির অর্ঘ্য, দেবী অবশ্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে বিদুর-প্রদত্ত ক্ষুদও সাদরে ভোজন করিয়াছিলেন। মন্দিরের বাহিরে রক্তমাংসনির্ম্মিতা সধবা ও কুমারীর ঝাঁক দেখিয়া দেবীর সঙ্গিনী যোগিনী-ডাকিনীদিগের কথা মনে হইল। মন্দিরের দেবীদর্শনে নয়নে ভক্তি-অশ্রু বিগলিত হইয়াছিল, মন্দির-প্রাঙ্গণে দেবীর প্রসাদ-দর্শনে জিহ্বায় জলসঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু হাতে ত ট্র্যামভাড়ার পয়সা কয়টি সম্বল। অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মার তুষ্টি ও দেহের পুষ্টি উভয়ই ইষ্টবস্তু—ইহা শাস্ত্রপাঠে আমার মজ্জাগত হইয়াছিল। তীর্থস্থানে গিয়াও দেবীভক্তির আতিশয্যে আসল কথা ভুলি নাই। কিন্তু উপায় কি? শেষে কোকেনখোর দোকানদারের কাছে চাদরখানি বাঁধা দিয়া(৪) কষ্টেসৃষ্টে চারি আনা পয়সা সংগ্রহ করিলাম এবং এক ভাগা মহাপ্রসাদ ক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিলাম। কিন্তু

(৪) চাদর-নিবারিণী সভার সভ্যদিগের এ সুবিধাটুকু নাই। মৃচ্ছকটিকের ব্রাহ্মণ-চোরের কথাগুলি সামান্য বদলাইয়া বেশ বলা চলে—উত্তরীয়ং হি নাম মহদুপকরণ-দ্রব্যম্। বিশেষতোঽস্মদ্‌বিধস্য।

বড়ই বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় যে, এত আয়াসলব্ধ মহাপ্রসাদ গৃহিণীর বহু চেষ্টায়ও তেমন সুসিদ্ধ হইল না। দেবীর প্রসাদ বলিয়া পিঁয়াজ-রশুন না দেওয়াতেই এই অনর্থ ঘটিল, কি কলির প্রকোপে তীর্থমাহাত্ম্য লোপ পাইতে বসিয়াছে, সেইজন্যই পবিত্র মহাপ্রসাদে এই দোষ স্পর্শ করিল,—ঠিক ঠাহরাইতে পারিলাম না। তীর্থদর্শনে প্রথম উদ্যমের ফল এরূপ হওয়াতে মনটা কিঞ্চিৎ কাঁচিয়া গেল।

মা-কালীর একান্নপীঠের অন্যতম না হইলেও 'পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবে'র সাধনা ও সিদ্ধিলাভের স্থান বলিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর খ্যাতি আছে। এই কারণে কালীঘাট-দর্শনান্তে একবার উক্ত স্থান দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইলাম। 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই শাস্ত্রবচন স্মরণ করিয়া (এবং রন্ধনেরও প্রয়োজন হইতে পারে এ কথাও বিবেচনা করিয়া) অন্নপূর্ণার অংশজাতা গৃহিণীকেও সঙ্গে লইলাম। এ যাত্রা ট্র্যাম নহে, ষ্টীমার, অতএব যানেরও রকমফের হইল। জগন্নাথঘাটে ষ্টীমারে চড়িয়া শিবতলা বা এঁড়িয়াদহে—এ এঁড়িয়া অবশ্য শিবেরই ষাঁড়ের বংশধর—নামিলাম এবং অবশিষ্ট অল্প পথ পদব্রজে গেলাম। গঙ্গা-স্নান, কালী শিব ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ-দর্শন এবং পরমহংসদেবের পুণ্যস্মৃতির সহিত জড়িত পঞ্চবটী, পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম, স্থানের রমণীয়তা ও শান্তিময়তা হৃদয়ে অনুভব করিয়া আনন্দ-লাভ করিলাম। পুণ্যকীর্ত্তি রাণী রাসমণির আধুনিক উত্তরাধিকারিগণ 'সদয়হৃদয়-দর্শিতপশুঘাতম্' হওয়াতে বলিদান রহিত হইয়াছে শুনিয়া হরিষে বিষাদ হইল বটে, কিন্তু সে বিষাদ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। কেন না, কালীবাড়ীর সংলগ্ন ঘাটে গঙ্গার টাট্‌কা ইলিশ কলিকাতা অপেক্ষা অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া সেই অমৃতসমান মাছভাজা গৃহিণীর প্রস্তুত খিচুড়িসহযোগে সেইখানেই ভোজন করিয়া স্থানমাহাত্ম্য আরও গভীর-

ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। মনে মনে কালীঘাটের মা-কালী অপেক্ষা দক্ষিণেশ্বরের মা-কালীর উপর একটু বেশী পক্ষপাত হইল, ইহাও পাপমুখে স্বীকার না করিলে উপায় নাই।

যাহা হউক, গুরুকৃপায় (ও পরমারাধ্য জ্যেঠা মহাশয়ের প্ররোচনায়) যখন ধর্ম্মে মতি হইয়াছে, তখন আর সে স্থিরনিশ্চয়া মতির পথে বাধা দিলাম না। কালীঘাটে ও (দক্ষিণেশ্বরে) মাকে দর্শন করিয়া তারকেশ্বরে বাবাকে দর্শন করিতে গেলাম। এবার আর নিতান্ত সস্তায় ট্র্যামগাড়ী বা ষ্টীমারে চলিল না, কিঞ্চিৎ রেলভাড়া লাগিল। ভক্তির অনুশীলনেই ভক্তির বৃদ্ধি হয়, সুতরাং এবার পুণ্যার্থে কিঞ্চিৎ বেশী খরচ করিতে উৎসাহ হইল। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, শেষ পর্য্যন্ত খরচা পোষাইল না। বাবাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম, কিন্তু বাবার প্রসাদ যাহা মিলিল, তাহা নিতান্ত জঘন্য বাসি 'খাবার'। বাবার উপর বেশ একটু রাগ হইল, আর লোকে যে মোহান্তের নিন্দা করে, তাহাও অসঙ্গত বোধ হইল না।

যখন বাবার উপর রাগ করিয়া ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইতে লাগিলাম, তখন হিতকামী পুরোহিত ঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—"বাবা তারকনাথের দর্শনে যদি তৃপ্তি না হইয়া থাকে, বাবা বৈদ্যনাথকে দর্শন কর, মনের ক্ষোভ ঘুচিবে।" "গুরুবাক্য অবহেলা করিতে নাই" শাস্ত্রালোচনায় এ শিক্ষা হইয়াছিল, আর পুরোহিত ঠাকুরও এ বিষয়ে ভূয়োদর্শী ; অতএব তাঁহার আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস করিলাম ও 'শুভস্য শীঘ্রম্' ভাবিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক রেলভাড়া দিয়া দেবগৃহযাত্রা করিলাম। [পুণ্যানুষ্ঠানের একটি সুফল হাতে-হাতে পাইতেছি ; ক্রমেই অর্থের প্রতি মায়া ও তজ্জনিত ব্যয়কুণ্ঠতা কমিতেছে, তীর্থপর্য্যটনের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে মুক্তহস্ত হইতেছি। ইহাও একটা কম

আধ্যাত্মিক লাভ নহে।] তথায় পৌঁছিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, পুরোহিত ঠাকুর বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। বাবাকে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক হইল, বাবার প্রসাদী পেড়া ও অন্যান্য খাবার খাইয়া রসনা পরিতৃপ্ত হইল, আর তীর্থগুরু পাণ্ডার প্রদত্ত দধি ভোজন করিয়া দগ্ধোদর জুড়াইল। বুঝিলাম, বাবা জাগ্রৎ দেবতা বটে!

বৈদ্যনাথ-দর্শনে তৃপ্তি পাওয়াতে সিদ্ধান্ত করিলাম, পোড়া বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া পশ্চিম-মুখো যতই অগ্রসর হইব, (মক্কার কথা অবশ্য তুলিতেছি না) ততই তীর্থমহিমা প্রণিধান করিতে পারিব। রেল-গাড়ীতে ফিরিবার সময় দুই-একজন মুণ্ডিতমস্তক যাত্রীর মুখে ৺গয়া-ধামের গদাধরের পাদপদ্মের মাহাত্ম্য ও তথাকার পেড়ার উপাদেয়তার কথা শুনিয়া গয়ংগচ্ছ না করিয়া অবিলম্বে গয়া যাইব স্থির করিলাম। কিন্তু বাটী ফিরিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত ঠাকুরের মুখে আমার আজও গয়ায় গমনের অধিকার নাই—এই নিদারুণ বাক্যশ্রবণে বড়ই উৎসাহভঙ্গ হইল এবং নিতান্ত 'ভাগ্যহীন' বলিয়া আত্মধিক্কারও জন্মিল! ফলতঃ, মনের বাসনা মনেই রহিয়া গেল! হায়, কবি যথার্থই বলিয়াছেন, উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ (অশ্লীলতা-আশঙ্কায় শেষ দুইটা চরণ চাপিয়া গেলাম)।

পুরোহিত ঠাকুরের উপর অভিমান করিয়া সঙ্কল্প করিলাম, এবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া শারদীয়া পূজার ছুটিতে কাশীযাত্রা করিব, 'কার সাধ্য রোধে মোর গতি'? মহালয়ার পর দেবীপক্ষ পড়িলেই বোম্বাই মেলে রওনা হইলাম, যাত্রিক দিন দেখাইবার জন্য পুরোহিত ঠাকুরের শরণ লইতে হইল না। পরম্পরায় কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াছিলাম এবং তথাকার রাবড়ী, মালাই, দধিদুগ্ধ প্রভৃতির সুখ্যাতিও শুনিয়াছিলাম। এইবার দর্শনস্পর্শন ও আস্বাদনের

সুযোগ ঘটিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থবাসকালে ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে সঙ্গে কখনও শরীর-পোষণে শৈথিল্য প্রকাশ করি নাই; আত্মার তুষ্টি ও দেহের পুষ্টি যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাহা শাস্ত্র হইতেই শিক্ষা করিয়াছিলাম। সুতরাং কাশীতে গিয়া যেমন নানা দেবস্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, তেমনই বহুবিধ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যপেয়েরও সন্ধান লইতে ছাড়িলাম না। একদিকে শিব, কালী, বিষ্ণু, সূর্য্য, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবী-দর্শনের জন্য এবং অপরদিকে নানখাতাই, ঘিওর, পুরী, কচুরী, নিমকী হইতে চমচম, পানতোয়া, ক্ষীরমোহন, আবার-খাবো প্রভৃতি আস্বাদনের জন্য সমান উৎসাহী হইলাম। পাঠক-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিকল্পে নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।

এইস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি। আজকাল অনেকে কাশীধাম ও অন্যান্য তীর্থ-সম্বন্ধে পুস্তক ছাপাইতেছেন। কিন্তু কোথায় কিরূপ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা কেহই লেখেন না। এ সকল আবশ্যকীয় কথা লিখিলে যে পাঠকদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগরিত হয়, এ টুকু তাঁহারা বুঝেন না। আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অন্য যে দোষই থাকুক, এ বিষয়ে কোন ত্রুটি নাই।

কাশীধামে পৌছিয়াই গঙ্গাস্নানান্তে বিশ্বেশ্বর-দর্শনে যাত্রা করিলাম। দর্শনান্তে বিশ্বেশ্বর-মাহাত্ম্য প্রণিধান করিলাম; পরন্তু বিশ্বেশ্বরের গলির দধি ও তৎসন্নিহিত কচুরী-গলির 'খাবার' উদরস্থ করিয়া ধন্য হইলাম। বুঝিলাম, শিবভক্তের তিন বাবার মধ্যে বাবা বিশ্বনাথই সবার সেরা। মা অন্নপূর্ণার দর্শনে জন্ম সার্থক করিলাম, আবার তাঁহার প্রসাদ পায়সান্ন ভোজন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলাম। ইহা মহাপ্রসাদ না হইলেও ফেল্‌না নহে। দেওয়ালীর দিনে মাএর অন্নকূটে নানারূপ রসনা-তৃপ্তিকর চর্ব্বচূষ্য-লেহ্যপেয় দ্রব্যও লোভনীয় বস্তু। তদুপলক্ষে মাকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া ঘৃত-পক্ক খাদ্য, মিষ্টান্ন প্রভৃতির স্বাদগ্রহণ করিয়া ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়াছি।

বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা কাশীর বিশিষ্ট দেবতা হইলেও পুরুষানুক্রমে উপাসিতা শক্তির কালীমূর্ত্তির প্রতি ভক্তি অচলাই আছে। সুতরাং ভক্তিভরে বাঙ্গালীটোলার কালীমায়িকে দর্শন করিয়াছি এবং সঙ্গে-সঙ্গে কালীবাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী কালিকা-ভাণ্ডারের দধি, দুগ্ধ, মালাই, রাবড়ী ও কাঁচাগোল্লা উপভোগ করিয়া বুঝিয়াছি যে, এগুলি দেবীর সান্নিধ্যে অমৃতের স্বাদ লাভ করিয়াছে। অদূরবর্ত্তী শশীর ও তাহার ভ্রাতার দোকানের 'খাবার'ও বোধ হয় এই কারণেই পরম উপাদেয়। দুর্গাবাড়ী দূর হইলেও তথায় যাইতে পশ্চাৎপদ হই নাই; পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা পুরুষানুক্রমে শাক্ত; বিশেষতঃ, মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা শিবপুরীতে অন্য কুত্রাপি নাই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, মহাপ্রসাদ-সংগ্রহে হরিষেবিষাদ উপস্থিত হইল। দেখিলাম, এই রামছাগলের মাংস কালী-ঘাটের বুড়া পাঁঠার মাংস অপেক্ষাও দাঁতভাঙ্গা। খোট্টার দেশের ছাগ-মাংসও কাঠখোট্টা রকমের। এই প্রসিদ্ধ দুর্গাদেবী আসলে শক্তিমূর্ত্তি নহেন, প্রচ্ছন্ন বুদ্ধমূর্ত্তি, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যদি এইরূপ মীমাংসা করেন, তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইব না; যেহেতু মহাপ্রসাদের এরূপ দুর্দ্দশা বাস্তবিকই সন্দেহজনক!

কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি তীর্থবাসকালে মাংসভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ সন্দেহস্থলে আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের মত পুঁথি দেখিয়া ব্যবস্থা ঠিক করি। এক্ষেত্রেও পুঁথি খুলিয়া দেখিলাম 'ন মাংসভক্ষণে দোষো'—বাস্, পুঁথি বন্ধ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিলাম। সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশের সুবিধাই এই যে, কথায়-কথায় তৈলবট লইয়া স্মার্ত্ত পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইতে ছুটিতে হয় না, নিজেই সব দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া স্বয়ংসিদ্ধ হওয়া যায়।

শাক্তবংশে জন্মিলেও বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতি আমার বিরাগ-বিদ্বেষ নাই। সাধনাক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিয়াই, হৃদয় হইতে বংশগত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দূর করিয়া উদারমতাবলম্বী হইয়াছি, শ্যাম ও শ্যামার অভেদ জানিয়াছি। আর ইহাও বুঝিয়াছি যে, মৎস্য-মাংস রুচিকর ও পুষ্টিকর আহার্য্য হইলেও, মধ্যে-মধ্যে মুখ বদলাইবার জন্য, ক্ষীর-সর-ছানা-ননী-মাখন মন্দ জিনিশ নহে। সুতরাং বিন্দুমাধব, আদিকেশব, গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ সাগ্রহে দর্শন করিয়াছি, এবং দক্ষিণার বিনিময়ে গোপালজীর দেবভোগ্য ভোগ আহরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

অবিমুক্ত-বারাণসী কাশীধামের এমনই মাহাত্ম্য যে, শুধু প্রসাদ কেন, মাছতরকারী ফলমূল পর্য্যন্ত এখানে সুলভ ও অপর্য্যাপ্ত। তবে পূজার ছুটীতে বহু সৌখীন তীর্থযাত্রীর ভিড়ে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হয়, এবং এ সময়ে প্রধান-প্রধান তরকারী ও ফলমূল তেমন উঠে না। ইহাতে দৈহিক ও সঙ্গে-সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতির (উভয়ে নিত্যসম্বদ্ধ) ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া বড়দিনের ছুটিতে বিশ্বেশ্বর-দর্শন-লোলুপ হইয়া আবার সেখানে ছুটিয়াছিলাম এবং তাঁহার কৃপায় রামনগরের মূলা, বেগুন, কপি, কড়াইসুটি, কুল, পেয়ারা ধ্বংস করিয়া সুস্থশরীরে খোসমেজাজে বাহাল তবিয়তে ও ভক্তিভরা হৃদয়ে কলিকাতায় ফিরিয়াছি। আবার খরমুজা ও কাশীর লেংড়ার লোভে ভক্তিগদ্গদচিত্তে গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে দীর্ঘ দিন বিশ্বেশ্বরের রাজধানীতে কাটাইয়াছি। শীত-গ্রীষ্ম-শরৎ বিশ্বেশ্বরের আশ্রয়ে যাপন করিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, কাশীর আনন্দকানন নাম একেবারেই অতিশয়োক্তি নহে। [পাঠকবর্গের বিশ্বাস না হয়, এই পূজার বন্ধে কাশী গিয়া অধমের কথাটা পরখ করিয়া দেখিতে পারেন।] বহু দেবতার মন্দির ও বহুতর আহার্য্যের সমাবেশ দেখিয়া ইহাও বেশ বুঝিয়াছি যে, কাশী বাস্তবিকই সর্ব্বতীর্থময়ী। 'ব্রহ্মাণ্ডে ত্রিকোটী সার্দ্ধ তীর্থ করে অবস্থিতি।

কাশীতে সে সব তীর্থ করে প্রত্যক্ষে বসতি ॥' 'অথবা সর্ব্বক্ষেত্রাণি কাশ্যাং সন্তি নগোত্তম'—এ কথা স্বয়ং ভগবতী তাঁহার পিতাকে বলিয়াছেন, মিথ্যা হইবার যো কি ?

কেবল একটী বিষয়ে প্রথম প্রথম বড় ধোঁকা লাগিত—বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার যুগল-মাহাত্ম্য-সত্ত্বেও কাশীর ইলিশ বিস্বাদ কেন বুঝিতাম না। ধ্যানস্থ হইয়া জানিলাম, গঙ্গা উত্তরবাহিনী হওয়াতে এই দোষ স্পর্শিয়াছে।

কাশীর মহাপ্রসাদে অভক্তি প্রকাশ করাতে, একজন পেন্‌শনভোগী কাশীবাসী বৃদ্ধ বলিলেন, "বিন্ধ্যাচলে সুললিত ছাগমাংস সুলভ।" তিনি আরও বলিলেন,—"আমি পেন্‌শন লইয়া প্রথম কয়েক বৎসর এই সুবিধার জন্য বিন্ধ্যাচলেই ছিলাম, ইদানীং দন্তাভাবে পুষ্পদন্তেশ্বরের আশ্রয় লইয়াছি।" তাঁহার কথা শুনিয়া পরদিন প্রত্যূষেই মোটর-ট্রেনে বিন্ধ্যাচল রওনা হইলাম। তথায় যাইয়া গঙ্গাস্নান ও দেবীদর্শনান্তে চক্ষুঃকর্ণের—শ্রীবিষ্ণুঃ, জিহ্বাকর্ণের—বিবাদভঞ্জন করিলাম। বুঝিলাম, 'বৃদ্ধস্য বচনম্' ভোজনকালেও 'গ্রাহ্যম্'। যোগমায়া, ভোগমায়া, বিন্ধ্যবাসিনী, অষ্টভুজা প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তির উপর যে কি পরিমাণ ভক্তির উদ্রেক হইল, তাহার বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র লেখনীর অসাধ্য। এখানে অনুদ্গতশৃঙ্গ ছাগবলি দেওয়ার প্রথাকে কেহ-কেহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু কচি পাঁঠা যখন সমধিক মুখপ্রিয়, তখন দেবীর প্রীত্যর্থ এরূপ বলিদান কেন নিন্দনীয় হইবে বুঝি না (বিশেষ, ভক্ত যখন পরে প্রসাদ পাইবেন)।

কাশীতে থাকিতে ত্রিবেণীসঙ্গম প্রয়াগতীর্থের খুবই নাম-ডাক শুনিতাম। সুতরাং একবার সেখানেও গিয়াছিলাম। মস্তকমুণ্ডন, ত্রিবেণী-স্নান, বেণীমাধব-দর্শন, সকলই করিলাম—কিন্তু আসল কার্য্যে তেমন সুবিধা পাইলাম না। স্থানটি কাশীর এত নিকট, অথচ খাদ্যদ্রব্য-সম্বন্ধে

কাশীর একেবারে ঠিক উল্টা,—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। অলোকা দেবীর সঙ্গে-সঙ্গেই এখানকার খাদ্যসুখ অন্তর্ধান হইয়াছে, কি ত্র্যহস্পর্শের ন্যায় ত্রিবেণীতে বিভ্রাট্ ঘটাইয়াছে—ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

আর এক যাত্রা বৃন্দাবনে গিয়া গোপালের মনোমোহন মূর্ত্তিদর্শনে ও তাঁহার ভোগ-আস্বাদনে এবং বাজারে বিক্রীত লাচ্ছাদার রাবড়ী-সেবনে হরিভক্তি সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আহা! সকলই প্রভুর কৃপা!

কাশীর গঙ্গার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া পরবৎসর সঙ্কল্প করিলাম, গঙ্গার অবতরণ-স্থান হরিদ্বার দর্শন করিব। তথায় ত্রিরাত্র বাস করিয়া বুঝিলাম, হরিদ্বার প্রকৃতই স্বর্গদ্বার। সুরধুনীর ত্রিধারার সলিল কি শীতল, কি সুমধুর, কি তৃপ্তিকর! নৈষধকারের 'অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা' অন্যত্র খাটিলেও এক্ষেত্রে খাটে না; দেখিলাম, এই সদ্যোধৃত জল যতই খাই, ততই খাইতে ইচ্ছা হয়; শুধু গলনালী কেন, হৃৎপদ্ম পর্য্যন্ত জুড়াইয়া যায়। বুঝিলাম, বৈশেষিক-দর্শনে যে জলের প্রাকৃতিক গুণ 'মাধুর্য্য' লিখিয়াছে, তাহা অসত্য নহে। পৃথিবীর ধূলামাটি লাগিয়াই পবিত্র গঙ্গোদকের স্বাদুতা-মধুরতা নষ্ট হইয়াছে। পরন্তু, এখানকার ঘৃত ও রাবড়ী একেবারে ভেজাল-বর্জ্জিত। সাত্ত্বিক আহারে ধর্ম্মবৃদ্ধির এমন স্থান জগতে দুর্লভ।

হরিদ্বার-কনখল হইতে আরও উর্দ্ধে গোমুখী বদরিকাশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিবার বাঞ্ছা ছিল। কিন্তু প্রথম আড্ডা হৃষীকেশে খাদ্যদ্রব্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া তীর্থভ্রমণ বিষয়ে নিরুৎসাহ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। দেবতাত্মা হিমালয়-ভ্রমণ করিতে আর মন সরিল না। এ সকল দুর্গম স্থানে কেবল ছাতু ও লঙ্কা খাইয়া পথ চলিতে হয়, শুনিয়া পা আর উঠিল না। চালচিড়া বাঁধিয়া নৈমিষারণ্যের চিড়া খাইতে যাইতেও আর ইচ্ছা হইল না। তখন শাস্ত্র স্মরণ করিয়া জানিলাম, মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিয়া

ধর্ম্মানুষ্ঠান করা মূর্খতার কার্য্য। সেই সঙ্গে সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের গানটি মনে পড়িল—"কায কি আমার কাশী? ঘরে বসে' পা'ব গয়া গঙ্গা বারাণসী"। আহা, ইহা লাখ কথার এক কথা। [তবে রামপ্রসাদ সাধনার উচ্চতম স্তরে উঠিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, আর আমার না উঠিতেই এক কাঁদি---এই যা' তফাত।] আরও ভাবিলাম, চেষ্টা করিলে এই ভেজালের আমলেও কলিকাতায় বসিয়াই বড়বাজারের রাতাবী, আফিমের চৌরাস্তার রাবড়ী, বাগবাজারের রসগোল্লা, যোড়াসাঁকোর ক্ষীরমোহন, বহুবাজারের আধা-ছানার সন্দেশ, পোস্তার লেংড়া, ফজলী, বোম্বাই, কিষণভোগ প্রভৃতি খাস আম, হগ সাহেবের বাজারের মেওয়া ফল, ঘাটালের ও আলিগড়ের মাখন, gram-fed mutton প্রভৃতি সুখাদ্য পাওয়া যায়। আর বর্ষাকালে গঙ্গার ইলিশের ত তুলনা নাই। অতএব 'অর্কে চেন্ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ?' ইহার জন্য গাঁটের কড়ি খসাইয়া, অনাহারে অনিদ্রায় রেলগাড়ী চড়িয়া, হিল্লী-দিল্লী ঘুরিবার প্রয়োজন কি?*

---

* প্রবন্ধের নাম 'ধর্ম্মে মতি' না হইয়া 'ঔদরিকের তীর্থ-পরিক্রমা' হইলেই সঙ্গত হইত।—তবে এক হিসাবে লেখক প্রকৃত ভক্ত, কেন না—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা'—ইনি সেই দেবীর আশ্রিত। এই অন্ন-অজীর্ণের দিনে ইহা দেবীর কৃপার পরিচায়ক বটে।—সম্পাদক।

বিবাহে বিবিধ বাধা।

(ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২৩)

বরো বরয়তে রূপং মাতা তত্ত্বং পিতা পণম্।

বান্ধবাঃ পদ্যমিচ্ছন্তি(১) মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ॥

গৌরচন্দ্রিকা।

আমি(২) উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল উপাধিধারী, উপার্জ্জনশীল, বয়সও নিতান্ত অল্প নহে, ছত্রিশে পড়িয়াছি—অথচ আজও বিবাহ হয় নাই। শীঘ্র যে হইবে তাহার সম্ভাবনাও দেখি না, কেন না, কথায় বলে, 'বল বুদ্ধি ভরসা—তিন দশকে ফরশা।' দোজবরে বর হইলে বরং তাহার পঞ্চাশোর্দ্ধেও বনগমনের পরিবর্ত্তে পুনরায় বিবাহ ঘটিতে পারে (যদিও শেষে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'র দাপটে তাহার 'যথারণ্যং তথা গৃহম্' হইয়া দাঁড়ায়) ; তাহার পক্ষে বয়সের বাধাটা বাধাই নহে, সে যে কাঁচিয়া গণ্ডূষ করিতেছে। কিন্তু যে ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়, তাহার আর কোন আশা নাই। শুনিবামাত্রই লোকের সন্দেহ হয়, নিশ্চিত 'কিঞ্চিৎ কুলে দোষঃ' ; অথবা আরও কোন গুরুতর দোষ আছে। বাস্তবিক, বাঙ্গালীর ঘরে ভাত থাকুক না থাকুক, এ শুভ কার্য্যটা শীঘ্র-শীঘ্রই হয়। বাঙ্গালী মা-বাপ মনে করেন, ছেলের বিবাহ দিয়া ফেলিতে পারিলে, তাহার একটা 'হিল্লে' হয়, অর্থাৎ অকূল সংসার-সমুদ্রে সে একটা কূল পায় ; 'নাতীর নাতী স্বর্গে বাতী'র আশাও তাঁহাদিগকে

---

(১) অর্থাৎ পদ্যে রচিত প্রীতি-উপহার।

(২) আপনারা ভুল বুঝিবেন না। লেখক নিজের ঢাক নিজে বাজাইতেছেন না অর্থাৎ আধুনিক প্রণালীতে আত্মকাহিনী লিখিতেছেন না। বৃত্তান্তটি আগাগোড়া কাল্পনিক।

এ কার্য্যে উৎসাহিত করে; আর মহাপ্রভুর সময় হইতে শচীমাতার মত সকল বাঙ্গালী মাতারই ভয়, কামিনীর কাঞ্চনশৃঙ্খলে না বাঁধিলে পাছে পুত্রটি বিবাগী হইয়া যায়। আজকাল ত আবার বিলাত-পলায়ন, বিড়ালাক্ষী-বিবাহ, ব্রাহ্মিকা-বিবাহ, বিপ্লববাদীর দলে মেশা প্রভৃতি আরও বিস্তর উপসর্গ যুটিয়াছে। এমন দেশে ও এমন সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমার এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকে। সেই জন্যই কথাটা পাড়িলাম। ভুক্তভোগী হাড়ে-হাড়ে আমার দুঃখের কাহিনীর যাথার্থ্য অনুভব করিবেন; আর যাঁহাদের আজও ফাঁড়া কাটে নাই, তাঁহারা আমার দশা দেখিয়া সাবধান হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে এই অভাগার মত ঠেকিয়া শিখিতে না হয়। দাঁত থাকিতে তাঁহারা যেন দাঁতের মর্য্যাদা বুঝেন। কথায় বলে,

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমুতাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

অতএব যাঁহাদিগের কাঁচা বয়স, তাঁহারা 'শুভস্য শীঘ্রম্' নীতি অনুসরণ করিয়া বসন্তের টীকা লওয়ার ন্যায় সকাল-সকাল শুভকর্ম্মটা সারিয়া ফেলুন, অজাতশ্মশ্রু অবস্থায়ই সঞ্জাতশ্বশ্রূ হইয়া জামাই-আদরে আহার-বিহারের বন্দোবস্ত করুন, আমার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

প্রথম বাধা।

একে কুলীনের ছেলে, তাহাতে বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলাম, কাণা, খোঁড়া, কালা, কুঁজো, বোঁচা, খাঁদাও নহি—পুরুষের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট—ঘরেও 'অন্ত ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ' অবস্থা নহে;

'একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্ ?' সুতরাং উপনয়নের পর হইতেই বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু আসিলে কি হয় ? 'গুণ হয়ে দোষ হ'ল আমার বিদ্যায়।' পিতাঠাকুর মহাশয় কোট ধরিলেন,—ছেলের লেখাপড়া সাঙ্গ না হইলে বিবাহ দিবেন না ; বিবাহ হইলে না কি পাঠ্য-পুস্তকের পাতায়-পাতায় নানা ভঙ্গীর ফোটোর আবির্ভাব হইয়া পাঠার্থীর চিত্তবিক্ষেপ ঘটায় ; অতএব ছাত্রজীবনে 'ব্রহ্মচর্য্যমকল্মষম্' পালনীয়, পাঠ-সমাপনান্তে গৃহী হওয়াই প্রশস্ত ইত্যাদি অনেক সারগর্ভ বচনে তিনি মাতাঠাকুরাণীকে নিরস্ত করিলেন। তিনি আধুনিক আয়ুষ্কালের হারে মনুবচনের ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দিলেন যে, পাশকরা যুবকের বিংশত্যধিক বর্ষ বয়সেই বিবাহ বিহিত। অথচ পিতৃদেবের শুনিয়াছি উপনয়নের পরেই আইবুড় নাম ঘুচিয়াছিল ; এমন কি, পিতামহীর অনুরোধে বিবাহের সুবিধার জন্য উপনয়নটা নবমবর্ষেই সারা হইয়াছিল, এমন কথাও শুনিয়াছি। ইহাতে তাঁহার লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটা দূরে থাকুক, বিবাহের পর হইতেই তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। [ইহাকেই বলে, 'নিজের বেলায় মহাপ্রসাদ, পরের বেলায় ভাত'। যাক্, গুরুজনদিগের সম্বন্ধে এতটা personal (ব্যক্তিগত ?) হওয়া বেআদবি।] লোকে বলিত, সে সবই মাতৃদেবীর পয়ে। তা' 'পয়' জিনিশটা কি এ বংশে মাতৃদেবীই নিঃশেষ করিয়াছেন ? [আবার বেআদবি করিতেছি।] মা-আমার ছিলেন নিরীহ ভাল মানুষ ; তাঁহার বড় সাধ ছিল, ছোট্ট একটি রাঙ্গা টুক্‌টুকে বৌ আসিয়া ঘরময় গুড়্‌গুড় করিয়া বেড়াইবে, আর তিনি সেই বিড়ালশিশুর চঞ্চল লীলা দেখিয়া জননীজন্ম সার্থক করিবেন ; কিন্তু পরম পূজনীয় পিতৃদেবের শাস্ত্রব্যাখ্যার দাপটে তাঁহার সে সাধ স্নেহময় হৃদয়-সাগরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় উত্থিত হইয়া পরক্ষণেই বিলীন হইল।

দ্বিতীয় বাধা।

আমার শিক্ষা-সমাপ্তির পর পিতৃদেব ঘটকদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন। কিন্তু তখন আবার আর এক বাধা উপস্থিত হইল। সাধে কি বলে, 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'? কুলে-শীলে মিল, গণ-বর্ণে মিল, এ সব ত চাইই; পরন্তু, উপযুক্ত পরিমাণ গণপণ,বরাভরণও মেলা চাই। আমার শিক্ষায় বরাবর যে ব্যয় পড়িয়াছে, সেই টাকাটা মূলধন ধরিয়া এত বৎসর মায় সুদ কত টাকা হইত, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব খাড়া করিয়া তিনি দশ হাজার টাকা বরপণ হাঁকিলেন! তিনি গণিতশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী, তাঁহাকে হিসাবে আঁটিয়া উঠে, কাহার সাধ্য? প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করিলে তিনি বলিতেন, "ভাই হে, হিসাবের অত মারপেঁচ না বুঝ, 'পাঁচটি পাশে পাঁচটি হাজার, সোজা রূল্ অভ থ্রী (Rule of Three)' এটুকু ত বুঝ? আর জমিদারীর বেলায় বিশগুণ পণ ধরে, আমি দ্বিগুণ পণ দশ হাজার ধরিতেছি, বেশী কি? ছেলে কি মাটির চেয়েও সস্তা?" তাঁহার পুত্রের শিক্ষার খরচটা মায় সুদ কন্যাকর্ত্তার কাছ হইতে একতরফা ডিক্রী করিয়া কেন আদায় করিবেন, এ কথা লইয়া কেহ তর্ক করিতে আসিলে, তিনি ত্বরিত জবাব দিতেন,—"এখনকার ছেলেরা রোজগার করিয়া মা-বাপকে কিছু দেয় না, পত্নীর পাদপদ্মেই সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দেয়; অতএব ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের কন্যাই যখন পাত্রের উচ্চশিক্ষা-কল্পতরুর সুবর্ণফল একা-একা ভোগ করিবে, তখন শিক্ষার খরচাটা কন্যার পিতা দিবেন না ত কি পাড়ার লোকে দিবে?" ইহার উপর আর তর্ক চলে না।

পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে মাতাঠাকুরাণীরও অবশ্য একটা মত ছিল। আজকাল আর পিতৃদেব তাঁহার ন্যায্য কথার প্রতিবাদ করিতেন না।

সুতরাং মা-আমার মন খুলিয়াই নিজের সাধ জানাইতেন। বাবা বলিয়াছিলেন,—'পাঁচটি পাশে পাঁচটি হাজার, সোজা রুল্ অভ থ্রী!' মা তাহার সহিত মিল রাখিয়া সংক্ষেপে বলিলেন,—"হীরে-মুক্তোয় মুড়ে আন্‌বো বৌমা লক্ষ্মী-শ্রী!" ইহার ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আরও বলিলেন,—"মা-লক্ষ্মী ঘরে আসিবেন, এক গা গয়না না হইলে কি করিয়া চিনিব যে তিনি মা-লক্ষ্মী, না আর কেউ? আর নগদ-ফগদ আমি অত বুঝি না। তবে বেহাই যদি ভদ্রলোক হন, তা' হলে দানসামগ্রী, নমস্কারী, ফুলশয্যা ও বারমাসে তের তত্ত্ব অবশ্য বেশ সৌষ্ঠবমত দিবেন—পাঁচজনকে দিয়া দেখাইয়া যেন সুখ হয়; আমি কিছু খাবও না, মাখ্‌বও না। আমার অমুকের কল্যাণে আমার কি খাওয়া মাথার দুঃখু আছে গা?" দু'জনের দু'রকম রা, কিন্তু হরে-দরে হাঁটু জল নহে, একেবারে অতলস্পর্শ! সুতরাং সব সম্বন্ধই ভাসিয়া গেল। কুল ভাঙ্গিলে হয় ত চড়া দর মিলিত, কিন্তু কুলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পিতাঠাকুর মহাশয় (Eugenics) সুপ্রজননবিদ্যার বিলাতী কেতাব হইতে রাশি-রাশি অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিতেন। তাঁহার বিদ্যার বৈচিত্র্য ও গভীরতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর! আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকে তাঁহা অপেক্ষা ধনী ও সম্ভ্রান্ত হইয়াও 'সুবর্ণসুযোগ' পাইয়া কুল ভাঙ্গিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, কিন্তু এ বিষয়ে পিতাঠাকুর মহাশয় আশ্চর্য্য-রকম (Conservative) রক্ষণশীল ছিলেন।

আমি সব শুনিতাম, কিছু বলিতাম না; কতক লজ্জায়, কতক ভয়ে, কতক অবহেলায়, আর কতক মজা দেখার জন্য, উচ্চবাচ্য করিতাম না। হায়! তখন বুঝি নাই, শেষে কাহার মজা কে দেখিবে!

এইভাবে কয় বৎসর গেল। হঠাৎ মাতা-পিতা উভয়েই স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি আইবুড়ই রহিয়া গেলাম।

তৃতীয় বাধা।

যখন মাতা-পিতার স্বর্গলাভ হইল, তখনও বিবাহের বয়স উৎরাই নাই। স্বাধীন ও উপার্জ্জনশীল হইয়াছিলাম; অবশ্য নিজে উদ্‌যোগী হইয়া বিবাহ করিতে পারিতাম। আর ঘন-ঘন সম্বন্ধ আসা কালাশৌচের জন্যও বন্ধ হয় নাই। কিন্তু আবার এক নূতন বাধা আসিয়া আমার সাধে বাদ সাধিল।

'নয় শ পঞ্চাশ দাও'—আমার এমন খাঁই নাই, কুলশীল, কোষ্ঠী-বিচারেরও ধার ধারি না (আমার ওসব কুসংস্কার নাই, 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' আমার মূলমন্ত্র)—কেবল আমি চাই, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী জীবনসঙ্গিনী প্রণয়তরঙ্গিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হইবেন। অতি ন্যায্য কথা; অথচ ঘটক-ঘটকীরা বলিলেন, ইহাও একরকম ধনুকভাঙ্গা পণ। তাঁহারা তর্ক যুড়িলেন, 'সবাই যদি এই পণ করিয়া বসে, তাহা হইলে ত হিন্দুর ঘরের পাঁচ-পাঁচীগুলা বিকাইবে না। আর পাত্রগুলিও ত এক-এক কন্দর্প নহেন; তাঁহাদের জননী-ভগিনীরা যত রূপসী, তাহাও আমাদের অজ্ঞাপি নাই;' ইত্যাদি। [শেষ কথাটা বলিলেন ঘটকী ঠাকুরাণীরা।] আমার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া পাড়ার বিজ্ঞেরা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ, এ সঙ্গত কথা বটে; গৃহিণী সুশ্রী না হইলে তাঁহার গর্ভজাত কন্যাগুলি পার করার বেলায় যে ফাঁফরে পড়িতে হইবে। আর বিশেষ বাপাজীর নিজের যা' চেহারা।" [লোকগুলার অনধিকার-চর্চ্চা দেখুন!] সমবয়স্কেরা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন, "দাদা, ঠিকই বুঝেছ! সকালে যে মুখ দেখিয়া উঠিতে হইবে, 'সেই মুখখানি' যদি লক্ষ্মীর মত না হইয়া লক্ষ্মীর বাহনের মত হয়, যাঁহাকে শয়নকালে শয্যার্দ্ধ (অনেক সময়ে অর্দ্ধেকেরও বেশী) ছাড়িয়া দিতে হইবে, 'অর্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে' নিদ্রাভঙ্গে তাঁহাকে

আচম্‌কা দেখিয়া যদি পত্নীর পরিবর্ত্তে অন্য-কিছু-ভ্রমে আঁতকাইয়া উঠিতে হয়, তাহা হইলে বড় মুস্কিল বটে!" [লোকগুলার কি আস্পর্দ্ধা!] কিন্তু এ সব নিষ্কারণ-বন্ধুর আলোচনায় আমি তুষ্টও হই নাই, রুষ্টও হই নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার সাহস—স্নায়বিক ও 'নৈতিক'—উভয়ই যথেষ্ট, আমি অযাত্রাও মানি না, ভূতপেত্নীও মানি না। আর আমার রত্নগর্ভার গর্ভে যে হীরার টুকরা পুত্র না জন্মিয়া মাটীর ঢিবি কন্যা জন্মিবে, এরূপ আশঙ্কাও আমার মনে স্থান পায় নাই। সুতরাং এ সব কথা সুবুদ্ধির মত হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। তবে আমি প্রকৃত কি কারণে সাকারা সুন্দরী, ডানাকাটা পরী, স্বর্গের 'অপ্সরী' বিদ্যাধরী, 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী' চাহি, তাহা 'প্রকাশ করিয়া' কহিতেছি। আপনারা শুনিয়া নরজন্ম সার্থক করুন।

কাহিনী।

শিশুকালে শৈশব-সুলভ চপলতার দোষে যখনই কোনরূপ বায়না ধরিয়া কান্না যুড়িয়া দিতাম, তখনই স্নেহময়ী মা, পিসি-মা, ঠাকু-মা প্রভৃতি 'রাঙ্গা বৌ আনিয়া দিব, তাহার সহিত খেলা করিবে,' এই বলিয়া শান্ত করিতেন। কৃষ্ণনামে যেমন শ্রীরাধার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইত, আমার তেমনই রাঙ্গা বৌএর নামে ক্রন্দন থামিত। জানি না, সেই অজ্ঞান শিশুচিত্তে রাঙ্গা বৌএর কি মোহিনী শক্তি অনুভূত হইত! হয় ত গুরুজনের বাক্য বলিয়া এই স্তোকবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম, এমন কি, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ অবশ্যই ফলিবে, এ আশাও মনে-মনে পোষণ করিতাম। তবে তখনকার মনের ভাব এখন এ বয়সে ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। সকলেই ত কুপর, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা রবীন্দ্রনাথ নহে। যাহা হউক, এই-রূপে 'সুকুমার শিশুকাল শিক্ষার সময়' অতিবাহিত করিলাম।

যখন নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলাম না, তখন ঠাকু-মার মুখে রূপকথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার কোলের কাছে ঘুমাইয়া পড়িতাম। আর সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে কোন্ অচিন দেশের অচিন পুরীর কেশবতী রাজকন্যার মুখখানি, রাক্ষসপুরীর বন্দী অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকুমারীর মুখখানি, এইরূপ কত সুন্দর-সুন্দর মুখ স্বপ্নেও মনের ভিতর ওলটপালট করিত। সেই সুমধুর কল্পনার সোণার কাঠীর পরশে শরীর রোমাঞ্চিত হইত, হৃদয় সুখের সায়রে ভাসিত। এইরূপে বাল্যেই কোমলচিত্তে সুন্দরী বধূর ছবিখানি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছিল।

তাহার পর স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া, কয়েক বৎসর পরেই যখন লুকাইয়া-লুকাইয়া ইংরেজী, বাঙ্গালা উপন্যাস, নবন্যাস, রমন্যাস, রহোন্যাসের স্বাদ-গ্রহণ করিতে শিখিলাম (ইহার মধ্যে ফরাশী ও ফার্শী কেতাবেরও অনুবাদ ছিল), তখন কত নায়িকা-উপনায়িকা-প্রতিনায়িকার দর্শন পাইলাম, কত তিলোত্তমা-মনোরমা, মৃণালিনী-কুন্দনন্দিনী, রোহিণী-শৈবলিনী, রাধারাণী-কমলমণি, ইন্দিরা-সুভাষিণী, লবঙ্গলতা-সূর্য্যমুখী, কত ফ্লোরা-রোজা, রেবেকা-রাওয়েনা, মানস-নয়নে প্রতিভাত হইলেন; তাঁহারা সকলেই মনোমোহিনী সুন্দরী। ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গাতে অনুমানে বুঝিলাম, গৌরাঙ্গিনী না হওয়াতেই তাহার এই দুর্দ্দশা। প্রথম-যৌবনে এই সব লঘু-সাহিত্যপাঠে ভবিষ্যৎ সংসারসঙ্গিনীর যে মানসী প্রতিমা গড়িলাম, তাহা একেবারে চিত্তপট যুড়িয়া রহিল। কাহার সাধ্য, সেই উজ্জ্বল চিত্র মুছিয়া ফেলে?

আবার যখন কিঞ্চিৎ রসবোধ হইলেই কলিকাতায় পাঠকালে থিয়েটার দেখা সুরু করিলাম, তখন এইসব নায়িকা-উপনায়িকা-প্রতিনায়িকার ভূমিকা লইয়া যাহারা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হইত, তাহাদের ছলাকলা, লাস্যলীলা ও (কৃত্রিম) রূপরাগ-দর্শনে অন্তর্নিহিত রূপ-লালসা ও

সৌন্দর্য্য-পিপাসা আরও বর্দ্ধিত হইল। শৈশবে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, প্রথম-যৌবনে তাহা পল্লবিত হইতে লাগিল।

যাক্, এ সব বাজে বই ও বাজে কায লইয়া আর বাগাড়ম্বর করিব না। বাহিরের উপসর্গ ছাড়িয়া দিয়া, খাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলির ধাতু কিরূপে আমার প্রকৃতিতে মিশিল, এক্ষণে সেই কথা বলি।

বলা বাহুল্য, পরীক্ষা পাশ করিবার প্রয়োজনে ও প্রলোভনে যে সকল সাহিত্যগ্রন্থ প্রাণপণে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি ও প্রোফেসারের পদপ্রান্তে বসিয়া সরস ব্যাখ্যাবিবৃতিসহ অধ্যয়ন করিয়াছি, সেগুলির মর্ম্ম অস্থিতে-অস্থিতে মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম-যৌবনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাড় পাইয়া যে সকল মনোমোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ের দ্বার দিয়া 'প্রাণের প্রাণ-মাঝারে' প্রবেশ করিয়াছে, যাহাদিগের স্মৃতি উজ্জ্বলে-মধুরে মিশিয়া, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে, পাঠাগারে-পরীক্ষামন্দিরে, শৌচাগারে-জলখাবারের ঘরে, ছাত্রাবাসে-ক্রীড়াঙ্গনে ছায়ার মত haunt করিয়াছে, যাহাদিগের 'প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাঙ্কিত' রহিয়াছে, সেগুলিকে

"ভোলা যায় কি কথার কথা ?
প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা।
শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িতা লতা।"

এখন বহুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, পাঠ্য-পুস্তকগুলি কতক বিলাইয়া দিয়াছি, কতক বিক্রয় করিয়াছি, অধ্যাপকের মৌখিক বক্তৃতা ও ব্ল্যাক-বোর্ডে লিখিত লম্বা-লম্বা নোট, প্রকাণ্ডকায় অর্থপুস্তক ও প্রশ্নোত্তরমালা, রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠ কণ্ঠস্থ করা, পরীক্ষাফলের জন্য উৎকণ্ঠা, সংবাদপত্রে পরীক্ষার ফল-প্রকাশ, পাশের আনন্দ,—সবই অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে, সে সকলের স্মৃতি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু পঠদ্দশায় পাঠ্যপুস্তকের মারফত যে সব আদর্শ-

সুন্দরীর সাক্ষাৎকার-লাভে ধন্য হইয়াছি, তাহাদিগকে ত ভুলিতে পারি নাই। তাহারাই স্থায়িভাব, তাহারাই স্থাবর সম্পত্তি।
They have come to stay.

'প্রলয়ের জলে হায়
যদি বিশ্ব ভেসে যায়
তবু না ভুলিব তায়,
রাখিব কণ্ঠেরি হারে।'

যৌবনে দৃষ্ট সুন্দরী-স্বপ্ন (Dream of Fair Women) এখনও যে চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে স্বপ্ন টুটিবার নহে, সে মোহ ঘুচিবার নহে, সে স্মৃতি ভুলিবার নহে। রাজমিস্ত্রীরা ভাড়া বাঁধিয়া সৌধ নির্ম্মাণ করে, নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে ভাড়া খুলিয়া লয়, সুধাধবলিত সৌধ নয়নের সমক্ষে শোভা পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষাও সেই ভাড়াবাঁধা; ভাড়া বহুদিন হইল খুলিয়া লইয়াছে; কিন্তু এখনও সুন্দরী-কুলের সুধামাখা মুখ হৃদয়-ক্ষেত্রে শোভা পাইতেছে। এক-এক করিয়া বলি, আপনারা শ্রবণ করিয়া কর্ণ পবিত্র করুন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া (আমাদের সময়ে মাতৃকুলাসনের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন মহল বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। প্রথম মহল এল-এ বা এফ-এ পরীক্ষা (আধুনিক নাম ইন্‌টারমিডিয়েট অর্থাৎ মধ্য পরীক্ষা)। এই মহলে প্রবেশ করিতে গিয়াই গোল্‌ড্‌স্মিথের 'পরিত্যক্ত পল্লী'তে The bashful virgin's sidelong looks of love অর্থাৎ 'অজাতোপযমা নবযৌবনা'র 'তরল নয়নে তেরছ চাহনি'তে প্রাণে বিজলী খেলিয়া গেল। The matron's glance that those looks reproved অর্থাৎ বর্ষীয়সী পুরন্ধ্রীর তিরস্কার-পূর্ণ উগ্রদৃষ্টি যেমন উক্ত তরুণীর হৃদয়ে স্থান পায়

নাই, তেমনই আমারও মনে স্থান পাইল না। আর শৌণ্ডিকালয়ে সেই ব্রীড়াবতী বালার সুরাপাত্র প্রসাদী করিয়া দেওয়ার কথা—

The coy maid half-willing to be prest
Shall kiss the cup to pass it to the rest,

নবীনা গোপকুণ্ডারীর গীত ও নবীন গোপ-যুবকের দোয়ারকির কথা—The swain responsive as the milkmaid sung—সরলা পল্লীবালার সহরবাসের কুফলের কথা-প্রসঙ্গে তাহার কমনীয় সৌন্দর্য্যের কথা—

Her modest looks the cottage might adorn,
Sweet as the primrose peeps beneath the thorn,

উপনিবেশগামিনী অশ্রুমতী নবযুবতীর প্রণয়ীর সহিত চিরবিচ্ছেদে অন্তর্গূঢ় হৃদয়-বেদনার কথা—

His lovely daughter, lovelier in her tears

*   *   *   *   *

Silent went next, neglectful of her charms
And left a lover's for a father's arms—

'ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈঃ' হৃদয়ক্ষেত্রে কি সরসতা-সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বুঝিলাম, গোল্‌ড্‌স্মিথ্ অন্বর্থনামা, তিনি খাঁটি সোণার কারবার করিতেন।

আবার এই মহলের আর একটি প্রকোষ্ঠে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। বুঝিলাম, তিনিও অন্বর্থনামা, তাঁহার কথাগুলির (words) মূল্য (worth) আছে। আহা! তাঁহার Lucy—'গোধূলি-ললাটে তারারত্ন যথা'

Fair as a star, when only one
Is shining in the sky,
A lovelier flower
On earth was never sown,

ও তাঁহার হৃদয়তোষিণী সহধর্ম্মিণী—

'She was a phantom of delight
When first she gleamed upon my sight
A lovely apparition sent
To be a moment's ornament,

* * * *

A dancing shape, an image gay,
To haunt, to startle and waylay,

আমার হৃদয়-আকাশে যুগল-সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আবার কবির একবারমাত্রদৃষ্টা চতুর্দ্দশবর্ষ-দেশীয়া সুন্দরী-শিরোমণি হাইল্যাণ্ড-কুমারীকে আমারও কবির সঙ্গে সঙ্গে কতবার বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—

Thy elder brother I would be,
Thy father, anything to thee.

আহা! এই সব রসগর্ভ কবিতাপাঠে রসের যে রসদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার জোরে 'পন্তপাঠে'র 'কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ' উষ্ট্রের মত জ্যামিতি-ত্রিকোণমিতি-বীজগণিত-পাটীগণিত-প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মরুভূমি অনায়াসে পার হইয়া গিয়াছি, একটুও ক্লান্তিবোধ করি নাই।

এই মহলের আর একটি প্রকোষ্ঠে উত্তর দেশের যাদুকর (Wizard of the North)—আমাদের অবশ্য খাড়া পশ্চিম—তাঁহার যে মানসী কন্যা সরঃসুন্দরীকে (Lady of the Lake) আমার সমক্ষে হাজির করিলেন, তাহার মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য কি কখন ভুলিতে পারিব?

> And ne'er did Grecian chisel trace
> A nymph, a Naiad or a Grace
> Of finer form or lovelier face.

আহা! যেন একাধারে গ্রীকপুরাণোক্ত দেবলোকের সকল শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, যেন প্যাণ্ডোরা, যেন তিলোত্তমা!

শুধু যে পদ্যের খাসকামরায়ই এই সব সুন্দরীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম তাহা নহে, গদ্যের গোসলখানায়ও রসের খোরাকের অভাব ছিল না। গোল্ড্স্মিথের গদ্য-কাব্য Vicar of Wakefieldএ ওলিভিয়া-সোফিয়া দুই ভগিনীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া কতবার গের (Gay) ডাকাইত-সর্দ্দার ম্যাক্‌হিথের (Macheath) মত আনন্দ-গদ্গদ-কণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে—(৩)

> How happy could I be with either
> Were t'other dear charmer away.

আবার সেই গদ্য আখ্যায়িকার মধ্যে গ্রন্থকার যে দুইটি কবিতা গছাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে (lovely woman) রমণীয় রমণীর কথা

(৩) আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে' 'শালিবাহন' অক্ষয়ের যুগল-শ্যালিকা সম্বন্ধে উক্তি স্মর্ত্তব্য—

> ডান দিকেতে তাকাই যখন
> বাঁয়ের লাগি কাঁদেরে মন,
> বাঁয়ের দিকে ফিরলে তখন
> দক্ষিণেতে পড়ে টান।

এবং সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশধারিণী প্রেমময়ী এঞ্জেলিনার, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, রূপরাশির কথা, হৃদয়-পাষাণে চিরদিনের মত সুবর্ণ-অক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে।

কটমট ঐতিহাসিক ও জীবন-চরিতাত্মক পুস্তক হইলেও 'জেনোফন' নামক গন্ধ গ্রন্থখানি নিতান্ত ফেলনা নহে। হাজার হউক, গ্রীক জাতি সৌন্দর্য্যপ্রবণ ছিল, তাহারা সংগ্রাম-বর্ণনা ও দার্শনিকতত্ত্ব-প্রকটনের অন্তরালেও কাব্যরস ঢালিবার অবসর অবহেলা করে নাই, 'রণজয়' গায়িতে গিয়াও 'রমণীতে নাহি সাধ' বলিয়া কবুল জবাব দেয় নাই। Abradates and Panthea নামধেয় নায়কনায়িকার প্রেম-কাহিনীটি তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ। আবার গ্রীক-বাহিনীর শত্রুর দেশে শত শত ক্রোশ ধরিয়া বিপৎ-সঙ্কুল অভিযান-ব্যাপারের মধ্যেও 'Some pretty female captives were smuggled through'— এই জবর খবরে রসিক-হৃদয় নাচিয়া উঠে। কঠোরপ্রকৃতি ইতিহাস-বিশারদ প্রোফেসার মহাশয় যখন এই অংশটি পড়াইয়াছিলেন, তাঁহার তদানীন্তন মুখবিকৃতি এখনও বেশ মনে পড়ে! তাই বলিতে ইচ্ছা করে, শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকায় কেন, 'সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র'! বিশ্ববিদ্যালয় ত বিশ্ব-ছাড়া বিশ্বনাথের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত নহে, সুতরাং এখানেই বা ব্যতিক্রম হইবে কেন?

ইংরেজী সাহিত্যেরই যখন এই হাল, তখন আর আদিরসপ্রধান বলিয়া 'উচ্চশিক্ষিত'-সমাজে ধিক্কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের কথা তুলিয়া অনর্থক পুঁথি বাড়াইব না।

তাহার পর, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন মহল বাড়ীর প্রথম মহল পার হইয়া যখন দ্বিতীয় মহলে প্রবেশ করিলাম, অর্থাৎ বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন যে কি রমণীয় রমণী-রাজ্যে রসসঞ্চয়ে

রত হইলাম, তাহা আয়স-লেখনীমুখে প্রকাশ করা অসাধ্য। [বি-এ পরীক্ষায় রস-সাহিত্যের এত রসদ-সংগ্রহ কি 'বি-এ' ও 'বিয়ে'(৪) এই দুইটি শব্দের সাম্য-বশতঃ ? ইংরেজীজ্ঞ হয় ত বলিবেন, বি-এ অর্থাৎ Bachelor of Arts অবস্থায়ই যদি এই, তবে M.A. অর্থাৎ Married of Arts অবস্থায় কি হইবে ? অপরং কি ভবিষ্যতি ?] রসের ভাণ্ডারী এক দিকে শেক্স্পীয়ার, অপর দিকে কালিদাস। আবার শেক্স্পীয়ারের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ টেনিসন দোসর, শুধু গৌর নয়কো আমার, গৌর-নিতাই ! (আজকাল আবার, সাগর বৌএর মত বঙ্কিমচন্দ্রও একটি কুঠারী পাইয়াছেন। একেবারে চতুঃসাগরী !) টেনিসনের কবিতাগুলি অধুনা এক ধাপ নীচে নামিয়াছে, অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বোধ হয়, মাতৃকুলাসনে বয়োবৃদ্ধির দরুণ এই পরিবর্ত্তন। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' এখন ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের মিত্ররূপে গণ্য হয় ; সুতরাং এখন অনায়াসেই তাহারা 'অন্তর্মধ্য' অবস্থায়ই এই সব কবিতার রসগ্রহণসমর্থ হয়। যাক্, জাতব্যবসার ঝোঁকে এ সব কি আলোচনা (talking shop) আরম্ভ করিলাম ? আবার সেই রসের রাজ্যের কথা বলি।

দ্বিতীয় মহলে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া কি দেখিলাম ? দক্ষিণে ব্রহ্মর্ষি কণ্বের প্রাণসমা পালিতা দুহিতা শকুন্তলা—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈ-
রনামুক্তং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্ ॥

---

(৪) পল্লীগ্রামের 'বিয়ে' কলিকাতায় 'বে' হইয়াছে। ইংরেজীতে 'বি-এ' 'বে' হয় ! পল্লীগ্রামের মূর্খ লোকে বুঝি বাণান করিয়া বলে ? আর সহরে বিদ্বান্ লোকে বুঝি Look and Say প্রণালীতে এক ডাকেই বলিয়া ফেলে ?

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥
অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥

আর বামে রাজর্ষি প্রস্‌পেরোর প্রাণসমা দুহিতা

Admired Miranda !
Indeed the top of admiration ! Worth
What's dearest to the world ! Full many a lady
I have eyed with best regard, and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear : for several virtues,
Have I liked several women ; never any
With so full soul, but some defect in her
Did quarrel with the noblest grace she owed
And put it to the foil : but you, O you,
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best !

আহা! এই 'বিদেশিনী' যে আমার নিতান্ত আত্মীয়া দীনবন্ধুর লীলা-বতীকে স্মরণ করাইয়া দেয়,—

জানিত না পুরাকালে মহাকবিচয়
একাধারে এত রূপ বিরাজিত রয়।

তাই তা'রা বলিয়াছে অজ্ঞান-কারণ
ব্রজবালা বলে অতি মধুর বচন,

* * * * *

লীলায় দেখিত যদি তা'রা একবার
এক স্থানে বসে হ'ত রূপের বিচার।

আবার কি দেখিলাম? দক্ষিণে গ্রীকপুরাণোক্ত সাগরগর্ভজা এফ্রোডাইটি দেবী (অভ্রদুহিতা?) বা হিন্দুপুরাণোক্ত ক্ষীরোদসমুদ্রোত্থিতা সুধাভাণ্ডধারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় 'জগৎত্রয়ললামভূতা' সাগরিকা বা রত্নাবলী 'রত্নাবলীব',

শ্রীরেষা পাণিরপ্যস্য পারিজাতস্য পল্লবঃ॥
অম্ভোজগর্ভসুকুমারতনুস্তদাসৌ
কণ্ঠগ্রহে প্রথমরাগঘনে বিলীয়।
সদ্যঃ পতন্মদনমার্গণরন্ধ্রমার্গৈঃ
মন্যে মম প্রিয়তমা হৃদয়ে প্রবিষ্টা॥

এবং তাঁহার পার্শ্বে পাটরাণী বাসবদত্তা

আভাতি মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থা চাপযষ্টিরিব।

আর বামে য়িহুদিদুহিতা 'Pretty Jessica' 'most sweet Jew' 'wise, fair and true,'

এবং তাঁহার পার্শ্বে অপূর্ব্ব সুন্দরী পোর্শিয়া

Nothing undervalued
To Cato's daughter, Brutus' Portia.

আবার এই সুন্দরীযুগলের রূপচ্ছটায় নেত্রোৎসব সম্পাদন করিয়াও পাছে পরিতৃপ্ত না হই, তাই শেক্‌স্‌পীয়ারের 'ভাই লক্ষ্মণ' টেনিসন তাঁহার (Dream of Fair Women) 'সুন্দরীস্বপ্নে' সুন্দরীর মহামহোৎসব

লাগাইয়াছেন ; এই খোসরোজায়, এই রূপের হাটে, য়িহুদি, মৈশরী, গ্রীক, ইংরেজ, ফরাশী সকল জাতির রমণীরত্ন সৌন্দর্য্যের পশরা খুলিয়া বসিয়া আছেন। আর তাঁহার দুঃখিনী Oenone

Lovelier than whatever Oread haunts
The knolls of Ida, loveliest in all grace
Of movement,

এবং সৌন্দর্য্যাভিমানিনী গ্রীক দেবী Here (শচী), Athene (সরস্বতী) ও Aphrodite (রতি) রূপের ঝলকে রাজপুত্র প্যারিসের ন্যায় আমার চক্ষুঃ ঝলসাইয়া দিলেন ; আশা করি, আপনাদেরও এতক্ষণে সেই দশাই ঘটিয়াছে। অতএব আর তৃতীয় মহলের খবর না দিয়া—এইথানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।

সকল কথাই খুলিয়া বলিলাম। এক্ষণে আপনারাই বিচার করুন, যৌবনের প্রথম উন্মেষ-কালে এই সকল মোহিনী মূর্ত্তি চিত্তপটে প্রতিগ্রহ করিয়া, এখন কিরূপে একটা

খেঁদী, পেঁচী, বুঁচী, কচি, নেড়ী, ভূতী, থাকী,
নসী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শামী, গুলকী
সিন্দুরের বিন্দু-সহ কপালেতে উল্কী

পরিগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব ? *

---

* 'বৃত্তান্তটি আগাগোড়া কাল্পনিক' প্রবন্ধ-লেখক আরম্ভে এইরূপ সাফাই গায়িয়াছেন ; কিন্তু ইহাকে নিরবচ্ছিন্ন কাল্পনিকই বা বলি কি করিয়া ? এই রূপোন্মাদ ও তজ্জনিত বিবাহাতঙ্ক ক্রমেই আমাদের যুবকদিগের মধ্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে না কি ? কুক্কুরদংশনজনিত উন্মাদ ও জলাতঙ্ক রোগের পুরাতন ও আধুনিক উভয়বিধ চিকিৎসা আছে। কিন্তু এই নূতন রোগের প্রতিকার কি ?—সম্পাদক।

বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষ।

(উপসংহার নহে—সমূলে সংহার।)

[শ্রীআমোদর(১) শর্ম্মার মানস-কানন-কলিত]

(ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২১)

মুখবন্ধ।

কেহ কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকার উপসংহার (sequel) লিখিতে গিয়া একখানা গোটা বই লিখিয়া ফেলিয়াছেন; মূলগ্রন্থ অপেক্ষা উপসংহার আয়তনে বৃহত্তর ও ওজনে গুরুতর হইয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। যে দেশের টোল-চৌপাঠীতে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী হয়, যে দেশের বনে-বাদাড়ে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় হয়, যে দেশের মাটীর গুণে হাটে মাঠে বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি হয়, আর যে দেশের হাওয়ার জোরে ঘরদোরে পুত্র অপেক্ষা পুত্রের পরিত্যক্ত পুরীষের পরিমাণ দমে ভারী হয় [সাধুভাষায় লিখিলে আর গ্রাম্যতাদোষ থাকে না, ইহাই বাঙ্গালা সাহিত্যের রীতি], সে দেশে এরূপ ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

আজকাল গল্প-লেখা একটা সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পর্য্যন্ত এই ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে বর্ত্তমান লেখক এতদিন এই

---

(১) আমোদঃ উদরে যস্য স আমোদরঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু!

সংক্রামক রোগের প্রকোপে পড়েন নাই। এখন বুড়া বয়সে ধেড়ে রোগে ধরিল। কিন্তু আর রক্তের তেমন জোর নাই। নিরবলম্বে একটা ছোট, বড় বা মাঝারী গল্প লেখা আর এ বয়সে শক্তিতে কুলায় না। একটা আশ্রয় চাই, তাই 'বিষবৃক্ষে'র আশ্রয় লইলাম। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, একটা আশ্রয় না পাইলে মিছরি দানা বাঁধে না। তা' আমার এ গল্পও ত মিছরির টুকরা। অত্র প্রমাণং যথা জয়দেব ঃ—

সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ, শর্করে কর্করাসি,
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি, ক্ষীর নীরং রসস্তে।
মাকন্দ ক্রন্দ, কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ, গচ্ছন্তি যাব-
দ্ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্ বচাংসি॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার ক্ষমতা অল্প। তিনটি পরিচ্ছেদ লিখিতেই প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ! তবে গুণগ্রাহী সূক্ষ্মদর্শী সমজদার হইলে বলিবেন—Brevity is the soul of wit. In small proportions we just beauties see ; [ইংরেজীতে নজীর উদ্ধৃত করা উচ্চশ্রেণীর সমালোচকের দস্তুর]। আর ইহাও স্মরণ রাখিবেন—'স্বল্পং তথায়ুর্ব্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।' বাস্তবিক প্রেমের পথের ন্যায় গল্পপাঠেরও পথে নানা বাধাবিঘ্ন —যথা, অনেক মাসিক পত্রিকার পাতা কাটা থাকে না, ছবির নীচে বিষয়-বর্ণনের ন্যায় সূচীপত্রে, কোন্‌টা গল্প, কোন্‌টা প্রত্নতত্ত্ব, তাহা বিতং দিয়া বলিয়া দেওয়া থাকে না, গল্প কোন্ পৃষ্ঠায় আরম্ভ, তাহা মলাটে লিখিয়া দেওয়া হয় না, ইত্যাদি। পাঠকপাঠিকারা আশীর্ব্বাদ করিবেন—কেন না তাঁহাদের অমূল্য সময় অধিক নষ্ট করিলাম না। আরও সুবিধা—এই তিনটি পরিচ্ছেদ মূলগ্রন্থের সঙ্গে লেজুড়ের মত যুড়িয়া রাখিতে পারিবেন, স্বতন্ত্র দপ্তরী খরচা লাগিবে না।

আমার এই গল্পটি Classic কি Romantic Artএর নিদর্শন, ইহা লইয়া সমালোচক-মহলে ঘোরতর বিতণ্ডা উঠিবে, বুঝিতে পারিতেছি। আমি এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করাইতেছি যে, ইহা Classicও নহে, Romanticও নহে, ইহা Grotesque! পেশাদার সমালোচক-বর্গের এ বিষয়ে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কেন না, আমার রচনার আমিই একমাত্র আদিম ও অকৃত্রিম সমালোচক অর্থাৎ—আমারই তুলনা আমি এ মহীমণ্ডলে!

মুখবন্ধ বেজায় বড় হইয়া গেল। ক্ষতি কি? অনেক গ্রন্থের উপক্রমণিকা যে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা স্থূলকলেবর হয়। আবার অনেক স্থলে উপক্রমণিকাই বাহির হয়, মূলগ্রন্থ আর বাহির হয় না; যেমন অনেক গাছের কেবল ফুল হয়, ফল দেখা দেয় না। এক্ষেত্রে কিন্তু 'বিষবৃক্ষে'র উপবৃক্ষকে ফুলে ফলে সুশোভিত দেখিবেন। তবে অধিকাংশ ফুলফল বঙ্কিমচন্দ্রের রোপিত 'বিষবৃক্ষ' ও অন্যান্য কল্পনাবৃক্ষ (কল্পবৃক্ষ নহে) হইতে আহরণ (অপহরণ?) করিয়াছি। পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বৈষ্ণব বিনয়ে'র ভাষায় নিবেদন করিতেছি—'স্বর্গের শিঁড়ি আছে। লক্ষ যোজন শিঁড়ি ভাঙ্গিয়া স্বর্গে উঠিতে হয়। আমার এই সামান্য কাব্য স্বর্গও নয়—ইহার লক্ষ যোজন শিঁড়িও নাই। রসও অল্প, শিঁড়িও ছোট। এই নীরস মুখবন্ধটি সেই শিঁড়ি।' গল্পখোর পাঠক যদি অধীর হইয়া উঠেন, তবে প্লুতগতিতে শিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া গল্প পড়িতে পারেন—যথা ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস!

পুনশ্চ নিবেদন—টেটের ঝুঁটা হীরার ন্যায় টেটের ঝুঁটা 'কিং লীয়ার' নাটকে কর্ডিলিয়ার নূতন ঘরকরনা পাতানর ন্যায় কুন্দনন্দিনীর নূতন ঘরকরনা পাতান দেখিয়া যদি পাঠকের উপসংহারে অরুচি হয় এবং উপসংহারককে সংহার করিতে রুচি হয়, তবেই সকল শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। ইত্যলমতিবিস্তরেণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফুরাইয়াও ফুরাইল না বা শ্মশানে সন্ন্যাসী।

'স্বামীর চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল।' এবংবিধ আকস্মিক ও শোকাবহ ঘটনায় নগেন্দ্রনাথ, সূর্য্যমুখী ও কমলমণি তিন জনেই শোকে মুহ্যমান। এই বিপদে বাটীর বহুদিনের বিশ্বস্ত দেওয়ান বুক দিয়া পড়িলেন। নগেন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজনকে লইয়া দেওয়ানজী একটি মন্ত্রণা-সভা বসাইলেন। অল্পক্ষণ গোপন-পরামর্শের পর নিকটস্থ পুলিশের থানায় একজন বিশ্বস্ত ও সুচতুর কর্ম্মচারী পাঠান হইল। সে লোক ফিরিয়া আসিলে সার্ব্বভৌম ঠাকুরকে ডাকা হইল। তিনি আনুপূর্ব্বিক ঘটনার বিবরণ শুনিয়া "আত্মনস্ত্যাগিনাং নাস্তি পতিতানাং তথা ক্রিয়া। তেষামপি তথা গঙ্গাতোয়ে সংস্থাপনং হিতম্॥ ইতি স্মরণাৎ, তস্মাৎ অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং দহনাদি-নিষেধঃ"—ইত্যাদি স্মৃতির বচন আওড়াইলেন এবং গম্ভীরভাবে ব্যবস্থা দিলেন—যেহেতু আত্মঘাতিনীর দাহকার্য্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, অতএব মৃতদেহ যথাবিধি জলসাৎ করা হউক। [যদিও কুন্দ মরণের সময় গান গায়িতে গায়িতে বলিয়া যায় নাই "প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহ্নিতে মোরে," তথাপি শাস্ত্রের বিধানে তাহাই দাঁড়াইল।] দেওয়ান লোকজন ডাকাইলেন। স্বজাতীয় বাহকগণ মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া শ্মশানঘাটে গেল, 'নগেন্দ্রনাথ ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক' শবের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। বাহকেরা শব গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া 'শ্মশান-বৈরাগ্য' লইয়া গৃহে ফিরিল। নগেন্দ্রনাথও শূন্যমনে উদাসপ্রাণে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

[পাঠকবর্গ হয় ত এখানে আপত্তি তুলিবেন, কই বঙ্কিমচন্দ্র ত এত কথা বলেন নাই। তিনি শেষটা সংক্ষেপে সারিয়াছেন বলিয়াই এত কথা বলিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু মৃতদেহ যে দাহ করা হইয়াছিল, এ কথাও ত তিনি স্পষ্টতঃ বলেন নাই। বরং 'সেই অতুল স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন,' ৪৯এর পরিচ্ছেদে লিখিত এই কথা কয়টিতে কি ইহাই বুঝাইতেছে না যে, বিজয়া-দশমীতে প্রতিমা-বিসর্জ্জনের মত সেই স্বর্ণপ্রতিমাও গঙ্গাজলে নিমজ্জিত হইল? পরন্তু তিনি চিতাগ্নির বা চিতাভস্মের উল্লেখ করেন নাই। 'কপালকুণ্ডলা'র শেষ কথায়ও ঐরূপ গলদ ছিল। তাহার ফলে 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার হুঁস হইয়াছিল, তিনি পরবর্ত্তী সংস্করণে শেষটুকু শোধরাইয়া দিয়াছিলেন। আমরাই বা এরূপ সুযোগ ছাড়িব কেন? এই জন্যই প্রবাদবাক্যে আছে, "পুড়বে নারী উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই।"]

'সেই অতুল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া' সকলে চলিয়া গেল। শ্মশানে সমস্ত নিস্তব্ধ। এমন সময় শ্মশানঘাটে এক জটাজূটধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখা দিলেন। [পাঠকবর্গ হয়ত ভাবিয়া বসিবেন, এ বুঝি হিজলীর কাপালিক, কপালকুণ্ডলার মৃতদেহ খুঁজিতে আসিয়াছেন। কিন্তু একটু অবহিত হইয়া পাঠ করিলে এরূপ ঠিকে ভুল করিবেন না—এ 'কপালকুণ্ডলা'র নহে, 'বিষবৃক্ষে'র জের।]

[বিংশ-শতাব্দীর চা-'চিনি'-খোর 'নবীন সন্ন্যাসী'র কথা ছাড়িয়া দিলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃপায় আমাদিগের রকম রকম সন্ন্যাসীর দর্শনলাভ ঘটিয়াছে। সন্ন্যাসী কভু যোগী, কভু ভোগী। কখন বা কামকলাকুশল পরদাররত নবীন যুবক শশিশেখর ভট্টাচার্য্য নবযুবতীসম্ভোগান্তে 'ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু' শমদমাদিভূষিত 'অভিরামস্বামী' সাজিয়াছেন; কখন

বা ঘোর তান্ত্রিক অঘোরঘণ্ট-সদৃশ কাপালিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য যুবতী পালন করিতেছেন; কখন বা মাধবাচার্য্য দেশ-উদ্ধারের জন্য যুবতী মৃণালিনীকে লুকাইয়া রাখিতেছেন; কখন বা আনন্দস্বামী যুবতী শিষ্য-কন্যার চোক বাঁধিয়া বিবাহ দিতেছেন ও শুভদৃষ্টি (?) করাইতেছেন; কখন বা রামানন্দস্বামী শিষ্যের সুখসাধনের জন্য যুবতী শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছেন; কখন বা 'সন্ন্যাসী মহাশয়' শচীন্দ্রকে অনূঢ়া যুবতীর বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যুবতী ললিতলবঙ্গলতার বন্ধ্যা দশা ঘুচাইবার জন্য ঔষধপ্রদান করিতেছেন ও তাঁহাকে স্বামি-বশী-করণ-বিদ্যা শিখাইতেছেন এবং যুবতী ফুলওয়ালী রজনীকে চক্ষুঃ দান করিতেছেন; কখন বা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী শিবপ্রসাদ শর্ম্মা মুমূর্ষু রমণীকে (অবশ্য মাতৃজ্ঞানে) কোলে তুলিতেছেন; কখন বা ভবানী ঠাকুর যুবতী প্রফুল্লকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, আবার কখন বা রাজনীতিজ্ঞ সন্ন্যাসী 'সন্তান'গণ স্বীয় যুবতী পত্নীর অথবা অভাবে পরস্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হইতেছেন। ফলতঃ যেখানে ষোড়শী, সেই খানেই সন্ন্যাসী! জানি না এ সন্ন্যাসীর আবার কি নূতনতর ঢঙ। আচ্ছা গোপনে সন্ন্যাসীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক। (জনান্তিকে)] *

সেই 'অতুল স্বর্ণপ্রতিমা' 'গঙ্গাজলপ্রবাহ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে' চলিতেছে, সন্ন্যাসী সেই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পরক্ষণেই যেন একটু উন্মনাঃ হইলেন, কি যেন একটা ক্ষীণ স্মৃতি আবছায়ার মত মনে আসিতেছে আসিতেছে, আসিতেছে না। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া, তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে সেই মৃত, 'মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোক-

---

* লেখক দেখিতেছি, প্রকৃতই আমোদর—আমঃ (অপক্কঃ) উদরে যস্ত। বঙ্কিম-চন্দ্রের সন্ন্যাসি-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান নিতান্তই অপক্ক।—সম্পাদক।

টিকে তুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন', ক্ষীণ দেহযষ্টি সহজেই তীরে আনিতে পারিলেন। একটা পরিষ্কৃত স্থানে শব রক্ষা করিয়া তিনি তৎপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বসিয়া বসিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া, অনিমিক্ লোচনে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরক্ষণেই, কেন জানি না,—একটি ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাহার পর, অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, চারিদিক্ চাহিয়া, কেহ কোথাও আছে কিনা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া, শেষে আস্তে আস্তে সেই মুখখানির কাছে, অতি কাছে, মুখ আনিয়া, অধরে ধীরে ধীরে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিলেন। বর্ত্তমান 'গ্রন্থকার প্রাচীন' না হইলেও চল্লিশ পার হইয়াছেন, সুতরাং চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়াছেন, 'লিখিতে লজ্জা নাই, ভরশা করি মার্জ্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।'

এই আকস্মিক উত্তেজনা অন্তর্হিত হইলে, সন্ন্যাসী প্রকৃতিস্থ হইয়া 'সেই শবের নিকট বসিলেন, বসিয়া কপোলে করলগ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন; অনেক প্রকার অপরের অপরিজ্ঞাত পরীক্ষা করিলেন। তখন মনে মনে বলিলেন, এখনও সময় আছে।' তখন তিনি স্কন্ধ হইতে ঝুলিটি নামাইয়া ঝুলির ভিতর হইতে একটি Stomach pump বাহির করিলেন এবং যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নানারূপ অদ্ভুত প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। 'এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল।' [বঙ্কিমচন্দ্রের সময় এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ততটা রেওয়াজ ছিল না, তাই 'আনন্দমঠে' বা 'কৃষ্ণ-কান্তের উইলে' ইহার উল্লেখ নাই।]

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের গুণেই হউক আর সন্ন্যাসীর হাতসাফাইএর ফলেই হউক, [অথবা কুন্দর অদৃষ্টে আরও ভোগ আছে বলিয়াই হউক], ক্রমে মৃতদেহে চেতনার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রথমে হৃদয়ের ঈষৎ

স্পন্দন, তাহার পর গণ্ডদেশে ঈষৎ রক্তসঞ্চার, তাহার পর চক্ষুর পাতা অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল, তাহার পর হস্তপদ অল্প অল্প নড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী 'অঙ্গুলীতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। ক্রমে নিশ্বাস প্রখরতর বহিতে লাগিল। নাড়ীতে হাত দিয়া দেখিলেন, নাড়ীর গতি হইয়াছে। শেষে অল্পে অল্পে পূর্ব্বদিকের প্রথম প্রভাতরাগ-বিকাশের ন্যায়, প্রভাত-পদ্মের প্রথমোন্মেষের ন্যায়, প্রথম প্রেমানুভবের ন্যায়' কুন্দ-নন্দিনী 'চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন'। কুন্দর 'নিশ্বাস বহিল.' কুন্দ 'বাঁচিল'। একবার কুন্দ সেই নিমীলিত নীলকমলনিভ নয়নদ্বয় খুলিল, আবার পরক্ষণেই মুদ্রিত করিল। চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়াই সে জড়িতকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল—স্বর বড় ক্ষীণ—তখনও বিষের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই —"নাথ, এতদিনে কি দাসীরে মনে পড়িল ?" [নাটকাকারে পরি-বর্ত্তনের সময় নাটককার "মনে কি পড়েছে তোমার দাসী ব'লে গুণমণি, বল কি দোষে বঞ্চিত শ্রীপদে দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী," মতিরায়ের গানটির ইত্যাকার পরিবর্ত্তন করিয়া থিয়েটারের সুর-সংযোগ করিয়া দিবেন।]

কথাগুলি বলিয়াই কুন্দ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ধীরে, সুন্দরি, ধীরে। এখনও তুমি বড় দুর্ব্বল। বেশী কথা কহিও না। আইস, তোমাকে একটু বলকারক ঔষধ দিই।" কথা কয়টি কুন্দের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা-মাত্র কি যেন এক অজ্ঞাত আবেশে তাহার সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হইল। [এই রোমাঞ্চ হইতেই কি রোম্যান্সের উদ্ভব ?] দেখিতে দেখিতে আবার কুন্দর চৈতন্যলোপ হইল।

সন্ন্যাসী ঝুলি হইতে একটি বৃহৎ ও একটি ক্ষুদ্র কাচপাত্র বাহির করি-লেন এবং ক্ষুদ্র পাত্রটিতে বৃহৎ পাত্র হইতে রক্তবর্ণ আরক ঢালিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল মিশ্রিত করিলেন এবং সেই মহোপকারী তেজস্কর ঔষধ অল্প অল্প করিয়া কুন্দকে পান করাইয়া দিলেন। কুন্দ দুই একবার মুখ

বিকৃত করিল, কিন্তু গলাজ্বালা বা বুকজ্বালার লক্ষণ দেখা গেল না। উগ্র বিষ তখনও তাহার শরীরে ছিল—এ যে বিষস্য বিষমৌষধম্।

তাহার পর, লোটায় দুগ্ধ ছিল—এক গৃহস্থ সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহার সেবার জন্য ঘরের গরুর দুধ দিয়াছিল—সন্ন্যাসী সেই দুগ্ধ কুন্দকে খাওয়াইবার ইচ্ছা করিলেন কিন্তু দেখিলেন, দুধটা বড় ঠাণ্ডা। পাছে ঠাণ্ডা দুধ খাওয়াইলে কোনরূপ ব্যাসিলি শরীরে প্রবেশ করে, সেই আশঙ্কায় সন্ন্যাসী দুধটুকু গরম করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঝুলি হইতে Kerosene Stove বাহির করিলেন, কিন্তু দেখিলেন তৈলটা সব পড়িয়া গিয়াছে। [Icmic Cooker তখনও হয় নাই।] একটি চিতায় সামান্য একটু আগুন জ্বলিতেছিল, কিন্তু অনেক সন্ধানেও কাঠ বা খড় পাইলেন না। সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন, আর এক একবার কুন্দর দিকে চোরা চাহনি চাহিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল, কুন্দ দুই হাত দিয়া কি একটা জিনিশ বুকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে—অসাড় হাত দুইটি সরাইয়া দেখিলেন—চিঠির তাড়া! 'নগেন্দ্রনাথ দেওয়ানকে যে পত্র লিখিতেন কুন্দ সেগুলি চাহিয়া আনিয়া পড়িত। পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিত না।' এ সেই সব চিঠি। বিষপানের সময়ও কুন্দ 'দয়িতের লেখা' সে চিঠিগুলি বুক হইতে নামায় নাই। এখন সন্ন্যাসী ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিগুলি লইয়া শ্মশানের আগুনে ধরাইয়া দুগ্ধ গরম করিতে লাগিলেন। কথায় বলে—যাকে রাখ সেই রাখে। [হরমণি বা গৌরীঠাকুরাণীর মত অনুগতা শিষ্যা না থাকাতে সন্ন্যাসীকে নিজেই সব করিতে হইল।]

সন্ন্যাসী 'দুধ তপ্ত করিয়া অল্প অল্প করিয়া কুন্দকে পান করাইতে লাগিলেন।' পরে আর এক ডোজ 'বলকারক ঔষধ'ও দিলেন। "তোমার কি কোন কষ্ট হইতেছে?" এই প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সন্ন্যাসী নিজের উরু-উপাধানে কুন্দর মস্তক রক্ষা করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে কুন্দর দেহলতা শিহরিয়া উঠিল। 'আরে ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি! তুমি সন্ন্যাসীর স্পর্শে কাঁপিলে কেন? ছি! ছি! কুন্দ-নন্দিনি! সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিলে কেন? কুন্দ-নন্দিনি! দেখ, গঙ্গার জল পরিষ্কার, সুশীতল, সুবাসিত—বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না? কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।' উঃ কুন্দ কি নির্লজ্জ! সন্ন্যাসী কি ভণ্ড! [থিয়েটারের কুন্দ এইখানে চক্ষুঃ বুজিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর সুশ্রাব্য গুন্ গুন্ স্বরে গায়িবে—'এ কেমন যোগী, ছি ছি লাজে মরি,' অথবা 'ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী'!]

মধ্যম পরিচ্ছেদ।

আবার মুখ ফুটিল (ছুটিল ?) বা সওয়াল জবাব।

কুন্দ সন্ন্যাসি-'প্রদত্ত মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিয়া, মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল, আর তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণ-পথে পান করিয়া মৃত-সঞ্জীবিতা হইতে লাগিল।' 'উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে সে চক্ষুরুন্মীলন করিল।' 'প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল।' সে বলিল,—"আমি কোথায়? আপনি কে? আমি বিষপানে সকল জ্বালা জুড়াইয়াছিলাম—'আমি মরিয়াছিলাম, আপনি কেন আমাকে বাঁচাইলেন?' আপনি কি নিষ্ঠুর!" [উপসংহারকারীও কম নহেন।]

সন্ন্যাসী গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—"একে একে তোমার সকল কথার উত্তর দিতেছি। কিন্তু আগে জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি মরিবে কেন?'" কুন্দ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—'মরিবারও কি আমার অধিকার নাই?' সন্ন্যাসী বলিলেন, "'পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।'

আবার জিজ্ঞাসা করি 'তুমি কেন মরিবে?' কি জন্য বিষ পান করিলে?"

কুন্দ চিরদিনই অল্পভাষিণী। সে সূর্য্যমুখী বা রোহিণী বা কল্যাণীর মত তর্কবিতর্ক না করিয়া, আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া, সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তরে, বাল্যাবধি যাহা যাহা ঘটিয়াছে, অল্প কথায় সেই কাহিনী বলিল। বসন্তারম্ভে কোকিলের কুহুরবের মত, সে মধুর কণ্ঠস্বর সন্ন্যাসীর হৃদয়ে কি যেন এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ আনয়ন করিল। সে কণ্ঠস্বর কি কোমল, কি মধুর—'যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইয়াছে।' কথা শেষ করিয়া কুন্দ গদ্গদ-কণ্ঠে বলিল " 'কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী,' আমার এ নীরব প্রেমের মর্ম্ম তুমি কি বুঝিবে?"

সন্ন্যাসী কুন্দর কুন্দসন্নিভ-দন্তরুচিকৌমুদী দেখিতে দেখিতে, তাহার অমৃতস্রাবি-বচনবিন্যাস শুনিতে শুনিতে, তাহার পক্কবিম্বসদৃশ অধরের স্ফুরণ, হৃদয়ের স্পন্দন, গণ্ডের রক্তিমা, নয়নের নীলিমা, অঙ্গের সুষমা হেরিতে হেরিতে, কি জানি কেমন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। কুন্দর শেষ কথা কয়টি শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"কি বলিলে, আমি সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী হইলেও আমারও রক্তমাংসের শরীর। জীবানন্দ-ভবানন্দ ভায়ারা কি সন্ন্যাসী ছিলেন না? সকলেই কি মাধবাচার্য্যের মত নিরেট পাষাণ? তবে আমার কাহিনী শুন। শ্রান্তিবোধ কর ত আমার স্কন্ধে মাথা রাখ।"

কুন্দর কেমন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সঙ্কোচ বা লজ্জাবোধ হইল না। সে যন্ত্র-চালিতের ন্যায় সন্ন্যাসীর আদেশ-মত তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিয়া চক্ষুঃ মুদ্রিত করিল। এ কি সন্ন্যাসীর 'যোগবল না Psychic Force'—না আর কিছু?

সন্ন্যাসী তখন আকুলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"আমি চিরদিন এমন সন্ন্যাসী ছিলাম না। আমিও এক দিন সংসারী ছিলাম। কিন্তু নিজের কর্ম্মদোষে সব হারাইয়াছি। শুন, 'আমার বিয়ে হয়েছিল এক দেবকন্যার সঙ্গে।' 'আমিও একজনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতাম।' কিন্তু কুসংসর্গে পড়িয়া সে রত্ন অবহেলা করিয়াছিলাম। 'আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?' 'কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম, কিন্তু সে কথায় কাজ নাই। সর্পের মণি থাকে, আমারও বিদ্যা ছিল।' নেশাটা আশটা করিতাম, ইয়ার-বন্ধুর সঙ্গে অস্থানে কুস্থানে ঘুরিতাম, গান গায়িতাম, ব্রহ্মসমাজে বক্তৃতা দিতাম; আরও অনেক রকম বুজরুকি শিখিয়াছিলাম। একজন সন্ন্যাসীর কাছে তুকতাক ঝাড়ফুক কিছু কিছু শিখিয়াছিলাম, কুম্ভক-যোগটাও অভ্যাস করিয়াছিলাম। মদে আর নেশা হয় না বলিয়া একদিন তাহার সঙ্গে ভাঙ্গ মিশাইয়া খাইলাম। হুহু করিয়া জ্বর আসিল। পাড়াগাঁয়ে থাকিতাম, ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছিল; তাই প্রথম প্রথম ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। মদের ডোজ আরও চড়াইলাম।

"একদিন খেয়াল হইল, কুম্ভক-যোগ-প্রভাবে মৃত্যুর ভান করিয়া থাকি। তাহাই করিলাম, তিন দিন আড়ষ্ট হইয়া সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিলাম। লোকে প্রথমে ভাবিল, বিকারের ঘোর, শেষে বুঝিল, মৃত্যু। ইয়ার-বন্ধু কাঁধে করিয়া শ্মশানে লইয়া গেল। (ন্যায় কচকচি মহাশয় বলিতেন, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ। সকলেই নেশায় চুরচুরে। যখন তাহারা চুল্লী সাজাইয়া আমাকে তাহা উপর তুলিয়া শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করিল, আমি তখন বেগতিক বুঝিয় এক বিরাট্ হুঙ্কার ছাড়িলাম। 'যদি তন্মুহূর্ত্তে শ্মশান-মধ্যে বজ্রপত হইত তাহা হইলেও শববাহকেরা অধিকতর চকিত হইয়া উঠিতেন না আমাকে দানোয় পাইয়াছে মনে করিয়া, যে যে দিকে পারিল, ছুটি

পলাইল। পাছে কেহ কাপুরুষ মনে করে, এই ভয়ে বোধ হয় তাহারা বাড়ী ফিরিয়া গিয়া কাহাকেও কিছু বলে নাই।

"এইরূপে তাহারা 'অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।' অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, গ্রাম হইতে কেহ আমার তত্ত্ব লইতে আসিল না। আমি তখন সে শ্মশানভূমি ত্যাগ করিলাম।

"সকলে জানিয়াছে, আমি মরিয়াছি। তাই আর ঘরে ফিরিলাম না। মনে মনে একটু লজ্জা, একটু ঘৃণা, একটু আত্মধিক্কারও হইল। খেয়ালের পরিণাম দেখিয়া আমার চৈতন্য হইল। আমি একবস্ত্রে, পদব্রজে কলিকাতা রওনা হইলাম। 'আমার দোষ গুরুতর, প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।' 'কোন দিন উপবাস, কোন দিন ভিক্ষা।' 'ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে।' ক্রমে কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

"কলিকাতায় আসিয়া শান্তির আশায় জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। পূর্ব্বের কুঅভ্যাসগুলি ছাড়িয়া দিলাম। মাষ্টারীটা মৌতাত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া একটা প্রাইভেট পড়ান যোটাইলাম, গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় হইল। অবসরকালে ডাক্তারী শিখিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, মাষ্টারীর চূড়ান্ত করিয়াছি, এবার ডাক্তারী করিব—হাজার হউক, স্বাধীন ব্যবসায়। পাশকরা নই বলিয়া কোন ডাক্তারী স্কুল-কলেজে প্রবেশাধিকার পাইলাম না। [হতফরক্কা ডাক্তারী স্কুলগুলার তথনও সৃষ্টি হয় নাই।] চিকিৎসার চরম করিব বলিয়া ডাক্তারী যন্ত্র, কবিরাজী মুষ্টিযোগ, হোমিওপ্যাথির বাক্স ও বই, সমস্তই সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই পসার জমাইতে পারিলাম না।

"রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে, সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইলাম। ভাবিলাম, নর-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিব। সন্ন্যাসীর ঝুলিতে ডাক্তারী যন্ত্র, হোমিওপ্যাথি বই ও বাক্স, কবিরাজী গাছগাছড়া ও দুই একটা সন্তঃ-

ফলপ্রদ তেজস্কর ঔষধ, সবই রাখিলাম। যখন পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিলাম, তখন হয় ত পরোপকারে এ সকলেরও প্রয়োজন হইতে পারে, এই মনে করিয়া কিছুই ছাড়িলাম না। আজ দেখিতেছি ঠিকই করিয়াছিলাম। এ সব সঙ্গে না থাকিলে ত তোমায় বাঁচাইতে পারিতাম না, কুন্দ!"

সন্ন্যাসী শেষ কথাগুলি এমন করুণ কোমল স্বরে উচ্চারণ করিলেন যে, কুন্দ একেবারে গলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কি করিয়া তাহার নাম জানিলেন, এ কথা একবারও কুন্দর মনে উদয় হইল না।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। তাহার পর, একটু সামলাইয়া, দুই একটা ঢোক গিলিয়া, গলাটা একটু ঝাড়িয়া, কুন্দর মুখপানে কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া, সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুন্দ, তোমার স্বামীকে মনে পড়ে?"

কুন্দ লজ্জায় জড়সড় হইয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"কোন্ স্বামীকে প্রভু? আপনাকে ত সব কথাই বলিয়াছি। আর কেন আমাকে মিছামিছি লজ্জা দেন?" এই বলিয়া কুন্দ 'দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল।'

সন্ন্যাসী একটু সমজাইয়া, একটু অপেক্ষা করিয়া, বলিলেন,— "তোমার প্রথম পক্ষের স্বামীর কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। তিনি কি তোমায় ভালবাসিতেন না?"

সন্ন্যাসীর কথা না ফুরাইতেই কুন্দ বলিল--'কুন্দ আজ বড় মুখরা'— "ভাল মনে নাই। স্বপ্নদৃষ্ট মানুষের ন্যায় অল্প অল্প মনে পড়ে। আর কয়দিনই বা তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলাম? তিনি ত প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিতেন। যখন ঘরে আসিতেন, তখনও প্রকৃতিস্থ থাকিতেন না। আর তাঁহার ভালবাসার কথা? 'প্রণয়ের বিষয় আমার সঙ্গে

তাঁহার কতদূর ছিল, বলিতে পারি না ; কিন্তু একটা পোষা বানরীর সঙ্গে একটু একটু ছিল।' "

সন্ন্যাসী মুখ বিকৃত করিলেন। কুন্দ ভাবিল, সন্ন্যাসী তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছেন। সে একটু যেন অপ্রতিভ-ভাবে বলিল,—"প্রভু, জানি পতিনিন্দা পাপ। কিন্তু—"

সন্ন্যাসী তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, কুন্দ, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। লজ্জা করিও না, দ্বিধাবোধ করিও না, স্বরূপ বল। তোমার প্রথম পক্ষের স্বামীকে যদি ফিরিয়া পাও তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রহণ কর কি ?"

কুন্দ সন্ন্যাসীর স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালিকার মত বহুক্ষণ রোদন করিল। 'ইহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল। যে শোকের রোদন নাই, সে যমের দূত।'

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, আজও নগেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পার নাই। না বুঝিয়া তোমার মনে ব্যথা দিলাম। নিভান অনল জ্বালিয়া দিলাম। অপরাধ লইও না। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি। নগেন্দ্র-নাথের প্রতি তোমার যে ভালবাসা তাহা আশ্রয়দাতার নিকট আশ্রয়-হীনার কৃতজ্ঞতা ; তুমি সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকা, তাই কৃতজ্ঞতাকে প্রণয় বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলে। কৃতজ্ঞতা প্রণয় নহে। তাহা যদি হইত, তবে রজনী অবশ্যই অমরনাথের প্রতি প্রণয়শালিনী হইত। আমার এই কথাটি প্রণিধান করিও।" [সন্ন্যাসী ঠাকুরের দেখিতেছি বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীও বেশ পড়া ছিল।]

কুন্দ এবার একটু জোর গলা করিয়া বলিল,—"না প্রভু, আপনি উল্টা বুঝিলেন। মনে করিয়াছিলাম, 'আপনি কামচর না অন্তর্যামী ?' 'এতক্ষণে জানিলাম আপনি অন্তর্যামী নহেন।' আমি আর আমার

আশ্রয়দাতা নগেন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্তা নহি। বিষের জ্বালায় সে ঘোর কাটিয়াছে। এখন আমার পূর্ব্বস্বামীকে পাইলে মাথায় করিয়া রাখি। কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। তিনি অনেক দিন হইল অভাগিনীকে ফাঁকি দিয়াছেন। তিনি থাকিলে কি আমার এই দুর্দ্দশা হয়? হায়, 'কি করিলে যেমন ছিল, তেমনি হয়?'"

কুন্দ আরও কি বলিতে যাইতেছিল। সন্ন্যাসী তখন চাপাগলায় বলিতে লাগিলেন—'গলাটা যেন ধরা ধরা'—"কুন্দ, আমি ত মরা মানুষ বাঁচাইতে পারি, প্রত্যক্ষ করিলে। তুমি যদি তোমার পূর্ব্ব-স্বামীকে গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হও, তবে এখনই তাঁহার পুনর্জীবন দিই। মাতাল বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিও না। স্বামী মাতাল হইলেও নিজের ধর্ম্মপত্নীর প্রতি প্রণয় কখন বিস্মৃত হয় না। নগেন্দ্রনাথকে দিয়াই দেখ না কেন?"

কুন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"প্রভু, আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিলেই তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন কেন? আমি বিধবা হইয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া ব্যভিচারিণী হইয়াছি, তাঁহার অস্পৃশ্যা।"

সন্ন্যাসী প্রসন্নবদনে বলিলেন,—"বিষপানে তোমার সে ব্যভিচার-দোষের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। নতুবা শৈবলিনীর মত তোমার কঠোর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। 'তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জন্ম হইয়াছে।' কিন্তু আমি তোমাকে কল্যাণীর ন্যায় আবার বিবাহে মতি দিতেছি না, পূর্ব্বস্বামীকে গ্রহণ করিতে বলিতেছি। তিনিও স্বচ্ছন্দে তোমাকে গ্রহণ করিতে পারেন। কলিকাতায় থাকিতে গোল-দীঘীতে মাঝে মাঝে ধর্ম্মবক্তৃতা শুনিতাম। 'গীতা'র একটি শ্লোক শুনিয়াছিলাম, তোমাকে শুনাইতেছি। "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি

নবানি দেহী॥" ইহাতে বেশ বুঝিতেছি, তুমি এক্ষণে অপাপবিদ্ধ। [গীতা লইয়াও নাড়াচাড়া আছে, একেবারে ভবানন্দ ঠাকুর !]

সন্ন্যাসী এবংপ্রকার আশ্বাস দিলে, কুন্দ 'সজল-নয়নে, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে, জগদীশ্বরের নিকট ভিক্ষা করিলেন, "হে পরমেশ্বর যদি তুমি সত্য হও, তবে যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।'" ['সূর্য্যমুখীও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।' পুস্তকের 'অন্ত্যকালে সবাই সমান']

এই কথা বলিতে বলিতে কুন্দ সেই কঠিন শ্মশানভূমিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

উত্তম(২) পরিচ্ছেদ

আমার কথাটি ফুরাল, কাঁটানটেগাছটি
(সাধুভাষায়, বিষবৃক্ষ) মুড়াল।

কতক্ষণ কুন্দ মূর্চ্ছিত অবস্থায় ছিল, জানি না। যখন সে চক্ষুঃ মেলিল, তখন সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে যুগপৎ বিস্মিত ও উৎফুল্ল হইল। সন্ন্যাসীর জটাজূট অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার নিম্নে চেরা সীঁথি দেখা দিয়াছে ; গেরুয়ার স্থান কালাপেড়ে ধুতী ও সিল্কের পাঞ্জাবী অধিকার করিয়াছে ; হাতে লোটা-চিমটার বদলে রূপাবাঁধান ছড়ি ও সিগরেট-কেস্ শোভমান ; পাএ খড়মের পরিবর্ত্তে চীনাবাড়ীর গ্রীশ্যান স্লিপার। [সবই সন্ন্যাসীর ঝুলিতে ছিল। দোহাই পাঁচকড়ি বাবু, ডিটেক্‌টিভের কাছ হইতে চুরি নহে। বিশ্বাস না হয়, ভবানন্দ ঠাকুরের মোগল সাজার সরঞ্জাম দেখুন। অথবা শান্তির ঝাঁপি-টেপারি হাঁটকাইয়া দেখুন।]

(২) নিরবচ্ছিন্ন বাঙ্গালাভাষাজ্ঞ পাঠক যেন এই শব্দটিকে লেখকের অহঙ্কারের পরিচায়ক মনে করিয়া 'অসহ্য !' বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিবেন না। উত্তম অর্থাৎ চরম, যথা ব্যাকরণে উত্তমপুরুষ (পুরুষোত্তম নহে)। ষ্টীম ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর শক্তিতে কুলায় না, তাই পরিচ্ছেদটি ক্ষুদ্রাকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বিভাগে পাশের সংখ্যাও হাল আইনে এই জন্যই কমে নাই কি ?

কুন্দ দেখিল, চিনিল, [সে 'তামাটে বর্ণ ও খাঁদা নাক' ত ভুলিবার নয়], 'বিলয়ভূয়িষ্ঠ-জলদান্তর্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায় মৃদু মধুর দিব্য হাসি হাসিল।' তারাচরণ কুন্দর সেই 'আধিক্লিষ্ট মুখে মন্দবিদ্যুন্নিন্দিত যে হাসি তখন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল।' কুন্দ তাহার পর একটু হাসিয়া, একটু কাসিয়া, মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল; ভিজা কাপড় সহজে সরিতে চাহে না। কুন্দ, গৌরী ঠাকুরাণীর ন্যায়, অপ্রস্তুত হইল।

তখন সেই পুরুষপ্রবর তারাচরণ তারস্বরে বলিলেন,—"কুন্দ, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, আমিই তোমার অযোগ্য স্বামী হতভাগ্য তারাচরণ। এখন বল, আমাকে গ্রহণ করিবে কি?" কুন্দ অস্ফুটস্বরে বলিল "হুঁ"। [আর সে 'না' বলে না।] 'মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থল-কমলিনীর ন্যায় মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। ভীরুস্বভাব কবির কবিতাকুসুমের ন্যায় মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয়-সম্বোধনের ন্যায় মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না।'

তখন সেই তথাকথিত সন্ন্যাসী কুন্দনন্দিনীর 'হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই গম্ভীর শ্মশানস্থলীতে ক্ষীণালোকে একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে, বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে।' কুন্দনন্দিনী প্রতিষ্ঠা, তারাচরণ বিসর্জ্জন। 'বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।'

* * * * *

'আমার বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত' না ফলিলেও, মরা মানুষ বাঁচিবে।

বঙ্কিম-চর্চ্চরী

(বাজে তরকারী)

[শ্রীআমোদর শর্ম্মার শ্রীহস্তের রন্ধন ও পরিবেষণ]

(ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২৩)

কয়েক বৎসর হইতে বিশালকায় 'ভারতবর্ষে'র বুকে বসিয়া শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক,এই তিন শত্তুরে—শ্রীবিষ্ণুঃ—এই তিন সূপকারে মিলিয়া গবেষণার জ্বলন্ত উনানে, বঙ্কিমের ডালনা, বঙ্কিমের ঘণ্ট ও বঙ্কিমের দম রাঁধিয়া পাঠক-সমাজে পরিবেষণ করিতেছেন। আমিও দুই বৎসর পূর্ব্বে পূজার উৎসব উপলক্ষ্যে বঙ্কিমের ছ্যাঁচড়া(১) প্রস্তুত করিয়া এই শ্রীহস্তের গুণের পরিচয় দিয়াছি। এবারেও পূজার ভোজে কিঞ্চিৎ বঙ্কিম-চর্চ্চরী রাঁধিয়া পাঠকবর্গের পাতে দিতেছি। জানি না, তাঁহাদের ডালনা-ঘণ্ট-দম-খেগো মুখে ইহা রুচিবে কি না।

আজকাল, সাহিত্যচর্চ্চার আকর্ষণে যত না হউক, ম্যালেরিয়ার বিকর্ষণে, মফস্বল হইতে চাটিবাটি তুলিয়া কলিকাতায় কায়েম মোকাম করিয়াছি। কিন্তু যখনকার কথা বলিতেছি, তখন মফস্বলে, নিজ বাস্তু-ভিটায়, বাস করিতাম। কালেভদ্রে কলিকাতা আসিতাম। সাহিত্য-কণ্ডূয়ন তখন হইতেই ছিল। এখন ত, কলিকাতায় সাহিত্যের জোর হাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া পূরাদস্তুর 'সাহিত্যিক' হইয়াছি। তাই চারিদিকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা দেখিয়া আমিও বঙ্কিম-স্মৃতি

---

(১) 'বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষ'—ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২১

লিখিতে বসিয়াছি। দেখি, সাহিত্যের হাটে বিকায় কি না। [এ সবও আজকাল না কি বড় বড় সম্পাদকেরা পয়সা দিয়া কেনেন!]

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে যদি কোন সুযোগে কলিকাতায় আসা ঘটিত, তাহা হইলে রাজ্যের জিনিশ কিনিয়া লইয়া যাইবার বরাত পড়িত। নিজেদের দরকারী জিনিশ ত কিনিতে হইতই, সঙ্গে-সঙ্গে পাড়াপড়শীদিগের হরেক রকম ফরমাএশ থাকিত। গৃহিণীগণের কাঁথা সেলাইএর মোটা সূঁচ হইতে সাঁচ্চার সূক্ষ্ম-কায-করা জ্যাকেট পর্য্যন্ত কিছুই বাদ পড়িত না। সে-বার দুই বন্ধুতে মিলিয়া এটা-ওটা-সেটা কিনিয়া মেডিক্যাল কলেজের সামনে হুকার দোকানে কলিহুকা কিনিতেছি, এমন সময়ে বন্ধু বলিলেন, 'এইখানে বঙ্কিমবাবু থাকেন।' (বন্ধুবর কলিকাতা-ঘাঁটা।) আমি তখন মফস্বলে একখানি খবরের কাগজ চালাই—'অকুতোসাহস'। বন্ধুকে তৎক্ষণাৎ বলিলাম, 'চল, বঙ্কিম-বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া আসি।' যে কথা, সেই কায। হুকা হাতে করিয়াই মহাপুরুষ-দর্শনে গেলাম। তিনি আমাদের পরিচয় পাইয়া গম্ভীরমুখে উপরের বৈঠকখানায় বসাইলেন(২) এবং আমাদের হুকা হাতে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—"বামাল-সমেত যখন দেখিতেছি, তখন আপনাদের অবশ্যই তামাকু অভ্যাস আছে।" এই বলিয়া চাকরকে তামাকু দিতে হুকুম দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'আজ্ঞে, ও অভ্যাস নাই। হুকাটি পিতৃদেবের জন্য কিনিয়াছি।' সঙ্গে-সঙ্গে একটু রসিকতার প্রয়াস করিয়া বলিলাম যে, 'পিতৃদেব যেরূপ তামাকুসেবন করেন, তাহাতে আমাদের তিন পুরুষ না খাইলেও সেই ধোঁয়াতেই বেশ চলিয়া যাইবে।'

---

(২) বৈঠকখানার বর্ণনা ও নায়কের রূপবর্ণনা করিয়া অনর্থক পুঁথি বাড়াইলাম না। এসব আগেই সাহিত্যের বাজারে বাহির হইয়া গিয়াছে।

আমার রসিকতাটুকু শেষ হইলে বঙ্কিমবাবু পরম গম্ভীরভাবে, কি কি লক্ষণ দেখিয়া ভাল হুকা চিনিতে ও কিনিতে হয়, এই বিষয়ে অনেক-গুলি সারবান্ উপদেশ দিলেন। তখন ডায়েরী লেখা বা নোট রাখা অভ্যাস ছিল না, আর এ সব কথার—হুকার বাজারে মূল্য থাকিলেও—সাহিত্যের বাজারে যে মূল্য আছে, তাহা তখন জানিতাম না; এখন দেখিতেছি, লিখিতে জানিলে এ সব কথাও সাহিত্যের বাজারে বেশ চড়া দরেই বিকায়। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া এতদিন পরে এ সব কথা লেখা চলে না। বানাইয়া বলিতেও সাহস হয় না, কেন না হুকাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি একেবারে আনাড়ী, কি বলিতে কি বলিব, আর শেষে ধরা পড়িব। আহা! তখন যদি নোট রাখিতাম, তাহা হইলে সর্ব্বতোমুখী-প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র [একটু ব্যাকরণ-বিভীষিকা হইয়া গেল] হুকার কিরূপ বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাহা বাঙ্গালীজাতিকে শুনাইয়া তাঁহাদিগকেও কৃতার্থ করিতাম, নিজেও কৃতার্থ হইতাম।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। বঙ্কিমবাবু ফর্শীর নলের উল্টা দিক্‌টা মুখে দিতেন, তাঁহার এই মৌলিকতার কথা বাঙ্গালী পাঠক পূর্ব্বেই অপর একজন স্মৃতি-লেখকের মুখে জানিয়াছেন। [যদি এ বিষয়ে কেহ আজও অজ্ঞ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে খোলসা বলিব যে, তিনি প্রত্নতত্ত্ব-বারিধিতে ডুবিয়া মরুন, বঙ্কিম-প্রসঙ্গ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করা তাঁহার কর্ম্ম নহে।] তামাকুসেবন-সম্বন্ধে তাঁহার আর-একটি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল, তাহা আজও নরলোকে অপ্রচারিত আছে। তিনি ফরশী-গড়গড়া-হুকায় জল পুরিতেন না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, জলের গড়গড় শব্দে তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, কল্পনা বাধা পায়, বুদ্ধি-বৃত্তি নিস্তেজ হয়। তিনি নিঃশব্দে তামাকু টানিতে টানিতে মানসপটে তাঁহার কল্পনালীলাময় অমর আখ্যানগুলির নক্সা আঁকিতেন। তখন

তাঁহার চক্ষুঃ মুদ্রিত, 'নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত', ভ্রূ আকুঞ্চিত, ও এক হস্ত মুষ্টিবদ্ধ থাকিত। তখন মনে হইত, যেন সাক্ষাৎ ধ্যানী বুদ্ধ সন্দর্শন করিতেছি। এ আমার চোখের দেখা, অবিশ্বাস করিলে চলিবে না।

যাক্, এক্ষণে তাঁহার সহিত কথালাপের বিবরণ দিই। বঙ্কিমবাবু আমার সহিত আলাপে জানিলেন, আমি মফস্বলে একখানি কাগজ চালাই। কাগজের নাম 'মুগুর' শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভিধানে এত ভাল-ভাল শব্দ থাকিতে এরূপ অদ্ভুত নামকরণ কেন?" আমি সপ্রতিভ-ভাবে বলিলাম, "ভবৎপ্রসাদাৎ। 'বঙ্গদর্শনে' আপনার 'ঢেঁকি' দেখিয়া আমি এই নাম পছন্দ করিয়াছি। যদি বড় লেখকের প্রকাণ্ড ঢেঁকি সাহিত্যের আসরে চলে, তবে আমার মত ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র মুগুরই কি অচল থাকিবে?" কথাটা শুনিয়া, কি জানি কেন, বঙ্কিমবাবু অকস্মাৎ গম্ভীর হইলেন। যাহা হউক, একটু পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কাগজের কাট্‌তি কেমন?" আমি বিনীত-ভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে, যে সংখ্যায় গালাগালি থাকে, তাহা দুইবারও ছাপিতে হয়, এত খরিদদারের ভিড় হয়; কিন্তু যে সংখ্যায় তাহা থাকে না, সে সংখ্যা একেবারেই বিক্রী হয় না।" তিনি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "এ ত বড় মুস্কিলের কথা।" আমি চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "আজ্ঞে, সেই মুস্কিল-আসানের জন্যই ত আপনার কাছে আসা। গালাগালিতে কাগজ ভাল চলে, তাহা বেশ জানি,—যেমন ঝাল-ঝাল তরকারী হইলে ভাত উঠে অনেক। কিন্তু কাহাকে, কখন্, কি ভাবে গালাগালি দিই, তাহা ঠিক পাই না। [পাঠকবর্গ মনে রাখিবেন, আমি তখন এ কার্য্যে নূতন ব্রতী। তখনও হাতের আড় ভাঙ্গে নাই, চক্ষুলজ্জা, লঘুগুরু-জ্ঞান প্রভৃতি কুসংস্কার একেবারে বর্জ্জন করিতে শিখি নাই।] আর এক-এক সময়ে গালাগালি দিয়া বিপদেও পড়িয়াছি। আমি ছাড়ি-

লেও কম্‌লি ছাড়ে নাই। [যাক্‌, সে সব কথা খুলিয়া বলিয়া নূতন ব্রতীদিগকে নিরুৎসাহ করিতে চাহি না।] আপনি যদি এসম্বন্ধে একটু সৎপরামর্শ দেন, তাহা হইলে চিরঋণী হইয়া থাকিব।”

এই কথা বলিবামাত্র বঙ্কিমবাবুর সেই সুন্দর গৌরবর্ণ মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ অর্থাৎ inspiration হইতেছে। [সঙ্গের বন্ধু কিন্তু পরে আমাকে বুঝাইয়াছিলেন যে উহা ক্রোধের লক্ষণ। তাই না কি?] কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যেই সে ভাব অন্তর্হিত হইল। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় একটু হাসিয়া বলিলেন, “এ সম্বন্ধে ত কখন কিছু ভাবি নাই, আপনাকে ঝট্‌ করিয়া উত্তর দিতে পারিলাম না। দেখিতেছি, ইহা একটা ভাব্‌বার কথা।” সমস্যাসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর অমূল্য উপদেশ পাইলাম না বটে, কিন্তু, সাহিত্যচর্চ্চা সম্বন্ধে এমন প্রশ্ন আমার তুলিবার শক্তি আছে, যাহা সাহিত্যসম্রাট্‌ বঙ্কিমবাবুরও চিন্তার অতীত, ইহা দেখিয়া আমার বেশ একটু আত্মপ্রসাদ হইল। বুঝিলাম, আমিও সাহিত্যক্ষেত্রে বড় কেওকেটা নহি।

গীতায় প্রক্ষিপ্তবাদ।

কথায়-কথায় ‘গীতা’র কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “আমি যতই ভাল করিয়া দেখিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে ‘গীতা’ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে বোঝাই। শুধু ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় কেন, অর্জ্জুনও প্রক্ষিপ্ত। একটু সমজাইলে আপনারাও ইহা ধরিতে পারিবেন। দেখুন, উভয়ের কথোপ-কথনচ্ছলে উপদেশদান, এই নাটকীয় কৌশল মহাভারতের সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং ‘গীতা’ প্রথমে তত্ত্বোপদেশের আকারে লিখিত হয়। পরে যখন ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্র-কালিদাস-ভবভূতি-হনুমান্‌ প্রভৃতি কবিগণ নাটক লেখা সুরু করিলেন, তখন তদ্দৃষ্টে কোন

অজ্ঞাতনামা কবি 'গীতা'খানির একঘেয়ে ধরণ দূর করিবার মানসে (Catechism) প্রশ্নোত্তরের আকারে উহা পুনর্লিখিত করিলেন। অর্জ্জুনকৃত বিশ্বরূপ-স্তব আদিম ও অকৃত্রিম, কিন্তু উহা গ্রন্থকারকৃত স্তব-আকারে গ্রন্থারম্ভেই ছিল, অর্জ্জুনের নামগন্ধও ছিল না। বিশ্বরূপ-দর্শনের প্রসঙ্গও ছিল না। পরে খুব একটা জম্‌কালো দৃশ্য দেখাইবার জন্য, Scenic effectএর জন্য, বিশ্বরূপদর্শন প্রক্ষিপ্ত হয়। ব্যাসদেব মূল গ্রন্থ-খানি উপদেশের আকারেই লিপিবদ্ধ করেন। কলাকৌশলের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে দুইজনের কথাবার্ত্তা, পরে বহুলোকের কথাবার্ত্তা, ইত্যাদি ক্রমবিকাশে নাটকের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়। গ্রীসে এইরূপ হইয়াছিল; সুতরাং বুঝিতে হইবে, এদেশেও এইরূপ হইয়াছিল। সাহিত্যে এই থিয়েটারীভাব প্রবেশ করিলে 'গীতা'র প্রচলিত নাটকীয় সংস্করণ হইল। ইহাই 'গীতা'র ক্রমবিকাশের ইতিহাস।"

[আমি গীতার আদিম ও অন্তিম সংস্করণসম্বন্ধে এই যে যুক্তিপূর্ণ তথ্য অবগত হইলাম, তাহাই ফলাইয়া লিখিয়া বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছি। দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, উক্ত তথ্য বঙ্কিমবাবুর আবিষ্কৃত ইহা না জানাতে, কেহই আমার সে ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি পড়িলেন না। এইরূপ সামান্য কথাবার্ত্তায় তিনি যে কত লোককে কত তত্ত্বের আভাস দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সকল লোক তাঁহার কথাই নিজেদের নামে জাহির করিয়া একএকজন দিগ্‌গজ লেখক হইয়াছেন। তাঁহারা তাহা স্বীকার না করুন, আমার ঋণের কথা আমি অকপটে বলিলাম।]

* * * *

ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। তাঁহার শিষ্টাচার ও সসার বাক্যালাপে পরিতুষ্ট হইয়া আমরা বিদায় লইলাম। এতদিন পরে এই পুরাতন

কাসুন্দি ঘাঁটিতেছি, কেন না বাঙ্গালী এখন এ সকল প্রসঙ্গের আদর করিতে শিখিয়াছে, সম্পাদক ও পাঠক-সম্প্রদায় এ সকল তথ্য-সংগ্রহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

এই শুভক্ষণে বঙ্কিমবাবুর সহিত যে পরিচয় হইল, সেই সূত্র ধরিয়া তাঁহাকে নিয়মিতরূপে 'মুগুর' পাঠাইতাম ও সাহিত্যের নানা কথার অবতারণা করিয়া লম্বা-লম্বা চিঠিও লিখিতাম। তিনি যদিও কখন পত্রের উত্তর দিতেন না, কিন্তু পত্রগুলি অপঠিত থাকিত না, কেন না সেগুলি কখন ডেড্‌লেটার আফিস হইতে ফেরত আসে নাই। তাঁহার পুস্তক বাহির হইলেই কিনিয়া পড়িতাম ও তৎসম্বন্ধে আমার মতামত সবিস্তারে লিখিয়া পাঠাইতাম। তিনি কোন প্রতিবাদ করিতেন না; ইহাতেই বুঝিতাম, তিনি সেগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন; কথায় বলে, মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। এইভাবে তাঁহার সহিত এই নগণ্য লেখকের খুবই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। আজ এ সব কথা 'স্বপনের মত মনে হয়।' [একতরফা বলিয়া যদি কেহ ইহাকে ঘনিষ্ঠতা বলিতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে না হয় ইহাকে 'ঘনতা' বলুন—ইংরেজীতেও আছে to be thick with—]

মূলের সন্ধান।

বঙ্কিমবাবুর রচিত আখ্যানগুলির ও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মূল কোথায়, এই প্রশ্নের আলোচনা সম্প্রতি তাঁহার আত্মীয়গণ আরম্ভ করিয়াছেন। আমিও এ সম্বন্ধে কিছু-কিছু অনুসন্ধান করিয়াছি। আমার আবিষ্কৃত তথ্যগুলি বোধ হয় তাঁহার আত্মীয়গণেরও অজ্ঞাত। কয়েকটির নমুনা দিতেছি। উৎসাহ পাইলে আরও দিতে পারি।

(১) রামচরণ।

মেডিক্যাল কলেজে প্রায়ই ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙ্গালী ছাত্রদের মারামারি ঘুঁষাঘুঁষি হইত। বঙ্কিমবাবুর একজন সাহসী চাকর ছিল, সে ঐরূপ মারামারি আরম্ভ হইলেই ভিড়ের ভিতর ঢুকিয়া ফিরিঙ্গি ছাত্রদিগকে বিষম মারপিট করিত এবং এই উদ্দেশ্যে সাম্‌নের ফুটপাথে সর্ব্বদা ঘুরিত। একবার এইরূপ একটা দাঙ্গায় পা ভাঙ্গিয়া সে কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজের হাঁসপাতালে ছিল। এই চাকরই রামচরণের আদর্শ। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পরও এ ব্যক্তি কয়েক বৎসর জীবিত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় পুলিশের সঙ্গে একটি দাঙ্গায় ইহার প্রাণবিয়োগ হয়।

চেষ্টা করিলে এইরূপ অনেক তথ্য আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে সে উৎসাহ, সে অধ্যবসায়, সে শ্রমশীলতা, সে নিষ্ঠা, সে শ্রদ্ধা নাই। তাই আমরা শেক্‌স্‌পীয়ার-ডিক্‌ন্‌সের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মূল অনুসন্ধান করিয়া হায়রান হই, বঙ্কিম-দীনবন্ধু সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে চাহি না।

* * * * *

কয়েকবার কাশী গিয়া বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আবিষ্কার করিয়াছি। [দেখুন, কাশী গিয়াও এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি নাই।]

(২) 'যুগলাঙ্গুরীয়'।

বঙ্কিমবাবু 'মৃণালিনী'র কাপি প্রেসে দিয়া কাশী যান। [পাণ্ডুলিপি ও ছাপাখানাও লিখিতে পারিতাম, কিন্তু আমি ইংরেজী জানি না অনেকে আমার নামে এই অপবাদ দেন ; সেই জন্য ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ কিনা deliberately এই শব্দ দুইটি ব্যবহার করিলাম।] তথায় থাকিতে-

থাকিতে, একদিন, দশাশ্বমেধ-ঘাটে যে সকল মজলিস বসে, সেইখানে তিনি গল্প শুনিলেন [এ অধমও তথায় উপস্থিত ছিল] কোন্ বাড়ীতে চোকবাঁধা বর-কনের বিবাহ হইয়াছে; এক সন্ন্যাসী বিবাহের উদ্‌যোগী ছিলেন। [কাশীতে একটা-না-একটা আজগবী কাণ্ড অহরহই ঘটে। আজকাল অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে, তখনকার দিনে খুবই বাড়াবাড়ি ছিল।] মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ কৌতূহলের বশীভূত হইয়া, পাত্রপাত্রী 'কি জাতি কি নাম ধরে কোথায় বসতি করে,' তাহাদের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল কি না, পরে দেখাশুনা হইয়াছিল কি না, বধূটীর কি গতি হইল, 'পরে সে হইল কা'র, এখন কি দশা তা'র' ইত্যাদি কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন না। বাস্তবিক সেরূপ করিলে, তাঁহার কল্পনাবৃত্তির অবমাননা করা হইত। পাঠকবর্গ বুঝিবেন, এই ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া অপূর্ব্ব কল্পনাবলে তিনি ভবিষ্যতে 'যুগলাঙ্গুরীয়' রচনা করিয়াছেন। ঐ চোখবাঁধা বরকনেই গল্পের বীজ।

(৩) 'ইন্দিরা'।

কাশীতে থাকিতে-থাকিতে তিনি আর একদিন ঐ মজলিসে শুনিলেন, [এই অধম বস্‌ওয়েল তাঁহার পিছনে-পিছনে থাকিত] একটি গৃহস্থের বধূকে শ্বশুরবাড়ী যাইবার পথে ডাকাতে লইয়া যায়। পরে সে ভাগ্যক্রমে তাহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোন গতিকে কাশী আসিয়া পড়ে। শাস্ত্রেও আছে, যাসাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তাসাং বারাণসী গতিঃ। এখানে সে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করে। একবার ঘটনাক্রমে তাহার স্বামী কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে পূজার ছুটিতে কাশীতে বেড়াইতে আসেন এবং ঐ স্ত্রীলোকটি তাঁহাদিগের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হয়। স্বামী

মহাশয় পাচিকার উপর একটু 'কৃপাদৃষ্টি'র(৩) লক্ষণ প্রকাশ করেন। কিন্তু রমণী, স্বামীকে চিনিতে পারিয়া, কোন সুযোগে তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া আত্মপরিচয় দেয় ও পুনর্গ্রহণের জন্য অনুনয়-বিনয় করে। স্বামী মহাশয় কাশীতে স্ফূর্ত্তি করিতে আসিয়া, তাহার হাতের অন্নজল খাইলেও, এবং তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, দেশে জাতি যাওয়ার ভয়ে তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। বধূটী সেই অবধি বিকৃত-মস্তিষ্ক হয় ও জপতপ লইয়া কখন দশাশ্ব-মেধ-ঘাটে, কখন কেদার-ঘাটে, কখন মণিকর্ণিকা-ঘাটে অবস্থান করিত। ইহাই 'ইন্দিরা'র ভিত্তি।

বঙ্কিমবাবু বিয়োগান্ত আখ্যান ভালবাসিতেন না,—তাই তিনি সূর্য্যমুখী, শৈবলিনী, প্রফুল্লকে গৃহে ফিরাইয়াছেন, রাধারাণীর পলাতক আসামীর হদিস মিলাইয়াছেন; সুতরাং ইন্দিরাকেও শেষে ঘর-বর দিয়াছেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

(৪) ও (৫) সোণার মা ও গৌরী ঠাকুরাণী।

যখন বঙ্কিমবাবু কাশীতে ছিলেন, এক প্রবীণা ব্রাহ্মণ-বিধবা তাঁহার পাকসাক করিত। বঙ্কিমবাবু চলিয়া আসিবার সময় সে বায়না ধরিল যে, বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে কলিকাতায় গিয়া তাঁহার পাচিকার কার্য্য করিবে। তাহাকে নাকি বাবা বিশ্বনাথ স্বপ্ন দিয়াছিলেন যে, আরও কিছুদিন বঙ্কিম-বাবুর পাচিকাবৃত্তি করিলে, তবে তাহার পূর্ব্বজন্মের পাপ কাটিবে ও অন্তিমে বিশ্বনাথ তাহাকে চরণে স্থান দিবেন। [এ স্বপ্নের কথা সত্য কি

(৩) পাঠক মহাশয় 'কুরুচি' বলিয়া চীৎকার করিবেন না। ইহা বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থেই পাইয়াছি। 'সীতারামে' জয়ন্তীর বৃত্তান্ত দেখুন।

না হলপ করিয়া বলিতে পারি না। তবে কুন্দনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা প্রভৃতির স্বপ্ন-বিচারক ললিত বাবুর জ্বালায় ত স্বপ্নে অবিশ্বাস করিবার যো নাই! আমরা ত বুঝি, বুড়ীকে কালভৈরব কাশীতে তিষ্ঠিতে দিল না।] বঙ্কিমবাবু তাহার কাকুতি-মিনতিতে দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে সঙ্গে আনেন। প্রবীণা কলিকাতায় আসিয়া একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

এই প্রবীণাকে আদর্শ করিয়া বঙ্কিমবাবু 'ইন্দিরা'য় সোণার মা ও 'আনন্দমঠে' গৌরী ঠাকুরাণীর কল্পনা করিয়াছেন। বেচারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে চাহিয়াছিল বলিয়া, তিনি এই উভয় বিধবারই বিবাহের সাধ লইয়া রঙ্গ করিয়াছেন।

উক্ত প্রবীণার হাতের রান্না খাইয়া বঙ্কিম বাবুর পরিবারস্থ সকলেই হাড়ে-নাড়ে জ্বলিয়া গিয়া তাহাকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিতে অর্থাৎ হাওড়া ষ্টেশনে রাখিয়া আসিতে ইচ্ছা করে। বঙ্কিম-বাবু এই প্রস্তাব শুনিয়া একটু বঙ্কিম হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "কিছু করিতে হইবে না, আমি আমার পুস্তকে উহার এমন বর্ণনা করিব যে উহার রান্না জগদ্‌বিখ্যাত হইবে। ইহার অধিক শাস্তি আর ব্রাহ্মণকন্যাকে কি দেওয়া যায়?" [দেখুন বঙ্কিমবাবুর কতদূর নিষ্ঠা ছিল!]

* * * * * *
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
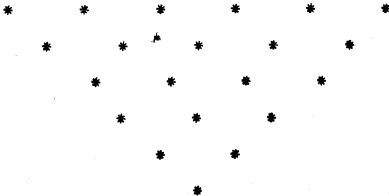
লাউএর খোলা, কুমড়ার খোলা, প্রভৃতি সাত-পাঁচ দিয়া গৃহস্থ-ঘরে চর্চ্চরী রাঁধে। ইলিশমাছের তেলে রাঁধিলে তাহা ত একেবারে অমৃত হয়। আমিও সাত-পাঁচ দিয়া বঙ্কিম-চর্চ্চরী পাকাইয়াছি, বঙ্কিম-ইলিশের তেল দিতেও কসুর করি নাই। (তবে চোঁয়াইয়া ফেলিয়াছি কিনা বলিতে পারি না।) জানি না, ইহা পাঠকের মুখরোচক হইবে কি না। শেষে সোণার মাএর হাওয়া আমার গাএও না লাগে! *

---

* প্রবন্ধ ছাপা হইয়া গিয়াছে এমন সময় আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, লেখক কস্মিন্ কালেও বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই; এমন কি তাঁহাকে জীবিতমানে দেখেন নাই। লেখকের সকল কথাই স্বকপোলকল্পিত অর্থাৎ,—তাঁহার ষোল কড়াই কাণা। ছাপা হইয়া গিয়াছে, চারা নাই। পাঠক আপাততঃ একটু আমোদ উপভোগ করুন। পর-সংখ্যায় আমরা সত্যের মর্য্যাদারক্ষার জন্য প্রবন্ধটিকে আচ্ছা করিয়া গালি দিব। তাহা হইলে দুই কুলই বজায় থাকিবে। এ প্রবন্ধ ছাপা সম্বন্ধে আমাদের কৈফিয়ত—পূজার বাজারে চারিদিকেই জুয়াচুরি চলিতেছে, সাহিত্যের দোকানেই বা বাদ থাকিবে কেন? যাহা হউক, সাধু সাবধান!—সম্পাদক।

বিচিত্র বর্ণবোধ।

[শ্রীআমোদর শর্ম্মার পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত]

(ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৩)

মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
বর্ণবোধং প্রকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া ॥

পাঁচ পাঁচ বৎসর অন্তর শিক্ষা-সম্বন্ধে এক-একখানি নীল মলাটে মোড়া লম্বা ধাঁচের সরকারী রিপোর্ট বাহির হয় এবং এইরূপ পাঁচ পাঁচ বৎসর অন্তর নিম্নশিক্ষার একটি করিয়া নিউ স্কীম (নূতন মতলব !) জাহির হয়। প্রতিবারেই সরকার-বাহাদুর জনসাধারণকে আশ্বাস দেন, এইবার যে প্রণালী আবিষ্কৃত হইল, এতদনুসারে শিক্ষালাভ করিলে দেশের সব গো-গর্দ্দভ মানুষ হইয়া যাইবে। পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়ন ও নির্ব্বাচন, পরিদর্শক-নিয়োগ ও শিক্ষক-তালিমের ধূম পড়িয়া যায়। তাহার পর—যথাকালে দেখা যায়, সকল প্রণালীই 'মুখস্থং ব্রহ্মাস্ত্রম্'এর হাতে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হয় এবং ছাত্রগণ 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই রহিয়া যায়। ডিরেক্টর ক্রফ্ট্-টনী-মার্টিন গিয়াছেন, পেড্লার-কুক্লার গিয়াছেন, ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়মে হর্নেল-শিঙ্গেল আসিয়া দেখা দিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষার দরিয়ায় কোম্পানীকা মাল যতই ঢাল, হরেদরে বরাবর হাঁটুজলই থাকিয়া যাইতেছে। [এও একটা hydrostatical paradox বলিতে হইবে]। লাভের মধ্যে, ঢাকের কড়িতে সময়ে সময়ে মনসা বিকাইয়া যায়। তবে 'লাগে টাকা, দিবে গৌরী সেন'—এই যা' রক্ষা।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া কিছুতেই আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। তাই 'অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির' যে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মাথা ঘামাইব। বিস্তর গবেষণা করিয়া প্রথম-শিক্ষার একটা অভিনব-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছি। অদ্য শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে—বিদ্যারম্ভের প্রকৃষ্ট কালে—ইহা সাধারণের গোচর করিলাম। বলা বাহুল্য, পরোপকারই আমার একমাত্র লক্ষ্য। 'পরোপকারায় সতাং জীবনম্'। [এই জন্যই সংস্কারকগণ সমাজের মঙ্গলের জন্য সদাই ব্যস্ত থাকেন।]

আমার বিদ্যার দৌড় বেশী দূর নহে—যোগে-যাগে গুরুমশায়ের পাঠশালে শিশুবোধক ও শুভঙ্করী সায় করিয়াছিলাম। তাহাতেই বিদ্যার থতম। তাহার পর, দ্বারে-দ্বারে বটতলার(১) 'ভাল-ভাল গল্পের বই, গানের বই' ফিরি করিয়া বেড়াই,—অবসর পাইলে বইগুলি বাণান করিয়া একটু-একটু পড়ি। বই লইয়া চলাফেরা, বসা-দাঁড়ান, সুতরাং ভিতরে-ভিতরে যে বিদ্যার একটা ছাপ পড়িয়া গিয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য। লোহাও যে চুম্বক-সংস্পর্শে বেশীদিন থাকিলে চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়! ইহা ছাড়া দেখিয়া ও ঠেকিয়া বিস্তর শিখিয়াছি। শুনিয়া-শুনিয়া অনেক ইংরেজী গৎ রপ্ত করিয়াছি; মেসের ছোকরাবাবুদের কৃপায় ইংরেজী কাব্য, নাটক, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞানেরও বুলি ঝাড়িতে পারি; এমন কি, ফরাসী, জার্ম্মান, রুশীয় প্রভৃতি ভাষারও কিছু-কিছু সংবাদ রাখি। এখন, এই বিদ্যার বোঝা লইয়া বড় বিব্রত হইয়াছি, নামাইতে পারিলে বাঁচি। তাই প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি সামান্য ব্যক্তি, আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে

(১) বটতলার নামে নাসিকাকুঞ্চন করিবেন না। বাঙ্গালা ভাষার মুরুব্বিগণ এখন স্বীকার করিতেছেন যে, সাহিত্য-পরিষদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বটতলাই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

না, সুতরাং সম্পাদক মহাশয়ের আড়ালে আশ্রয় লইলাম। কেন না, 'সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ। যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে॥' আর দুনিয়ার গতিই এই ; লড়ে পাইক, নাম হয় সর্দ্দারের। অনেক পাঠ্য ও অপাঠ্য পুস্তকের প্রণয়ন-রহস্য (প্রণয়-রহস্য নহে) নাকি এই প্রকারই।

আরও কথা আছে। আমার সহায়-সম্পদ্ নাই, সহিসুপারিশ নাই, পেটের চিন্তায় সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াই, এমন সময় নাই যে পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচক-সমিতির সভ্যগণের দ্বারে ধন্না দিই। তবে এই ভরসা,—হোমরা-চোমরা বি-এ, এম্-এ-দের বই চলে না, আমাদের মত মৎফরক্কা না-পড়ে'-পণ্ডিতের বই-ই চলে। যাহা হউক, আমি প্রণালীটি সম্পাদক মহাশয়ের গোচর করিলাম। তাঁহার গুরুদাস বাবুর সহিত খাতির আছে ; তিনি উক্ত প্রকাশক মহাশয়ের ঘর হইতে এই প্রণালীতে পুস্তক লিখিয়া বা লিখাইয়া চালাইবার চেষ্টা করুন। যদি কৃতকার্য্য হন, ধর্ম্ম ভাবিয়া আমাকে কিছু দস্তরি ধরিয়া দিবেন। বহু দরিদ্র সাহিত্যসেবী গুরুদাস বাবুর নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছেন। আমিই কি বঞ্চিত হইব ?

বনিয়াদ পাকা না হইলে ভাল ইমারত গড়া যায় না। সেইরূপ প্রথম-শিক্ষা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে না হইলে উচ্চশিক্ষা পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। আমাদের বাল্যকালে 'কএ করাত খএ খরগোস' ইত্যাদি সঙ্কেত দ্বারা অক্ষরশিক্ষা দেওয়া হইত। আজকাল তাহাই ঝালাইয়া 'কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি, খেঁকশিয়ালি পালায় ছুটি' চলিতেছে। কিন্তু এ সব অকেযো ছড়া মুখস্থ করিয়া শিশুদের মগজ খারাপ হয়, স্মৃতিশক্তির বাজেখরচ হয়, মনের প্রকৃত উন্নতি বাধা পায়, অক্ষরের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলা জানোয়ারের নাম যুড়িয়া দিয়া শব্দব্রহ্মের অবমাননা করা

হয়, শিশুকেও পশুতে পরিণত করিবার পথ প্রশস্ত করা হয়। এইরূপে 'সুকুমার শিশুকাল—শিক্ষার সময়' বৃথা নষ্ট হয়।

আমার নবোদ্ভাবিত প্রণালীতে—সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে আমোদ ত হইবেই, পরন্তু অক্ষরশিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে বস্তুশিক্ষা হইবে, বর্ণবোধের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, কলাতত্ত্ব প্রভৃতি সকল তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান হইবে। ফল কথা, আমার এই একখানি পুস্তকে শত শত পুস্তকপাঠের ফল হইবে। স্যর গুরুদাস কি সাধে বলেন, পড়ার মত পড়িতে জানিলে একখানি বই পড়িয়াই সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হওয়া যায়? প্রহ্লাদ যে ক-অক্ষর দেখিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন! তবে, তেমন বই লিখিতে পারে কয়জন? আর তেমন সদ্‌গুরুই বা কোথায় মিলে? আর তেমন মেধাবী ছাত্রই বা কোথায় পাওয়া যায়? যাহা হউক, আমার এই প্রণালীতে শিক্ষা পাইলে, সকল শিশুই রাতারাতি বিদ্বান্, বিচক্ষণ ও বহুদর্শী হইয়া উঠিবে, দেশে আর গণ্ডমূর্খ থাকিবে না, ইহা বড় গলা করিয়া বলিতে পারি।

আমার প্রণালীর প্রধান সঙ্কেত—এক-একটি অক্ষরের সঙ্গে এক বা দুইজন আদর্শ মানুষের নাম সংযুক্ত থাকিবে এবং তাঁহাদিগের জীবনরচিত ও কীর্ত্তিকথা মুখে মুখে শিক্ষা দিতে হইবে। সেই সকল সদ্দৃষ্টান্তে প্রণোদিত হইলে ছাত্রের হৃদয়ক্ষেত্রে শৈশব হইতেই মহত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইবে। শিশু এই সব আদর্শ মানুষের ছবি চোখে দেখুক, মহজ্জীবনের আখ্যায়িকাবলি কাণে শুনুক,—সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঐরূপ মহত্ত্বের অনুকরণ করিবেই করিবে। মার্কিন কবি বলিয়া গিয়াছেন—

Lives of great men, all remind us
We can make our lives sublime.

ও বাঙ্গালী কবি 'অস্থার্থ' করিয়াছেন—

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে' গমন,
হয়েছেন প্রাতঃ-স্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য করে' স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধ'রে
আমরাও হ'ব বরণীয়॥

[এইরূপ ছবি ও কথা ফরাসী দার্শনিক কোঁতের Calendar of Great Men অপেক্ষাও সুফলপ্রসূ হইবে]। ব্যাখ্যাচ্ছলে ধর্ম্ম, সমাজ, দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাসের ধারা, শিল্পকলার মূল সূত্র প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। এরূপ শিক্ষারীতি অবলম্বন করিলে, সমাজ ও দেশ দ্রুতবেগে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিবে। মনে রাখিতে হইবে, আজ যে শিশু, কাল সে যুবা, পরশু সে-ই গৃহপতি।

অভিনবপ্রণালীর নমুনা।

অ—

অমৃতলাল বসু
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

বাঙ্গালায় অকারের দুইরূপ উচ্চারণ আছে, সেইজন্য দুইটি নামই চাই (যথা অমর, ওমৃত)। আর তা' ছাড়া উভয়েই নটরাজ, উভয়েই থিয়েটারের শিরোমণি, কা'কে ফেলে' কা'কে লই? ছবির সঙ্গে-সঙ্গে ইঁহাদিগের অভিনয়নৈপুণ্য, নাটক-নির্ম্মাণ-কৌশল, নাট্যপ্রতিভা, রঙ্গালয়ৈ-কগতপ্রাণতা সম্বন্ধে বাচনিক উপদেশ দিতে হইবে। যাহাতে বালক-বালিকাগণ ইঁহাদিগকে স্বচক্ষে(২) দেখিতে পারে,—কেন না একজন ওস্তাদ লেখক বলিয়া গিয়াছেন, Things seen are mightier than things heard, অর্থাৎ শোনা-কথার চেয়ে দেখা-জিনিশ জবর—

(২) প্রবন্ধ-রচনাকালে অমরেন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন।

ইঁহাদিগের হাবভাব, কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ-প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ঘন-ঘন থিয়েটার দেখাইতে হইবে। এইরূপে তাহারা স্বাভাবিক উপায়ে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা উচ্চারণ (খাস কলিকাতার উচ্চারণই বিশুদ্ধ) শিখিতে পারিবে, রেঢ়ো বা বাঙ্গালে টান আর থাকিবে না। তাহারা ঠিক শিখিল কি না, হাতে-কলমে তাহার পরখ করিবার জন্য, তাহাদিগের দ্বারা স্কুলে-স্কুলে সখের নাট্য-সম্প্রদায় গঠন করিতে হইবে। কলিকাতার কলেজে-কলেজে এইরূপ ব্যবস্থা আছে বটে। কিন্তু বয়ঃ-প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে এ কার্য্যে হাতে-খড়ি দেওয়াইলে তেমন সুফল হয় না। শৈশব হইতে তালিম করা দরকার। কথায় বলে, 'কাঁচায় না নুইলো বাঁশ, পাক্‌লে কর্‌বে ট্যাঁস ট্যাঁস।' ফল কথা, থিয়েটার দেখিলে শিশুদিগের গীত, বাদ্য, লাস্য, বক্তৃতা এই চারি বিষয়ে সমষ্টিভাবে অভিজ্ঞতা জন্মিবে; পরন্তু, কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য-বোধও হইবে। অতএব, ইহার প্রভূত উপকারিতা স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রথমেই থিয়েটারের কথা তুলিয়াছি বলিয়া অনেকে আমার উপর খড়্গাহস্ত হইবেন। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতা, এই কুসংস্কার যাহাতে ভবিষ্যদ্-বংশীয়দিগের মনে প্রবেশ না করে, সেইজন্যই আমি গোড়া বাঁধিয়া কায করিতে চাহিতেছি। দেখুন, প্রাচীন কালে শুধু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে কেন, গ্রীস রোম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে, এমন কি খ্রীষ্টান ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত, রঙ্গালয় ও অভিনয় লোকশিক্ষার প্রধান উপায় ছিল, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। এখনও দেখুন, পল্লীগ্রামের লোক কোন সুযোগে কলিকাতায় আসিতে পারিলে, প্রথমে যায় কালীঘাটে মা-কে দর্শন করিতে, আর তাহার পর যায় থিয়েটারে (জানি না কাহাকে দর্শন করিতে)! আসল জাতীয় প্রকৃতি, প্রকৃত অকৃত্রিমতা, পল্লীগ্রামের সরলস্বভাব লোকের ভিতরেই দেখা যায়; অতএব পল্লীগ্রামের লোকের

এই দুইটি কার্য্য হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, থিয়েটার দেখা, দেবতায় ভক্তির ন্যায়, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির মজ্জাগত। যাহাতে এই জাতীয়-ভাব শিশু-হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, সঙ্কীর্ণচেতাঃ রুচিবাগীশদিগের প্ররোচনায় শিথিলমূল না হয়, তদ্‌বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তবে যদি বেশ্যার কথা তোলেন, তাহার উত্তরে বলিব,—যতদিন আমাদের দেশে, অন্ততঃ আমাদের সমাজে, ভদ্রঘরের মেয়েরা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নাচ, গান, বক্তৃতা না করেন, ততদিন এ অসুবিধাটুকু ভোগ করিতেই হইবে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পুণ্যধাম স্বর্গেও স্বর্ব্বেশ্যা আছে; ইহারা যে উন্নত সভ্যতার অচ্ছেদ্য অঙ্গ! সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কালী-দর্শন-প্রথা উঠিয়া যাইবে, কিন্তু থিয়েটার-দেখা অভ্যাস থাকিয়া যাইবে; কেন না ইহা উদার, শাশ্বত, অসাম্প্রদায়িক, সার্ব্বভৌম; ইহাতে জাতিভেদের, বর্ণভেদের, লিঙ্গভেদের, ধর্ম্মভেদের সঙ্কীর্ণতা নাই। জয়, থিয়েটারের জয়!!

আ—

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি (স্যর)

(ইহা ছাড়া ইংরেজী বর্ণমালার প্রায় সব অক্ষরগুলি ইঁহার নামের পশ্চাতে উপাধিচ্ছলে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে।) অএর উচ্চারণ 'অ'ও হয়, 'ও'ও হয়; কিন্তু আএর বেলায় এক উচ্চারণ। আশুতোষও একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। দেখুন, এই নাম উচ্চারণ করিলে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, ৺আশুতোষ বিশ্বাস, ৺আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু), (কাশ্মীরের) ৺আশুতোষ মিত্র প্রভৃতি কোন আশুতোষকেই মনে পড়ে না বা মনে ধরে না, এমন কি বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এই বিরাট্ বপুর পেষণে চাপা পড়িয়া গিয়াছেন। ৺সরস্বতীপূজার দিনে এই মূর্ত্তিমান্ সরস্বতীর (একটু ব্যাকরণ-বিভীষিকা হইল!) কথা কীর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য নহে কি? বাস্তবিক, স্যর আশুতোষের কথা 'বঙ্গে যথাতথা লক্ষ মুদ্রা সমকক্ষ।' তাঁহাকে চেনে না জানে না, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে এমন কে আছেন? মিল্টনের মহাকাব্যের পাত্র-বিশেষের ন্যায় তিনিও সদর্পে বলিতে পারেন—Not to know me argues yourselves unknown.

এই মহাপুরুষের নামকীর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, জগতে কিরূপে বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, ধনবল, জনবল, সম্মান, সম্ভ্রম লাভ করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে হয়, শিশুচিত্তে সেইদিকে প্রেরণা দিতে হইবে। 'নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা। কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥' এ সব সেকেলে শ্লোক এখন বাতিল। এখন বাঙ্গালা দেশে পুত্র জন্মিলেই মাতাপিতা আশা করেন, পুত্র ইংরেজী বিদ্যায় লায়েক হইয়া একটা হাকিম বা উকীল হইবে। ইহাই বাঙ্গালী-জীবনের চরম সার্থকতা। আবার হাকিমের মধ্যে হাইকোর্টের জজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উকীলের মধ্যে হাইকোর্টের ভ্যাকীল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ [যেমন ইলিশের মধ্যে গঙ্গার ইলিশ!]। দেখুন, ট্র্যাম-গাড়ী শ্যামবাজার হইতেই ছাড়ুক আর শিয়ালদহ হইতেই ছাড়ুক, তাহার গন্তব্য স্থান হাইকোর্ট; বাঙ্গালীর জীবনশকটও পল্লীগ্রাম বা সহর যেখান হইতেই চলিতে আরম্ভ করুক, তাহার চরম লক্ষ্য হাইকোর্ট। যে উকীল বা হাকিম হইতে না পারিল, সে নিতান্ত পক্ষে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইয়া পার্টিশ্যান স্যুট করিতে-করিতেও হাইকোর্ট পর্য্যন্ত পৌঁছিবে!

'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি,
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি।'

এমন যে হাইকোর্ট, তাহার ভূতপূর্ব্ব ভ্যাকীল ও বর্ত্তমান জজ স্যর আশুতোষ যে আদর্শ পুরুষ, কর্ম্মজীবনে সাফল্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ইহা কি আর বলিতে হইবে? তিনি আবার শুধু হাইকোর্টে জজিয়তি করেন না, শিক্ষা-বিভাগে ডিক্রী-ডিসমিস করাও তাঁহার হাতে। * রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।' তাই স্যর আশুতোষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষক না হইয়াও শিক্ষক, পরীক্ষক, ছাত্র, গ্রন্থকার প্রভৃতি জীবের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। শিশুগণ এ হেন আশুতোষের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হইতে জীবনের আলোক সংগ্রহ করুক, ধ্রুব লক্ষ্য স্থির করুক, এইভাবে উপদেশ দিতে হইবে। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, বিচক্ষণতায়, কর্ম্মকুশলতায়, কৃতিত্বে, যেন তাহারা এই কর্ম্মবীরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্‌বিষয়ে উৎসাহিত করিতে হইবে। জয় (স্যর) আশুতোষের জয় !!

ই—

ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া)

আশুতোষের কর্ম্মজীবন হইতে, কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করিয়া যশোমান লাভ করিতে হয়, শিশুগণ এই কার্য্যকরী শিক্ষা পাইবে; ইন্দ্রচন্দ্রের বেলায়, কিরূপে অর্থব্যয় করিয়া কীর্ত্তি রাখিতে হয়, শিশুগণ তদ্‌বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবে। তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী শিক্ষক মহাশয় শিশুগণকে মুখে মুখে শিখাইবেন। 'বিস্তর বলিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।' যাহাতে দু' পয়সা উপায় করিতে শিখিয়া তাহারা পঞ্চতন্ত্রের শৃগালের মত

---

* অশিক্ষিত লোকে আজও ভারতবর্ষকে কোম্পানীর মুলুক বলিয়া জানে। আমাদের বটতলার ফেরিওয়ালা আজও আশুতোষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক বলিয়া জানেন। কথাটা বড় মিথ্যাও নহে।—সম্পাদক।

অতি-সঞ্চয়ী হইয়া না পড়ে, তৎকল্পে প্রথম হইতেই সতর্কতা অবলম্বন বিধেয়। নতুবা শেষে যে 'অশ্ব ভক্ষ্য ধনুর্গুণ' হইয়া পড়িবে!

কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন, ইন্দ্রচন্দ্র যে অর্থ অকাতরে দান-খয়রাত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত নহে, সুতরাং এ উদাহরণে শিশুদিগের তাদৃশ উপকার হইবে না। আচ্ছা, তাহা হইলে—

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশুতোষ হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ মফস্বল কোর্টে (বর্দ্ধমানে) ঐ ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ['একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন। যতন নহিলে কভু মিলয়ে রতন।'] উভয়ত্রই বাঙ্গালী-জীবনের সেই চরম লক্ষ্য অটুট রহিল। ইন্দ্রনাথের বেলায় উপার্জ্জনে ও সদ্ব্যয়ে সমতা দৃষ্ট হয়। এতৎ-প্রসঙ্গে তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বদেশানুরাগ, সমাজ ও স্বধর্ম্মরক্ষার্থ চতুষ্পাঠী-স্থাপনাদি সৎকার্য্য, ও দুর্নীতি-কদাচারের প্রতি পঞ্চানন্দবেশে বিদ্রূপ-কষাঘাত প্রভৃতিতে সূচিত চরিত্র-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে হইবে। যিনি ব্যঙ্গের রাজা, তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রকাশকালে শ্লেষবাক্য ব্যবহার করা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা। তাই যাহা বলিবার ছিল, শাদা কথায় বলিলাম। জয় 'পঞ্চানন্দে'র জয়!!

ঈ—

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

এইবার **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত**—অর্থাৎ গুপ্ত-কবি। কবি যখন গুপ্ত, তখন ছবিতে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা কমই। আর তখনকার দিনে কবির বাল্যের ছবি, কবির যৌবনের ছবি, কবির প্রৌঢ় বয়সের ছবি, প্রভৃতি রকমারি ছবি তোলাইবার রেওয়াজ ছিল না। তাই গুপ্ত-কবির

নানা বয়সের ছবি নাই। প্রথম শিক্ষার বই লিখিতে গেলে অনেক গুপ্ত-সন্ধান রাখিতে হয়; তাই সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন যোগ-বলে গুপ্ত-কবির শেষ-শয্যার একখানি ছবি ব্যক্ত করেন। আবার ইহাতেও যদি পাঠকের মন না উঠে, তাই—'অধিকন্তু ন দোষায়' বলিয়া গুপ্তের সঙ্গে ব্যক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি ছবি দিয়া 'ঈ'কে যেন আরও দীর্ঘ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা নহে, এমন পুস্তকেও তাঁহার ছবি থাকে, ইহার বহু নজির আছে। আর এ পুস্তক যখন বর্ণপরিচয়, তখন 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণালী অবলম্বনে লিখিত', ইহা মানিতেই হইবে; অতএব তাঁহার ছবি থাকিবে না কেন?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[এই প্রসঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্ত্তিকথা কেন কীর্ত্তন করিলাম না, তৎসম্বন্ধে কৈফিয়ৎ আবশ্যক। তাঁহার কথা বলিতে গেলে ভাষার চুট্‌কী-চটক লোপ পায়, রসিকতার কণ্ডূয়ন নিবৃত্ত হয়, তরল সাহিত্যরস জমিয়া কাঠ হইয়া যায়। পুরীতে সাগরের গর্জ্জন শুনিয়া যেমন জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার পেটের ভিতর হাত-পা সাঁধাইয়া গিয়াছে, এই সাগরের গর্জ্জন শুনিলে আমাদেরও সেই দশা হয়। তাই তাঁহার কথা বলিতে পারিলাম না।]

গুপ্ত-কবি আমাদের শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি—এখনকার কবিদিগের মত ইংরেজের নকলনবিশ নহেন। এই সনাতনী প্রথার ও পুরাতনী কথার আদরের দিনে, শিশুদিগকে সেকেলে কবির আদর করিতে শিখাইতে হইবে; এই স্বদেশীর দিনে এই খাঁটি স্বদেশী ভাবটী শিশুদিগের চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত করিতে হইবে; 'প্রভাকরে'র কবির হাস্যরস ও অনুপ্রাস যাহাতে আবার দেশের ও দশের সকাশে সম্মান সমাদর সম্প্রাপ্ত হয়,

তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 'গুড়গুড়ে'র সঙ্গে তাঁহার যে কবির লড়াইএর মত সংবাদ-পত্রের লড়াই লাগিত, তাহার বিশদ বিবরণ দিতে হইবে। কেন না, শিশু বয়সকালে যদি সাহিত্যচর্চ্চা করে, তাহা হইলে গোড়া হইতে এই লড়াইএর উপযোগী গুণ অর্জ্জন করিতে না পারিলে তাহার সাহিত্যসেবা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সাহিত্যক্ষেত্রে দু' ঘা' খাইতেও হইবে, দু' ঘা' দিতেও হইবে। বাঙ্গালীর লড়াই-তৃষ্ণা যে এই আকারেই মিটে। শিক্ষা পাকা করিবার জন্য 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধে'র অনুকরণে 'স্কুলীয় কবিতা-যুদ্ধে'র প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহা ইন্‌টার-স্কুল ম্যাচ অপেক্ষাও ফলোপধায়ক হইবে। কলেজে-কলেজে কলেজ-ম্যাগাজিনের ন্যায় স্কুলে-স্কুলে স্কুল-ম্যাগাজিন(৩) স্থাপনা করিতে হইবে। সেগুলি প্রকৃতপক্ষে, অসিযুদ্ধের নহে, মসীযুদ্ধের উপযোগী ম্যাগাজিন হইবে।

আর এক কথা। গুপ্তকবির লঘু, গুরু, মধ্যম, অনেক প্রকারের কবিতা আছে। তাহার মধ্যে মুখরোচক 'পাঁঠা' 'তপ্‌সী মাছ', ও 'পৌষপার্ব্বণ' এই তিনটি কবিতা শিশুদিগকে মুখস্থ করাইতে হইবে এবং যাহাতে বর্ণিত পদার্থগুলি তাহারা উদরস্থ করিতে পারে, সঙ্গে-সঙ্গে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা প্রচলিত শিক্ষার ন্যায় এই অভিনবপ্রণালীর শিক্ষাও একপেশে হইয়া যাইবে।

কোন-কোন দোষৈকদর্শী সমালোচক এই কবিতা তিনটিতে প্রকৃত কাব্যরস আছে, তাহা স্বীকার করেন না। চোখে জল আনিলে যদি করুণরস হয়, তবে জিভে জল আনিলে তাহাও যে একটা রস, ইহা অস্বীকার করিবে, এমন বেরসিক কে আছে? বরং চোখ নিতান্ত বাহিরের জিনিশ, জিভ ভিতরকার জিনিশ; এই হেতু জিভে জল আনায় বাহাদুরী

(৩) এই প্রবন্ধ-রচনার পর হিন্দু ও হেয়ার স্কুল এ বিষয়ে পথ দেখাইয়াছে।

বেশী। যদি প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহার স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ না থাকে, তাহা হইলে বুঝিব আলঙ্কারিকগণ চার্ব্বাকের 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এই মহাবাক্যের মাহাত্ম্য বুঝেন নাই। আমার মনে হয়, বিরহের যেমন দশম দশা ইহাও তেমনি (নবরসের অতিরিক্ত) দশম রস (দশমীরস!) একাদশীর পূর্ব্বরাত্রে হিন্দু বিধবাগণ ইহার মাহাত্ম্য অনুভব করেন। হায়! এই শ্রীপঞ্চমীর দিনে খিচুড়ী ও ভাজার গুণগান করিবে, এমন গুপ্ত কবি কি বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্ত হইবে না? সেই আপশোষেই বলিতেছি, জয় গুপ্তকবির জয়!!

উ—

উর্ব্বশী

[উকারে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম লইতে পারিতাম, কিন্তু লইলে কোন ফল নাই, কেন না ইংরেজী করিয়া ডবলিউ, সি বোনার্জ্জি না বলিলে ত তাঁহাকে কেহ চিনিবে না।]

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই মাথা-কামান উড়িয়া চেহারার পর, সেই সুদৃঢ় পুরুষ-চরিত্রের পর, উর্ব্বশীর ন্যায় নিখুঁত সুন্দরী অপ্সরার, রমণী-রত্নের চিত্র, মানাইবে ভাল। এইবার (æsthetic culture) সৌন্দর্য্য-বোধের পালা। এই শক্তির উন্মেষ না হইলে শিক্ষাই ব্যর্থ। কেন না, এই শক্তিপ্রভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য যুবক ভবিষ্যতে বিবাহকালে ডানাকাটা পরীর বাহানা ধরিবে। থিয়েটার দেখিয়া (অকারের প্রসঙ্গ

দেখুন) এই শক্তি অঙ্কুরিত হইবে, এক্ষণে তাহা বিকসিত হইবে। বিলাতী কবি বলিয়াছেন—

To look on noble forms
Makes noble through the sensuous organism
That which is higher.

[বিলাতী বলিয়া এই স্বদেশীর দিনে নজিরটি অগ্রাহ্য করিবেন না। স্বয়ং 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় এক সময়ে ইহা 'প্রবাসী'র মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন। ইহার উপর আর আপীল চলে না।]

নাম ও চিত্রের সঙ্গে-সঙ্গে শিশুদিগকে রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' কবিতাটি আবৃত্তি করিতে শিখাইতে হইবে। (আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী) ; তাহা হইলে উজ্জ্বলে মধুরে মিশিবে। সুন্দরী রূপসী উর্ব্বশী 'নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ', অতএব 'আত্মীয় হ'তে পরমাত্মীয়' ; এই তত্ত্বটি সুকুমার শিশুহৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে হইবে এবং উর্ব্বশীর উপলক্ষে রীতিমত নৃত্যগীত শিক্ষা দিতে হইবে।

কেহ-কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতির নাম করিলে অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কুসংস্কারেরও পোষকতা করা হয়। ইহা একটা মস্ত ভুল। উর্ব্বশী যদি অশ্লীল বা কুসংস্কারের কারণ হইবে, তবে ঋষি রবীন্দ্রনাথ উর্ব্বশীকে উদ্দেশ করিয়া কবিতা লিখিবেন কেন ? যুধিষ্ঠির, শুকদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি পুরুষ-চরিত্র-চর্চ্চায় উল্লিখিত দোষ আছে, স্বীকার করি ; কিন্তু উর্ব্বশী, চিত্রাঙ্গদা, দেবযানী ইত্যাদি নারী-চরিত্র-চর্চ্চায় কোন দোষ অর্শে না। শাস্ত্রেও আছে, 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'। অতএব কুসংস্কার ও অশ্লীলতার 'ধাপার মাঠ' হিন্দুশাস্ত্র হইতে 'ক্ষীরগ্রাহী নীরত্যাগী' আধুনিক কবি স্ত্রীচরিত্রগুলি বাছিয়া বাছিয়া লইবেন।

উ—

উডরফ সাহেব (হাইকোর্টের বিচারপতি)

[বাঙ্গালায় 'কী' ছাড়া আর কোথাও দীর্ঘ-স্বরের উচ্চারণ নাই, শুনিতে পাই ; কিন্তু বাঙ্গালায় ডবলিউ-ডবল-ও বাণানে দীর্ঘ-উকার না হইয়াই যায় না।]

তন্ত্র অশ্লীল, তন্ত্র কুরুচিপূর্ণ, তন্ত্র আদিরসপ্লাবিত, তন্ত্র বীভৎস, তন্ত্র ভয়ানক, 'অনার্য্যের কালী' তান্ত্রিকের উপাস্য দেবতা, ইত্যাদি ঝঙ্কার ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে অনবরত ধ্বনিত হইতেছিল। বাঙ্গালার উচ্চ ব্রাহ্মণবংশের পনরআনা লোক শাক্ত; অথচ তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের এই লাঞ্ছনা হইতেছিল। তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া, যে শাখায় আসীন সেই শাখাই স্বহস্তে ছেদন করিতেছিলেন,— এমন সময় আর্থার আভালন (লোকে বলে মিষ্টার জাষ্টিস্ উডরফ) তাঁহাদিগের জারীজুরী ভাঙ্গিলেন, তন্ত্র-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন, আর ইংরেজীওয়ালা বাবুলোকসব চক্ষু রগড়াইতে লাগিলেন! হাইকোর্টের রায়ে তন্ত্র বাহাল থাকিল। ধন্য তুমি ইংরেজ! কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ হইতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব পর্য্যন্ত যাহা পারেন নাই, তুমি তাহা করিলে। অথবা ইহাতে নূতনত্বই বা কি ? গোরা-মিস্ত্রী না লাগাইলে আমাদের কোন্ কাযটা হয় ? হিউম কন্‌গ্রেস করিলেন, আমরা পেট্রিয়ট সাজিলাম। হিন্দুধর্ম্ম আবর্জ্জনাময় বলিয়া আমরা বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলাম, সাত-সমুদ্দুর-তের-নদী পার হইয়া করনেল অলকট, ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্‌কী ও বিবি বেশান্ত এই ত্রিমূর্ত্তি আসিয়া হাঁচি-টিকটিকির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলেন, আর আমরা 'নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যম্' বলিয়া থিয়সফিষ্ট সাজিলাম।

এহেন উডরফ সাহেবের প্রসঙ্গে, সাহেব জাতি যে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান, প্রভৃতির কষ্টিপাথর, না না, পরশপাথর ; তাঁহারা যাহা

স্পর্শ করিবেন তাহাই সোণা হইয়া যাইবে, ['সেঁউতি হইল সোণা দেখিতে দেখিতে'] এই সারতত্ত্ব শিশুচিত্তে গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। ইহা হইতে প্রকৃত রাজভক্তি জন্মিবে।

ঋ—

ঋষি রবীন্দ্রনাথ

[ঋ, র, ষ, একই গোত্রের, ণত্ববিধান দেখুন।]

রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ নাটককার, রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক, রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক, রবীন্দ্রনাথ সমাজ-তাত্ত্বিক, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—তাঁহার ঋষিত্ব। মনীষী শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয়ের 'চরিতকথা'য় পড়িয়াছি, তাঁহার একটি শিশুকন্যা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'বাবা! ইনি কি খুব রাগী?' আহা, বেচারার অপরাধ কি? সে মহর্ষি বলিতে দুর্ব্বাসা অষ্টাবক্রের কথাই ভাবিত! রবীন্দ্রনাথ শিশুচিত্ত হইতে এরূপ কুসংস্কার বা অন্ধ ধারণা দূর করিবার জন্যই ঋষিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহেন, ঋষি বলিলেই জটাজূটধারী 'তৈল বিনা রুক্ষকেশ', গৈরিকবসন বা দিগম্বর, 'জ্বলজ্জটাকলাপস্য ভ্রূকুটিকুটিলং মুখম্' বুঝায় না। 'সোণার গৌরাঙ্গ' হইলেই যে গৈরিকধারী হইতে হইবে, এমনও কোন কথা নাই। কেশবচন্দ্র যেমন 'কমলকুটীর' নির্ম্মাণ করিয়া এই তত্ত্ব প্রকটন করিয়াছেন যে, কুটীর বলিলেই উটজ বা পর্ণশালা বুঝায় না, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ ঋষিরূপ ধারণ করিয়া এই তত্ত্ব প্রকটন করিয়াছেন যে, ঋষি বলিলেই 'নিরাহার নিরালম্ব' সমাধিস্থ পুরুষ বুঝায় না। ইঁহারাই প্রকৃত যুগাবতার। আমাদের শাস্ত্রের কথাও তাই—কলিতে ধর্ম্ম কৃচ্ছ্রসাধ্য নহে। শিশুদিগকে ঋষি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ধর্ম্মের এই সার-

তত্ত্বটি বেশ করিয়া বুঝাইতে হইবে। (তজ্জন্যই আমরা ঋ-কারে ঋষভদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, ঋচীক প্রভৃতি সেকেলে ঋষির বা ঋতধ্বজ, ঋতপর্ণ, ঋতম্ভর প্রভৃতি সেকেলে রাজার নাম দিই নাই।)

ঌ—

(মৌলবী) ঌয়াকত হোসেন।

সংস্কৃতমূলক ঌকারাদি শব্দ পাইলাম না। সেইজন্য মৌলবী সাহেবের শরণ লইলাম। 'হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ করিবে না', শিশুকে সঙ্কীর্ণতা-বর্জ্জন করিয়া এই উদারতা শিক্ষা দিবার জন্যও মৌলবী সাহেবের প্রয়োজন। উক্ত মহোদয় স্বদেশীর জন্য যে অদম্য উৎসাহ দেখাইয়া আসিতেছেন, জ্বলন্তভাষায় শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগকে তাহা বুঝাইবেন। শিশুচিত্তে স্বদেশীর ভাব ফুটিলে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

তবে যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ স্বদেশীর নাম শুনিবামাত্র পুলিশের ভয়ে আঁতকাইয়া উঠেন, তিনি সরকার বাহাদুরের নিমকের—শ্রীবিষ্ণুঃ—চাএর হালালী করিয়া ঌপ্‌টনের চাএর গুণগান করুন।

ঌপ্‌টনের চা

এক্ষেত্রে সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের গান 'শুধু এক পেয়ালা চা' শিশুদিগকে সুরতাল-সংযোগে গায়িতে শিখাইতে হইবে। তাহারা চা-বাটীতে চাম্‌চের মৃদু আঘাত করিয়া তাল রাখিবে ও মধ্যে-মধ্যে গলা শুকাইলে এক-এক চাম্‌চে চা খাইবে। ইহা 'কিণ্ডারগার্টেন কর্ম্মসঙ্গীত' অপেক্ষাও মনোরম হইবে। চা-পান অভ্যাস এখন হইতে না করিলে তাহারা সভ্যভব্য হইতে পারিবে না, দশজনকে আদর-অভ্যর্থনা করিতেও শিখিবে না।

এ—

এলোকেশী

[দেব একলিঙ্গ বা একদন্ত অথবা বীর একলব্যের নাম দিতে পারিতাম ; কিন্তু এগুলি কুসংস্কার ও কুরুচি-ব্যঞ্জক। তাহা ছাড়া, ক্রমাগত কাঠখোট্টা পুরুষের দৃষ্টান্ত দিলে শিশুচরিত্র কঠোর নীরস হইয়া পড়িবে। সুতরাং মধ্যে-মধ্যে নারীর নাম দিয়া শিশুচরিত্রে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সরসতা আনিতে হইবে। দ্বাদশটি স্বরের মধ্যে কেবল দুইটি নারীর দৃষ্টান্ত দিলাম ; ইহাতেও যদি পাঠক-সমাজ লেখকের উপর নারীর প্রতি অযথা পক্ষপাতের আরোপ করেন, তবে নাচার।]

এলোকেশী ও মোহন্তঘটিত ব্যাপার শিশুদিগের নিকট বিশদভাবে বর্ণন করিতে হইবে। সুরুচির দোহাই দিয়া এসব কথা চাপা দিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যিনি একাধারে আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ কবি, তিনি শিশুপাঠ্য কবিতাপুস্তকে উপগুপ্তের নিকট বাসবদত্তার 'অভিসার'-বর্ণনা করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তবু বাসবদত্তা পতিতা, এলোকেশী কুলস্ত্রী। আর নিতান্ত অশ্লীল বোধ হইলে বিদ্যাসুন্দরের বা চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ন্যায় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলেই লেঠা চুকিয়া যাইবে। 'ওঃ কিছু নয় দাদা!' 'এলোকেশী' নামের সূত্র ধরিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করাও সহজ।

এই কুৎসিত বৃত্তান্তের সঙ্গে-সঙ্গে বিষের প্রতিষেধক-রূপে, Religious Endowment Billএর উপকারিতা শিশুদিগকে বুঝাইতে হইবে।

[কন্‌গ্রেসের প্রসঙ্গ পরে উঠিবে। এখানে Social Conferenceএর তরফে একটু গাহিয়া রাখিলাম।]

ঐ—

ঐকতানবাদন

গানাৎ পরতরং ন হি—ইহাই আমাদের শাস্ত্রের বাণী। শেক্স্পীয়ারের বাঁধাগৎ আওড়াইয়া আর বিদ্যা জাহির করিতে চাহি না। অকারশিক্ষাকালে থিয়েটারী ব্যাপারে সমষ্টিভাবে নৃত্যগীত-বাদ্য-বক্তৃতা-সম্বন্ধে শিশুদিগের স্থূলজ্ঞান হইয়াছে। পরে উর্ব্বশীর প্রসঙ্গে নৃত্যগীতের, ৯প্টনের প্রসঙ্গে কোরাস্-সঙ্গীতের, মৌলবী ৯য়াকত হোসেনের প্রসঙ্গে বক্তৃতার, এবং এক্ষণে ঐকতানবাদন-প্রসঙ্গে বাদ্যের ব্যষ্টিভাবে সূক্ষ্মজ্ঞান জন্মিবে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও শিশুদিগকে শুধু থিয়েটারে লইয়া গিয়া কন্সার্ট শুনাইলে চলিবে না। (তাহা ত এক কাণ দিয়া শুনিবে, অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে); তাহাদিগের ছোট-ছোট দল বাঁধিয়া তালিম করিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয় এ বিষয়ে করিৎকর্ম্মা হওয়া চাই। অর্থাৎ তাঁহার নৃত্য, গীত, বাদ্য, বক্তৃতায় চৌকস হওয়া চাই। সেকালের গুরুমশায়ের মত শুধু ছেলে লেখাইতে ও চাবুক চালাইতে পারিলেই চলিবে না।

ও—

ওয়াজিদ্ আলি শা (লক্ষ্ণৌএর নবাব)

এই প্রসঙ্গে নবাবী বিলাসের চূড়ান্ত উদাহরণ ও তাহার শেষ পরিণামের চিত্র শিশুদিগের চক্ষের সমক্ষে ধরিতে হইবে। বুঝাইতে হইবে যে, এই চিত্র 'যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী', ইত্যাদি শ্লোকের মুসলমানী সংস্করণ। শিশুদিগকে কোম্পানীর বাগান দেখাইবার ছলে গঙ্গার এপারে মুচিখোলার বিরাট্ ভবন দেখাইতে হইবে। আর পূজার ছুটী বা বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ সহরে লইয়া গিয়া নবাব-বংশের কীর্ত্তিসৌধগুলি তন্ন-তন্ন করিয়া দেখাইতে হইবে। দেশভ্রমণ আধুনিক শিক্ষার প্রধান

অঙ্গ। এই জন্যই বিলাতে না গেলে ভারতবাসীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আবার বিলাতের লোক অন্য বিদেশে গিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন।

[শিশুগণ যাহাতে সঙ্কীর্ণচিত্ত হইয়া হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ করিতে না শিখে, তৎকল্পে শেষ দুইটি অক্ষরে মুসলমান নবাব-বাদশার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। এই কারণেই পূর্ব্বে 'চরিতাবলী' প্রভৃতি পুস্তকে বৈদেশিক-গণের জীবনবৃত্তান্ত শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। হিন্দুকে যে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই মূলমন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে; কেন না হিন্দু উদারচরিত, আতিথেয়তাপরায়ণ।]

ঔ—

ঔরঙ্গজেব (বাদশা)

[ঔর্ব্ব ঋষির নাম না দিয়া ঔরঙ্গজেব বাদশার নাম দিলাম, কেন না বাদশার ক্রোধানল বাড়বানল হইতেও বিষম। ইংরেজ কবি-সম্রাট্ শেক্স্পীয়ারের নামের যেমন ছত্রিশ রকম বাণান হইত, ছাত্রপাঠ্য ভারত-বর্ষের ইতিহাসেও সেইরূপ এই বাদশার নামের আরংজেব, আরংজীব, আরাঞ্জীব, আওরঙ্গজেব ইত্যাদি নানান বাণান দেখা যায়। আমি সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বাণান বাহাল রাখিলাম—ঔরঙ্গজেব।]

ঔরঙ্গজেবের প্রসঙ্গে সমস্ত মোগল-ইতিহাস গল্পচ্ছলে শিশুদিগকে শুনাইতে হইবে; আকবর ও ঔরঙ্গজেবের রাজনীতির তুলনায় সমালোচনা করিতে হইবে, ঔরঙ্গজেবের শাসন-রীতির দোষে মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হইল, তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে হইবে। শিশু যখন ভবিষ্যৎ জীবনে উকিল-ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে কন্‌গ্রেস আদি ঘটাইবে, তখন গোড়াগুড়ি রাষ্ট্রনীতি-তত্ত্বটা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন 'বিফল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে'ই পর্য্যবসিত; অতএব আমিও এইখানে শেষ করিলাম। শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদ্যলীলা থিয়েটারে, মধ্যলীলা সাহিত্যের আসরে, অন্ত্যলীলা কন্‌গ্রেসে।

PLATO IS MY FRIEND, BUT TRUTH IS MORE MY FRIEND.

ভর্ত্তার উত্তর। *

(শাশ্বতী, অগ্রহায়ণ ১৩২১)

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

২৭ নং মাখন বড়ালের গলি, কলিকাতা।

পরমকল্যাণীয়াসু—

গত শ্রাবণমাসে 'সবুজ পত্রে' লিখিত তোমার পত্র পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। জানই ত আমার আফিসের কাযের ভিড়, —আর চিঠি লেখাটাও বড় আসে না। একটু একটু করিয়া অনেক দিনে লিখিয়া শেষ করিয়াছি। আমাদের কেরাণীর কলম, সব কথা গুছাইয়া লিখিতে পারি নাই। তোমার কবিতা লেখা অভ্যাস, 'পনেরো বছর' ধরিয়া ঐ কায করিয়াছ, তোমার মত set hand কোথায় পাইব ? আশা করি, এ ক্ষেত্রেও 'অক্ষম'কে নিজগুণে 'ক্ষমা' করিবে।

আমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়াছ, ফারখত দিয়াছ, হয়ত হিন্দুর ঘরে ডাইভোর্সের প্রচলন থাকিলে পরামর্শের জন্য কৌন্সুলীর

---

* পাঠক মহাশয়কে এই পত্রখানি পাঠ করিবার পূর্ব্বে 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত স্তর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত 'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ, ১৩২১) পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সঙ্গে সঙ্গে ঐ মাসিক পত্রে (১৩২১) উক্ত মনস্বী লেখকের 'হালদার-গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী' ও 'শেষের রাত্রি', এই চারিটি গল্প পড়িলেও ভাল হয়। সব কয়টি গল্প নব-প্রকাশিত 'গল্প-সপ্তকে' আছে।

বাড়ীও ছুটিতে, তথাপি দেখিতেছি 'শ্রীচরণকমলেষু' পাঠ লিখিয়াছ! বোধ হয় এটা 'ভ্রমরে'র নজিরে—'স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য'। আমিও সেকেলে ধরণে 'পরমকল্যাণীয়াসু' পাঠ লিখিলাম, কেন না তুমি যাহাই ভাব, আমি এখনও তোমার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি। আশা করি, ইহাতে তোমার হাসি পাইবে না। যখন কাছে ছিলে, তখনও কোন দিন বাড়াবাড়ি করিয়া 'প্রিয়তমে', 'প্রাণাধিকে', 'প্রেয়সি', 'হৃদয়েশ্বরি', প্রভৃতি গালভরা সম্বোধনগুলি করি নাই, এখন ত করিবার পথই রাখ নাই। এখন আর তুমি পিঞ্জরের পক্ষিণী নও, মুক্ত আকাশে উধাও হইয়া উড়িতে শিখিয়াছ, রবির তীব্র আলোকে উৎফুল্ল হইয়াছ, এখন কি আর দুটা আদরের, উচ্ছ্বাসের ডাকে তোমায় খাঁচায় ফিরাইয়া আনিতে পারিব? না, শীষ দিয়া, 'নাচ্ শ্যামা তালে তালে' বলিয়া আমার জীবন-সঙ্গীতের তালে তালে তোমাকে নাচাইতে পারিব? এখন উল্‌টাইয়া তুমিই 'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে', ইত্যাদি আধ্যাত্মিক গান ধরিবে। পত্রের শীর্ষে 'স্বামী' বলিয়া পরিচয় দিতেও ভরশা হইল না; তুমি ফট্ করিয়া বলিয়া বসিবে, 'আমি কি ঘড়াঘটী তৈজসপত্রের সামিল যে, আমার মালিক বলিয়া দাবী করিতেছ?' যাহা হউক, যখন তোমাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়া পাকস্পর্শের দিন থালাভরা অন্নব্যঞ্জন, কস্তাপেড়ে শাড়ী ও এক থান সিন্দুর দিয়া তোমার সকল ভার লইয়াছিলাম, তখন 'ভর্ত্তা' বলাইবার দাবী রাখি। আশা করি, তোমার নব্য রুচিতে কথাটি অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

পত্রে অনেক কাটাকাটা বোল শুনাইয়াছ, ডিক্রী-ডিস্‌মিসের মুন্‌সফ বাবুর মত অনেক ইসু ধার্য্য করিয়াছ। আমাদের 'ধর্ম্মের সংসারে'র অনেক খুঁত কাড়িয়াছ। নারীর সঙ্গে, বিশেষতঃ আপনার নারীর সঙ্গে, পাঁচালীর লড়াই করা দাশুরায়ের আমলে চলিলেও, এ 'রবীন্দ্রীয় যুগে' ত

চলিবে না। এখন নাকি সাহিত্যে রুচি বদ্‌লাইয়াছে। তবু তোমাদের মত ব্যাপিকাকে দু'কথা শুনাইয়া না দিলে মাথায় চড়িয়া বস, তাই তোমার কথাগুলির জবাব দিতেছি। ভাবিয়াছিলাম কিছু বলিব না, 'নীরবে সহ্য করিব', কিন্তু অনেক ইতস্ততঃ করিয়া কলম ধরিলাম।

একটা বড় হাসির কথা। 'শ্রীচরণকমলেষু' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছ, 'চরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল' বলিয়া শেষ করিয়াছ। অসঙ্গতিটা চোখে পড়ে নাই? তুমি না 'বিদ্বানী'?

তুমি এই 'পনেরো বছরে' আমাকে একখানি চিঠি লিখিবার মত ফাঁকটুকু পাও নাই বলিয়া আপশোষ করিয়াছ। পতিপত্নীর অবিচ্ছেদে একত্রবাস উভয় পক্ষের পরম সৌভাগ্য এই কথাই জানিতাম। কিন্তু তুমি দেখিতেছি সেরূপ মনে কর নাই। তোমরা কবি মানুষ, বোধ হয় এরূপ একত্রবাসে বিরহের মাহাত্ম্য অনুভব করিবার অবসর পাওয়া যায় না বলিয়াই তোমার ইহাতে আপত্তি। তা' চিঠি লেখার এতই যদি সাধ ছিল, তবে ২৭ নং মাখন বড়ালের গলিতে বসিয়াও ত সে সাধ মিটাইতে পারিতে। তোমার মত ভাবপ্রবণার যখন পলকে প্রলয় হয়, তখন এ ঘর হইতে ও ঘরে, অন্দর হইতে সদরে, রোকায় ভালবাসা জানাইবার বন্দোবস্ত করিলেই চলিত। অথবা আমার এক বন্ধুপত্নী যেমন পতির সঙ্গে এক গৃহে বাস করিয়াও রোজ ডাকে একখানি করিয়া প্রেমলিপি (অবশ্য পতিকে) পাঠাইতেন, তুমিও তাহাই করিলে না কেন? তবে আমরা নিতান্ত গণ্ডমূর্খ, আমরা এই বুঝি যে, আজকাল্‌কার বালিকামহলে 'কিঞ্চিল্লিখনং বিবাহকারণম্' একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইলেও, লেখাপড়া শিখিয়া ঘড়ি ঘড়ি প্রাণনাথকে প্রেমপত্র পাঠানই নারীজীবনের চরম সার্থকতা নহে। 'শুধু পিয়নের পথে, চেয়ে থাকি কোন মতে, বহিয়া না যেতে চাহে দিন', কবিত্ব-হিসাবে এ সব কথা

মিঠা হইলেও, মনের এরূপ অবস্থা কোন মতেই সুস্থ বা স্বাভাবিক বলা যায় না।

আমি কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্র (তোমার মতে 'কারাগার') ছাড়িয়া কোথাও তোমাকে লইয়া বাহির হই নাই বলিয়া চিঠির আরম্ভেই আমাকে যেন একটু খোঁটা দিয়াছ। সুখে দুঃখে পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইবে, ইহাই আমাদের সংসারের নিয়ম। টবের ফুলের মত একা একা ফুটিয়া 'আঁধার শাখা উজল' করিলে চলিবে না, স্রোতের ফুলের মত ভাসিয়া কোন্ নবকিশোরের কোশায় উঠিব বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও চলিবে না। সুতরাং সাহেবলোকেদের মত 'শ্রীমতী যথা ও শ্রীমান্ সর্ব্বস্বে' মিলিয়া 'মধুচাঁদ' করিতে যাওয়া আমাদের পোষায় না। বুড়া মাবাপকে ঘরে রাখিয়া, গৃহের অন্যান্য পরিজনকে ছাটিয়া ফেলিয়া, একটু ফাঁক পাইলেই দুটিতে মিলিয়া সিমলাশৈলে বা দার্জ্জিলিংএ, নিতান্ত পক্ষে মধুপুরে বা শিমুলতলায় কাটাইব, এই আত্মসুখসর্ব্বস্বতা শিখিতে পারি নাই; তাই তোমার সখ মিটাইতে পারি নাই। যাইতে হইলে যে বাড়ীসুদ্ধ সকলকেই যাইতে হয়, সে ঢের টাকার মামলা।

তুমি খুব জোরকলমে লিখিয়াছ, আর তুমি আমাদের 'মেজ বৌ' নও। আপন মুখে যে কবুল জবাব দিলে সেও মন্দের ভাল। সত্য সত্য আর কোন্ মুখে 'মেজ বৌ' নামে পরিচয় দিবে? 'মেজ বৌ' নাম ডুবাইয়াছ যে! পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বৌ' দুর্জ্জয় বৌকাঁটকী শ্বাশুড়ী ও ঘর-ভাঙ্গানী বড় যা লইয়া ঘর করিয়া গৃহস্থবধূর আদর্শ রাখিয়া গেল, আর তুমি বনিয়াদি ঘরের বৌ হইয়া একেবারে নাটার ফলের মত ছিট্‌কাইয়া গেলে! ছিঃ, এই তোমার আক্কেল?

দেখ, তুমি যে এম্‌নি একটা কাণ্ড বাধাইবে তা' আমি আগেই কতকটা আঁচিয়াছিলাম। যখন আষাঢ়ে 'সবুজ পত্রে' তোমার 'বোষ্টমী' দিদির পরিচয় পাইয়াছিলাম—(হরিদাসী বৈষ্ণবীর কথা বলিতেছি না, গো, 'আন্দী বোষ্টমী'র কথা বলিতেছি)—তখনই বুঝিয়াছিলাম তোমরা এই এক নূতন ধূয়া ধরিলে—সংসারের সঙ্গে আপোষ করিয়া আর থাকিবে না; আবার সে দিন দেখিলাম 'শেষের রাত্রি'তে বালিকাবধূ মণিও ঐ বুলি কপ্‌চাইতে সুরু করিয়াছে। নবনারীর (New Woman) ঢংই এই। তোমাদের কয় বোনেরই দেখিতেছি এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান। কেবল তোমার বৈমাত্রেয় ভগিনী দুইটি—'নৌকাডুবি'র কমলা ও 'চোখের বালি'র আশালতা তোমাদের ধারা পায় নাই। তবে তুমি হয়ত নিজেদের সাফাইএর জন্য বলিবে, আশা ও কমলা ত তখনও পর্য্যন্ত 'দিল্লীকা লাড্ডু' স্বামীর আস্বাদ ভাল করিয়া পায় নাই, তাই তাদের স্বামীর প্রতি অত টান ছিল। 'পনেরো বছর' ধরিয়া স্বামীর সঙ্গে ঘরসংসার করিলে তাহাদেরও আড় আড় ছাড় ছাড় ভাব হইত। হাঁ মেজ বৌ (ঐ দেখ, আগের অভ্যাস মত মুখ ফসকাইয়া 'মেজ বৌ' বলিয়া ফেলিয়াছি), এই জন্যই বুঝি নভেল নাটক বিবাহেই শেষ হয়? 'পশমের কাজের উল্টো পিঠ'টা আর দেখান হয় না?

তুমি গোপনে গোপনে কবিতা লিখিতে ভালবাসিতে। কিন্তু রামপ্রসাদ যেমন বলিয়াছিলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি,' আমারও তেমনই বলিতে ইচ্ছা করে, কবিতা লিখিয়া মধুর হওয়ার চেয়ে সুখদুঃখময় সংসারের মাধুর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতাই বড়। তুমি তাহা পারিয়াছ কি? আশ্চর্য্য দেখিলাম, তুমি গোমেষকে ভালবাসিয়াছ বলিয়া নিজের কবিসুলভ কোমল হৃদয়ের বড়াই করিয়াছ,

কিন্তু যে সংসারে একাদিক্রমে ‘পনেরো বছর’ বাস করিলে, সে সংসারে কাহাকেও আপনার করিতে পার নাই।

তোমার মেয়েটি শৈশবেই মারা গেল বলিয়া আঁতুড়ঘরের দোষ দিয়াছ। কিন্তু মিছামিছি আঁতুড়ঘরের নিন্দা কেন? আঁতুড়ঘরে ত তুমিও হইয়াছিলে, তুমি ত মর নাই। (এক একবার মনে হয় মরিলেই যেন ভাল ছিল)। আসল কথা কি জান? তোমার ‘বোষ্টমী’দিদির মত তোমারও মাতৃহৃদয় প্রস্তুত হয় নাই, তাই তোমার মেয়েটি ও ‘বোষ্টমী’-দিদির ছেলেটি মারা গেল। ভাবপ্রবণতার বশে কবিতা লেখা অভ্যাস আছে বলিয়া, সন্তান হারাইয়া সন্তানের মায়ার কথা বেশ মিঠে সুরে বলিয়াছ বটে (‘বোষ্টমী’দিদিও অনাদরে সন্তানটি হারাইয়া পরে অমন অনেক কথা বকিয়াছেন)—কিন্তু প্রকৃত মাতৃভাব তোমাতে বিকাশ পায় নাই—তাই ভগবান্ তোমাকে এমন দাগা দিয়াছেন। তথাপি কি তোমার চৈতন্য হইয়াছে? কৈ, তুমি ত বাঙ্গালীর ঘরের নিঃসন্তানা বালবিধবা পিসিমার মত পরের ছেলেকে আপন করিতে জান না, বন্ধ্যা সৎমা লবঙ্গলতার মত, ‘হালদার-গোষ্ঠী’র বড় বৌএর মত পেটে সন্তান না ধরিয়াও মা হইতে শেখ নাই। যাহা হউক, জননীর মাহাত্ম্য যে কিছু কিছু বুঝিয়াছ, সেও ভাল। নবনারী হইয়াও যে মনুর ‘প্রজনার্থং মহাভাগা’ বচনকে অশ্লীল ভাবিয়া নাসিকা কুঞ্চন কর নাই, এই যথেষ্ট।

স্ত্রীলোকের মরণ নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছ এবং সেই ছুতায় পুরুষ জাতিকে দু’ কথা শুনাইয়া দিয়াছ। কিন্তু হিন্দুর ঘরের স্ত্রীলোক অধিক দিন বাঁচে কেন, তাহা কখনও ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিয়াছ কি? তাহাদের সংযম এবং শুদ্ধাচারই তাহাদিগের দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্যের নিদান। জননীর জাতি না বাঁচিলে যে মহামায়ার সংসার অচল হইত।

তবে এখন যে নূতন হাওয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এটুকু রক্ষা পাইবে কিনা আশঙ্কার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তুমি চিঠির অনেক স্থলে আপনার বুদ্ধির ও রূপের গরব করিয়াছ। তুমি যাহাকে বুদ্ধি বল, তাহা বুদ্ধি নহে—একগুঁয়েমি, তাহারই চরম ফল তোমার গৃহত্যাগ। এই একগুঁয়েমি দেখিয়াই তোমার মাতা ঠাকুরাণী তোমার ভবিষ্যতের জন্য সর্ব্বদাই 'বিষম উদ্বিগ্ন ছিলেন'। ইহারই অপর নাম অসংযম। নিজের দোষকে গুণ মনে করিয়া লইয়া অনবরত তাহার তোয়াজ করিলে সে দোষের কখন সংশোধন হয় না। যাক্, সে কথায় কায নাই। আমরা তোমার রূপ দেখিয়া বাছাই করিয়া তোমাকে ঘরের বধূ করিয়াছি অথচ পদে পদে সেই রূপের অনাদর করিয়াছি, এই লইয়া তুমি খুব একচোট ঝাল ঝাড়িয়াছ। রূপবতী সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করা আমাদের শাস্ত্রের আদেশ ; কিন্তু সেই সুরূপাকে কাচের আলমারীতে সাজাইয়া না রাখিলেই ও ফুলতুলসী দিয়া পূজা না করিলেই যে তাহাকে হতশ্রদ্ধা করা হয়, এমন নহে। পটের বিবির স্থান আমাদের সংসারে নাই। 'রূপ ত মোহেরই জন্য'—এ দার্শনিক তত্ত্ব নব্যতন্ত্রের নভেল-লেখক প্রকটিত করিতে পারেন, কিন্তু ইহা হিন্দুর কথা নহে। হিন্দুনারী জানে—"প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা" ; "যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতি-রতা সা কামিনী কামিনী"। ইহার অতিরিক্ত সে আর রূপের মূল্য জানে না। হিন্দুর গৃহে রূপের বাতি আর্কল্যাম্পের মত জ্বলিয়া পথের লোককে ধাঁধাইয়া দেয় না, লক্ষ লক্ষ অবোধ পতঙ্গকে সেই রূপের সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রলুব্ধ করে না। হিন্দুনারী বুঝে—রূপ ধূপ, ইহা সংসারের কর্ম্মের আগুনে পুড়িয়া দেবতার উদ্দেশে আত্মদান করিবে। ইহা হোমকুণ্ড, অগ্নিকাণ্ড নহে—ইহা গৃহস্থের যজ্ঞের অঙ্গ, গৃহদাহের উপাদান নহে। পল্লীগৃহে মৃন্ময় আঙ্গিনায় গোময়লেপনতৎপরা বধূটীর হস্তের

ছাড়াহাঁড়ীর কাদা প্রকৃতই 'গঙ্গামৃত্তিকা', ইহাই তাহার সীঁথার সিন্দূরকে উজ্জ্বল করে, ইহাই তাহার 'মনোমোহিনী টীপ'।

কিন্তু এ সকল কথা তোমার মত নব্যা সভ্যা ভব্যারা মানিতে চাহেন না। বাহ্য চাকচিক্য বিলাস-বিভ্রমেই তোমাদের প্রাণের টান দেখা যায়। এইরূপ মতি-গতি হওয়াতেই তুমি 'নর্দ্দমার ধারে গাবের গাছের নূতন পাতাগুলির রাঙা টকটকে' রং দেখিয়া ভুলিয়াছ। কিন্তু ইহাও ত জান, 'বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অঙ্কুর বে'র করে; শেষকালে সেই টুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়'। আমাদেরও ঠিক সেই দশা হইতেছে। বিলাতী পঙ্কিল সভ্যতা-নর্দ্দমায় যে সব আগাছার জন্ম, পশ্চিমে বাতাসের ঝাপটায় তাহারই বীজ উড়াইয়া আনিয়া আমাদের দেওয়ালে ফেলিতেছে, আর তাহাই আমাদের সমাজের পাকা ইমারতের সন্ধিতে সন্ধিতে প্রবেশ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

বিন্দুর কথাটা ফেনাইয়া লিখিয়া চিঠিখানি ভরাইয়াছ। বিন্দুকে আগ্রহের সঙ্গে আশ্রয় না দেওয়াতে আমাদের যেটুকু দোষ হইয়াছে, শুধু সেটুকু বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া, মেয়েমহলে ও চাকরানীমহলে তাহার সম্বন্ধে যে সব আজগবী কথা রচিত হইয়াছিল সেগুলি সুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছ। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান গৃহীর কর্ত্তব্য এবং এ কর্ত্তব্যে আমাদের ত্রুটি হইয়াছে—কিন্তু বিন্দুর দুঃখকষ্টের জন্য অপরাধী আমরা বেশী না বিন্দুর খুড়তুত ভাইএরা বেশী? গালি পাড়িতে হয়, তাহাদিগকে গালি পাড়, কেন না আমাদের সমাজে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দূরসম্পর্কের আত্মীয়-আত্মীয়ার ভরণপোষণের ভরশা—একান্নবর্ত্তিপরিবার। জ্ঞাতিই জ্ঞাতিকে আশ্রয় দিতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। পত্নীর ভ্রাতা বা ভগিনী আসিয়া ভগিনীপতির গৃহে দশশালা বন্দোবস্ত

করিয়া লইবেন, এটি হালের আইন। কুটুম্বের গৃহে আশ্রয় লওয়া আমাদের সামাজিক প্রথায় নিন্দনীয়, এমন কি স্ত্রীলোকের কুটুম্বগৃহে নিমন্ত্রণে আসা পর্য্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে পল্লীগ্রামের সমাজে বারণ, কেন না কুটুম্বের গৃহে গেলে মান থাকে না। এই বুঝিয়াই বড় বধূঠাকুরাণী বিন্দুর জন্য সঙ্কোচ বোধ করিতেন, সর্ব্বদা অপ্রতিভ অপ্রতিভ থাকিতেন। ইহাতেই তুমি তাঁহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ঠাওরাইয়াছিলে!

বিন্দুর মৃত্যুতে বড়-বৌ ঠাকুরাণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন, সেটাও তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা বা হৃদয়হীনতার প্রমাণ নহে। আজকাল যেরূপ নভেলী কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহাতে প্লট আর একটু জমিলে শেষে কোন্ দিন 'বিষবৃক্ষ' বা 'চোখের বালি'র পুনরভিনয় হইয়া পড়িত, অথবা তোমার ভ্রাতার সঙ্গে বিন্দুর একত্র গৃহত্যাগে 'বিচারক' গল্পের পুনর্ব্বিচারের যোগাড় হইত কিনা কে জানে? আমাদের 'ধর্ম্মের সংসারে' সেটা সত্য সত্যই সহিত না। বাস্তবিক গুরুকৃপায় বিন্দু মরিয়া বাঁচিল, ওরূপ জঘন্য পরিণাম হইতে পরিত্রাণ পাইল।

লক্ষহীরার মামুলী গল্প লইয়া পুরুষজাতিকে টিটকারী দিয়াছ। কিন্তু এটুকু ভাবিয়া দেখ নাই, এই সকল আখ্যান অর্থবাদ—প্রকৃত ইতিহাস নহে। স্ত্রীজাতিকে পতিভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য আখ্যানকার একটু মাত্রা অতিক্রম করিয়াছেন। ইহা হইতে হিন্দুর সামাজিক সভ্যতা বা 'ইতিহাসের ধারা' উদ্ধার করিবার চেষ্টা বাতুলতা। কুষ্ঠরোগীকে সমাজ দূরে পরিহার করিল, কিন্তু কুৎসিত ব্যাধির ভয় তুচ্ছ করিয়া পত্নী সেই স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিল, বিলাতী কবি টেনিসন তাঁহার "Happy" (the Leper's Bride) কবিতায় এই যে চিত্র আঁকিয়াছেন, ইহাও কি তোমার মতে স্বাধীনতা-হীনতার পরিচয়? ইংরেজীর নজীর দিতে দ্বিধাবোধ করিতেছি না; তুমিও অবশ্য তোমার ছোট বোন 'হৈমন্তী'র মত ইংরেজী-

ওয়ালী। তোমার বাক্যিতে যেরূপ ঝাঁজ, ইহাতে বেশ বুঝি যে তুমি অনেক খানি ইংরেজী বিদ্যা উদরস্থ করিয়াছ; স্বদেশী সিদ্ধিতে এত বুক জ্বলে না, এ নিশ্চয় বিলাতী সরাপ।

বিন্দুর স্বামী পাগল, অতএব বিন্দু এমন স্বামী ত্যাগ করিলে খুব একটা সৎসাহসের কায করিত, এরূপ আভাসও দিয়াছ। কিন্তু তাহার স্বামীর উন্মাদরোগ কি প্রকৃতই খুব উৎকট ছিল? সে কি বিন্দুর উপর খুবই অত্যাচার করিয়াছিল? বিন্দুর এজাহারে ত একথা সপ্রমাণ হয় না। আর রোগটাও ত শিবের অসাধ্য ব্যাধি নহে, চিকিৎসা-শুশ্রূষায় যে সারিত না কে বলিল? যাহা হউক, যে দেশে পাগলা মহেশের গৃহিণী গৌরী আদর্শ-পত্নী, সে দেশে ত বিন্দুর ব্যবহারের কেহ গুণগান করিবে না। একবার টেনিসনের Romney's Remorse কবিতায় উন্মাদগ্রস্ত স্বামীর লাঞ্ছিতা পরিত্যক্তা অথচ সেবাতৎপরা পতিব্রতা পত্নীর চিত্র দেখ। 'Look here, upon this picture, and on this'! সে ত সাহেবের তুলির লিখন—গুরুবাক্য। তবে টেনিসন কিপ্লিংএর মত নোবেল প্রাইজ পান নাই বলিয়া যদি টেনিসনকে আমলে না আন!

বিন্দুর আত্মহত্যার জন্য আমাদিগকে নিমিত্তের ভাগী করিয়াছ। বিশাল সমাজ-সিন্ধুতে এরূপ দু একটা বিন্দু থাকিবেই। কিন্তু সে জন্য সমাজকে ধিক্কার দিয়া 'ওরে দুষ্ট দেশাচার,' বা 'Cursed be the social lies' বলিয়া বাঙ্গালায় বা ইংরেজীতে কবিতার আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্গিরণ করা সুস্থমনের কার্য্য নহে। সমাজে এক আধটা কুকাণ্ড দেখিলেই সমাজটা অশ্রদ্ধেয় হেয় হয় না। শরীরে রোগ ঢুকিলে মানুষের কদর্য্য চেহারা হয়, প্রকৃত চিকিৎসক রোগ দূর করিতে চেষ্টা করেন, রোগীকে অশ্রদ্ধা করেন না। বিলাতে পতিঘাতিনী মিসেস্ মেব্রিক ও বাঙ্গালায় পতিঘাতিনী ব্রাহ্মণী মাতঙ্গিনী আছে বলিয়া বলিতে পার না,

ব্যভিচারই বিলাতী বা হিন্দুসমাজের স্থায়িভাব। ঘরের লোকের মত স্নেহহস্তে ক্ষত স্থান পরীক্ষা কর, বাহির হইতে আততায়ীর মত আক্রমণ করিও না।

আমাদের দেশে যে নারীর আত্মহত্যা দিন দিন সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইতেছে, ইহা কি সত্যই সমাজের অত্যাচারের ফল? সংস্কারকদিগের বক্তৃতার দাপটে অনেক সময় এইরূপ ধারণা জন্মায় বটে, কিন্তু যে দিন সংবাদপত্রে পড়িলাম, বেলিয়াঘাটায় একটী বৌ স্বামীকে আম খাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, স্বামী কথা রাখেন নাই বলিয়া বৌটি অভিমানে আত্মহত্যা করিল, সেই দিন হইতে বুঝিলাম, প্রকৃত গলদ কোথায়? অভিমান একগুঁয়েমি যতই বাড়িবে, ততই এই সব অত্যাহিত ঘটিবে। বিলাতী সমাজের দেখাদেখি ব্যক্তিতন্ত্রতার প্রসার যতই হইবে, ততই সমাজের অকল্যাণ হইবে। কিন্তু এ কথা কাহাকে বুঝাইব? যিনি বুঝেন, তিনিই আজকাল উল্টা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের অদৃষ্ট!

বরপণের কথা লইয়াও ইঙ্গিতে আমাদিগকে একটু ঠেস্ দিয়াছ। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে এ দোষ দেখিয়াছ কি? তোমার না হয় রূপ ছিল তাই বাটা লাগে নাই, তোমার বড় যা ত সাকারা সুন্দরী নহেন, তাঁহার বাপ কি আমাদের উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন? বাস্তবিক এই পণপ্রথা, আমাদের সমাজের সনাতন প্রথা নহে, এ অনাসৃষ্টি অনাচারও বিলাতী সমাজ হইতে আসিয়া আমাদের স্কন্ধে ভর করিয়াছে। কুক্ষণে স্কুলের পড়ুয়ারা জানিতে পারিল যে গোল্ড্স্মিথের পিতা একটি কন্যার বিবাহে ডাওয়ারী বা যৌতুক দিতে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই Deserted Village ও Vicar of Wakefield পড়া ইংরেজী-নবীশেরা যখন যথাকালে বরের বাপ হইলেন তখন ঐ নজীর ধরিয়া

তাঁহারা ছেলের বিবাহ দিয়া রাতারাতি বড়মানুষ হইবার চেষ্টা করিতে সুরু করিলেন। সেই অবধি এই পাপ সমাজে প্রবেশ করিল।

পুরীতে গিয়াছ, পুরুষোত্তমের দর্শন পাইয়াছ, আশা পূরাও। স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে মনে করিয়াছ, কিন্তু সে স্বর্গদ্বার অন্য অর্থে। বৈতরণীর ধারে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবে ভাবিয়াছ, কিন্তু 'এ সে বৈতরণী নহে,' স্বামিত্যাগিনী 'শ্রী'র মত তুমিও তাহা একদিন বুঝিবে। জগন্নাথদেবের মত নব-কলেবর-ধারণের অভিলাষ করিয়াছ, সে অভিলাষও পূর্ণ হইবে, আশীর্ব্বাদ করি, 'প্রফুল্ল'র মত তুমিও 'নূতন বৌ' সাজিবে। আমি বলিয়া রাখিতেছি, যতই 'কাব্যি কর' 'নাটক কর,' আবার এই ঘরেই ফিরিতে হইবে, স্ত্রীলোকের এই ঘরই আপনার ঘর। কলঙ্কিনী শৈবলিনী ফিরিয়াছিল, অভিমানিনী সূর্য্যমুখী ফিরিয়াছিল, এত কথায় কায কি, তোমার ছোট বোন মণি পর্য্যন্ত 'শেষের রাত্রি'তে ফিরিয়াছে, তুমিও ফিরিবে। প্রফুল্ল স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল, 'এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।' শ্রী বুঝে নাই, তাহার ফলে সে নিজেও গেল, একটা সংসার একটা রাজ্যও অধঃপাতে দিল। 'হাতে সূতা বাঁধা'কে ইংরেজীনবীশ কবি বিদ্রূপ করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুর এই বিবাহ-বন্ধন 'মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া', ক্ষত্রিয়-কন্যা সাবিত্রী দেখাইয়াছিল 'এর কাছে যে যম ঘেঁষে না।' সন্দেহ থাকে, খাঁটি ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ের 'মন্ত্রশক্তি'খানি পড়িয়া দেখিও। বারে বারে কাল্পনিক জগৎ হইতে দৃষ্টান্ত দিতেছি বলিয়া আমার কথা উড়াইয়া দিতে চাহিবে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার কাহিনীটার কতখানিতে 'বস্তুতন্ত্রতা' আছে আর কতখানি নিরবচ্ছিন্ন খেয়াল?

তুমি আমাদের 'নামে কোনো নালিশ উত্থাপন করতে' চাও না লিখিয়াছ। আমিও বলি, 'আমার এ চিঠি সে জন্যে নয়'। বিদেশীর গড়া আইনের জোরে তোমার উপর দখল পাইবার জন্য আদালতে দৌড়াইব

না। যদি রুক্মাবাই হইবার, নায়িকা সাজিবার, সাধ করিয়া থাক, সে সাধ মিটিবে না। পক্ষান্তরে মীরাবাই হইবার সাধও মিটিবার নহে। স্ত্রীলোকের মধ্যে মীরাবাই সকলে হয় না। পুরুষের মধ্যেও বুদ্ধ-চৈতন্য সকলে হয় না। সব শিলাই যদি শালগ্রাম হয়, তবে বাটনা বাঁটবে কে? সংসারে থাকিয়াও অহল্যাবাই, রাণী ভবানী, মহারাণী শরৎসুন্দরী, ভগবতী দেবী হওয়া যায়।

যাক্, অনেক কথা-কাটাকাটি করিলাম, লম্বা লেক্‌চার ঝাড়িলাম, সাধুভাষার সদাব্রত খুলিলাম। স্ত্রীলোক পাইলে আমাদের পুরুষ-মানুষের এ রকম লেক্‌চার ঝাড়িবার জন্য বড় মুখ চুলকায়। আর পত্নীর ত্রুটি দেখিলে পতি তাহা দেখাইয়া দিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। সাধুভাষাটা ব্যবহার করিলাম, কেন না বিলক্ষণ জানি, তুমি যতই 'ন্যাকামি' কর, এসব কিছুই তোমার বুদ্ধির অগম্য নয়, তুমি ত সামান্যি মেয়ে নও। আর তোমার 'হৃদিস্থিত হৃষীকেশে'র ত কিছুই আটকাইবে না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রী (মৃণালের) হেমচন্দ্র।

পুনশ্চ—পুঁটীর বড় সাধ, তাহার শ্রীহস্তের দু'ছত্তর লেখা এই চিঠির ভিতর গুঁজিয়া দিবেই। আহা! বেচারা জানে না, তার বৌদি আর বৌদি নাই, 'ভৌউড়ি' (সুভদ্রা) হইয়াছেন!

ছিচরণেষু—মেজ বৌদি, তুমি এতদিন ছিক্ষেত্তরে গ্যাচ, আসবার নামও কর না, তুমি কেমন ধারা মানুষ? যাক্ বৌদি, আমার নাম করে সমুদ্দুরে দুটো বেশী করে ডুব দিও। আর আসবার সময় খানকতক ঝিনুক এনো। তোমার ভাই পুণ্যির শরীল, ঘামাচি হয় না, কিন্তু মেজদার গায়ে যেন চটবোনা, ওই ঝিনুকগুলো দিয়ে কেমন মুট মুট করে ঘামাচি গালা যায়! সেই সেবার দিদিমা এনেছিলেন। হা বৌদি, বড় বৌদি বলছিল কি যে তুমি নাকি আর আসবে না, জগন্নাথকে বরণ করেচ। তা নাকি আবার হয়! তবে যে বলে সাত পাকের বে চোদ্দ পাকেও খোলে না। ধেৎ! ইতি তোমার ছোট ঠাকুরঝী পুঁটী।

'ভারতবর্ষে'র বর্ষারম্ভ।

[শ্রীআমোদর শর্ম্মার রোজনামচা হইতে সংগৃহীত]

(ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২২)

অষ্টম সাহিত্য-সম্মিলনের পিণ্ডদান নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করার পর আমাদের বিশ্বনিন্দুক সভার হাতে তেমন কিছু কায ছিল না। সুতরাং প্রশ্ন হ,—'ভারতবর্ষে'র বর্ষারম্ভ আষাঢ় মাসে কেন? সভার অবৈতনিক সম্পাদক বিশ্বনিন্দুক দেববর্ম্মা বলিলেন,—"পহেলা বৈশাখ আমাদের নববর্ষারম্ভ—পুণ্যদিন। মাসিক-পত্রের স্থাপনা ঐ দিনেই হওয়া স্বাভাবিক। প্রধান প্রধান মাসিক-পত্রগুলি ঐ দিনেই স্থাপিত হইয়াছে। যদিও আজকাল অনেক মাসিক-পত্র ঠিক নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয় না—কার্ত্তিকের কাগজ ফাল্গুনে, পৌষের কাগজ চৈত্রে দেখা দেয়, ফলে কোজাগরী পূর্ণিমা উপলক্ষে লিখিত কবিতা শিবরাত্রির সময় নরলোকের গোচর হয়, আর পৌষপার্ব্বণের ছড়া ছাতুসংক্রান্তির দিন পাঠকের পাতে পড়ে—তথাপি ঠাট বজায় রাখিবার জন্য বৈশাখে সকল কাগজেরই বর্ষারম্ভ। আর বৈশাখ-সংখ্যাটা একটু নিয়মমতই বাহির হয়—ভিঃ পিঃ মারফত হালখাতা করিবার জন্য। কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র এ ভারত-ছাড়া ব্যবস্থা কেন?"

সবজান্তা ভায়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"কেন, বেমক্কা সময়ে বর্ষারম্ভ হয়, এমন মাসিক-পত্রের ত অভাব নাই; একা 'ভারতবর্ষ' 'মৎস্যরঙ্কঃ কলঙ্কী' কেন?" এই বলিয়া তিনি ফড়ফড় করিয়া খানকতক মাসিকের নাম করিয়া গেলেন। [বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন দিতে আমরা নারাজ বলিয়া নামগুলি উহ্য রাখিলাম।] তিনি আরও বলিলেন, এই

শ্রেণীর মাসিক-পত্রের জনৈক সম্পাদককে একবার এ জন্য প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, "তিনি কি বিক্রমাদিত্য বা শালিবাহনের মত নূতন কাল-গণনা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন ?"

রসিক দাদা এই সময় একটু টিপ্পনী ঝাড়িলেন,—"মাসিক-পত্রগুলা পহেলা বৈশাখে না বাহির করিয়া পহেলা এপ্রেল বাহির করিলে মন্দ হয় না। গ্রাহকগণ ঠিক সময়ে কাগজ না পাইলে বুঝিয়া লইবেন যে, তাঁহাদিগকে 'এপ্রেল ফুল' (April Fool) বানান হইয়াছে !"

ঠোঁটকাটা ভায়া ও সব বাজে কথা অগ্রাহ্য করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"'একটা নূতন কিছু করো' এই গানের ধূয়া যিনি তুলিয়া-ছিলেন এবং 'আষাঢ়ে' কাব্য যিনি রচিয়াছিলেন, তিনি যে কাগজের প্রতিষ্ঠাতা, তাহার আষাঢ় মাসে বর্ষারম্ভ হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ? বরং পহেলা আষাঢ় বাহির না করিয়া, ৩১এ আষাঢ় বাহির করিলে আরও নূতনতর হইত !"

বৈজ্ঞানিক বন্ধু সে দিন পথ ভুলিয়া আমাদের সভায় আসিয়া পড়িয়া-ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"শেষোক্ত বক্তার বক্তৃতা নিতান্ত Personal, ব্যক্তিগতবিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত। আষাঢ়ে আরম্ভে একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে। সেটুকু কৃষি-কলেজের ফেরত দ্বিজেন্দ্র-লাল বেশ বুঝিতেন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। আষাঢ়ে নবজলধর-বিমুক্ত-বারিবর্ষণে কৃষকের আশা পূর্ণ হয়। এত সাধুভাষা না বুঝেন—'আইল ঋতু বরষা, চাষার হ'ল ভরসা'—এই সোজা কথাটা 'পদ্যমালা'য় পড়িয়াছেন ত ? বর্ষা-ঋতুর আরম্ভ আষাঢ়ে, সুতরাং কৃষিপ্রধান ভারত-বর্ষের মুখপত্র 'ভারতবর্ষে'র আরম্ভও আষাঢ়ে।"

বৈয়াকরণিক বন্ধু ঈষৎহাস্যসহকারে (বন্ধুবর ক্ষমা করিবেন, আমরা ঈষদ্ধাস্য লিখিতে পারিলাম না) বলিলেন,—"এ ঠিক কথা।

বর্ষার আরম্ভ, আর বর্ষের আরম্ভ, উভয়ত্রই সন্ধিসূত্রে বর্ষারম্ভই গ্রথিত হয়।"

সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"ঠিক, ঠিক। জলধর দাদা নিজেই কবুল করিয়াছেন।—'প্রাবৃটের এই এমনই প্রথম ধারার মত, মা বঙ্গবাণীর অমৃত ধারা বর্ষণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া'—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

রসিকদাদার তাল ফাঁক যায় না। তিনি বলিয়া বসিলেন,—"আপনারা তাহা হইলে প্রকারান্তরে 'ভারতবর্ষে'র নিরীহ পাঠকগণকে কৃষক অর্থাৎ চাষা বলিতেছেন!"

আমরা সে কথা আমলে না আনিয়া, বৈজ্ঞানিক-বৈয়াকরণিক-সাহিত্যাচার্য্য—এই ত্রিমূর্ত্তির মিলিত-প্রতিভা-প্রসূত মীমাংসা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতেছি, এমন সময়ে আমাদের কবিবন্ধু সভাগৃহের আধ আলো আধ-ছায়ায় ঢাকা নিভৃত কোণ হইতে মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমি কিন্তু বরাবর অন্যরূপ বুঝিয়া আসিতেছি। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'র যে করুণ সুর কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে, তাহাই 'ভারতবর্ষে'র প্রাণের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাই 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এই 'অনন্ত মুহূর্ত্তে'র স্মৃতির সহিত 'ভারতবর্ষ'কে নিবিড়ভাবে জড়িত করিয়াছেন। দেখুন, লৌকিক কালের আরম্ভ হইতে কর্ম্মভূমি ভারতভূমিতে কত নিদারুণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে; রাম-বনবাস, দশরথের পুত্রবিরহে প্রাণত্যাগ, সীতাহরণ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, লক্ষ্মণবর্জ্জন, পাণ্ডব-নির্ব্বাসন, অভিমন্যুবধ, দ্রৌপদীর অবমাননা, শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ, যদুবংশধ্বংস, যুধিষ্ঠিরাদির মহা-প্রস্থান, হরিশ্চন্দ্রের দুর্দ্দশা, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, নল-দময়ন্তীর ও শ্রীবৎস-চিন্তার বিচ্ছেদ, শ্রীরাধার বিরহ,—ভারতের কাব্যে ইতিহাসে এমন

কত করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এ সব ব্যাপারের সন তারিখ মিলে না, কালনির্ণয় হয় না। আর অলকাপুরী হইতে নির্ব্বাসিত কান্তা-বিরহবিধুর যক্ষ 'মেঘালোকে' উন্মনাঃ হইয়া, বর্ষার ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' নবমেঘকে প্রিয়ার নিকট দৌত্যে পাঠাইয়াছিলেন, উজ্জয়িনীর কবির স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ সেই দিনটি ভারতবর্ষের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়াছে। প্রিয়াবিয়োগ-বিদীর্ণহৃদয় দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে এই চিরস্মরণীয় দিনে 'ভারতবর্ষে'র পত্তন করা কি কবিজনোচিত হয় নাই? আপনারাই বিচার করুন।"

কবি-বন্ধুর সুমধুর বচনবিন্যাস সকলেই যেন কেমন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার বাক্য শেষ হইবামাত্র সকলেই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সবজান্তা ভায়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন,—"এ সব কথা শাস্ত্রীর মেঘদূত-ব্যাখ্যা হইতে চুরি।" [উক্ত গ্রন্থের প্রচার নাই সুতরাং সত্য মিথ্যা ধরিবার যো কি?] ঠোঁটকাটা ভায়া চীৎকারস্বরে বলিলেন,—"এ সেরেফ গাঁজাখুরি, উন্মত্তপ্রলাপ।" বৈজ্ঞানিক বন্ধু মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ওরূপ অশিষ্টোচিত (un-parliamentary) ভাষা ব্যবহার করেন কেন? বলুন—কবিকল্পনা বা হেঁয়ালি!" রসিক দাদা জনান্তিকে বলিলেন,—"রবি বাবুর বাতাস লাগিয়াছে।" বৈয়াকরণিক বন্ধু বিকট বদন-ব্যাদান করিয়া মন্তব্য করিলেন,—"'কশ্চিৎ কান্তা' এই ব্যাকরণ-বিভীষিকায় যে কাব্যের আরম্ভ, তাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। স্বয়মসিদ্ধঃ কথম্ অন্যান্ সাধয়তি?"

আমরা এই নানা মুনির নানা মতে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রহিলাম। ইতি

The conclusion in which nothing is concluded.

সমালোচক-রহস্য।

[বহুরূপীর বিবৃতি]

(নব্যভারত, মাঘ ১৩২০)

অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অজ্ঞাতস্বরূপ বন্যবরাহ-দর্শনে হবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র মন্ত্রীর মধ্যে তর্ক উঠিয়াছিল,—জন্তুটা গজক্ষয় কি মূষিকবৃদ্ধি। শেষ সিদ্ধান্ত কি হইয়াছিল, স্মরণ নাই। 'সমালোচকে'র স্বরূপ সম্বন্ধেও এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। [অস্মদ্দেশে সমালোচনা সচরাচর যেরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাতে বন্যশূকরের সঙ্গে সমালোচকের তুলনা কোনক্রমেই অসঙ্গত নহে। সমালোচক-সম্প্রদায়ের কৃতিত্ব দেখিয়া শৈশবে পঠিত পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগের—

"অরে দুরাচার যম, নির্ম্মম নির্দ্দয়,
কেবল সংহার-কার্য্য তোর ব্যবসায়।"

ইত্যাদি কবিতা মনে পড়িয়া যায়।] কিছু দিন হইল, 'প্রথমশ্রেণী'র একখানি মাসিক-পত্রে এক জন নামজাদা লেখক এইরূপ অভিমত প্রকটিত করিয়াছিলেন যে, 'সমালোচনা' আলোচনারই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, বাঙ্গালায় নিরর্থক উপসর্গ যোটান একটা রোগ, তাই আলোচনা 'সমালোচনা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে, এরূপ কথাও হইতে পারে যে, 'সমালোচনা' সম্মার্জ্জনীচালনার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (আলোচনার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ নহে); অর্থাৎ মূষিকবৃদ্ধি নহে—গজক্ষয়! বাস্তবিক পুরাতন 'বঙ্গদর্শন' ও তাহার আদর্শ ইংরেজী 'এডিনবরা রিভিউ'এ এবং আধুনিক কতকগুলি বাঙ্গালা মাসিক-পত্রে যেরূপ tomahawk style

of criticism (অর্থাৎ কুড়ুলে-কোপান ধরণ) দেখা যায়, তাহাতে শেষোক্ত অনুমানই সমীচীন বলিয়া সপ্রমাণ হয়। কথাটা একটু খোলসা করিয়া বুঝাইব।

সারস্বত আয়তন হইতে আবর্জ্জনা দূর করা, জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া ফেলা, ধূলামাটি সাফ করা, সমালোচনারূপ সম্মার্জ্জনী-চালনার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সত্য বটে, প্রাচীনেরা কাব্যের গুণ-বিবেচনেই ব্যস্ত থাকিতেন, দোষ-নিরূপণে দোষের উল্লেখ করিলেও তাহা অল্প স্থান অধিকার করিত। কিন্তু তাহার কারণ ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে তখন উত্তম গ্রন্থ ছাড়া অধম গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ার তত সম্ভাবনা ছিল না, অর্থাৎ এখনকার মত বাজে বই বড় বাহির হইত না। এখন মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় সকলেই লেখক, সকলেই গ্রন্থকার। ফলে আবর্জ্জনার রাশি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইংরেজদিগের দেখাদেখি আমরাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে চাই, কোথাও আবর্জ্জনাস্তূপ জমিতে দিই না। এই জন্যই সহরে মিউনিসিপ্যালিটীর কনসারভ্যানসি-বিভাগের স্থাপনা, আর ঠিক অনুরূপ কারণে সাহিত্য-জগতে সমালোচনা-বিভাগের স্থাপনা!

কেহ কেহ তর্ক তুলিবেন,—তবে কি সমালোচক ধাঙ্গড়? অবশ্য, সমাজের কর্ম্ম-বিভাগে জাতিভেদ মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, সমালোচক তাহাই বটে। আবার সমালোচক ধাঙ্গড় কেন, সময়ে সময়ে গরজে পড়িয়া মেথরও হইয়া পড়েন। সমালোচক সরস্বতীমণ্ডপের উঠান ঝাঁট দেন, আবর্জ্জনারাশি দূরে নিক্ষেপ করেন, প্রয়োজন হইলে, যাহারা উঠানে বসিয়া মলত্যাগ করিতেছে, তাহাদিগের পিঠে দু এক ঘা দেন, ময়লাটাও সাফ করেন, পরে গোবরছড়া দেন বা হাল ফ্যাশানে ফেনাইল ছিটাইয়া দেন। আপনারা ফেনাইল প্রভৃতি প্রতিষেধক পদার্থের বিকট ঝাঁঝে নাকে কাপড় দেন, কিন্তু এ যে পূতিগন্ধি

পূযপুরীষাদি পরিষ্কার করার পর প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা, তাহা কি আপনারা অনুধাবন করিয়া দেখেন? সমালোচকের এই কার্য্য দেখিয়া আপনারা যদি বলেন, তিনি সাহিত্য-সমাজে পতিত অস্পৃশ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত, তবে নাচার।

কথাটা বড় কর্কশ, বড় কদর্য্য হইল, নয়? আচ্ছা, একটু মোলায়েম করিয়া বলি। ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পাটঝাঁট করা, সদ্-গৃহিণীর কর্ত্তব্য। শিশুরা সারাদিন খেলাধূলা করিয়া কাদামাটি ছিটাইয়া, বুড়ারা সারাদিন তামাক খাইয়া, গুল ঢালিয়া, টিকা গুঁড়াইয়া, জঞ্জাল ফেলিয়া, ঘরদোর নোংরা করিয়া রাখে, বাড়ীর গৃহিণী তাহাদিগকে বকিতে বকিতে ঝাঁটপাট দিয়া ময়লামাটি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া সব গোছগাছ করেন। লেখকগণও দুরন্ত শিশুর বা নেশার বশ বুড়ামানুষের মত নানান খেয়ালে সাহিত্যের আঙ্গিনায় নানান জঞ্জাল জড় করেন। সমালোচক নিপুণা গৃহিণীর মত তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে সে সব সাফ করেন। যে ঘরে বাস করিতে হয়, যে ঘরে দেবতার পূজা হয়, তাহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়, নতুবা স্বাস্থ্যহানি হইবে, অলক্ষ্মীর দৃষ্টি হইবে। চণ্ডীমণ্ডপে কেহ ধাঙ্গড় লাগায় না, এমন কি, চাকর-দাসী দ্বারাও কেহ কায সারে না—সে যে দেবায়তন, শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, নিষ্ঠার সহিত স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে হয়। তাহাতে অপমান জ্ঞান করিতে নাই। সমালোচকও সেই পবিত্র ব্রতে ব্রতী। তিনি দেবীর দেহলীতে জঞ্জাল যুটিতে দেন না—স্বহস্তে আবর্জ্জনা দূর করিয়া মাএর মন্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। নিপুণা গৃহিণী ধূলামাটি ঝাড়িয়া কাযের জিনিশগুলি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখেন। সমালোচকও ঠিক তাহাই করেন। গৃহিণী স্বহস্তে শিশু বা বৃদ্ধের মলমূত্র পর্য্যন্ত পরিষ্কার করেন, তাই বলিয়া কি তিনি মেথর-ধাঙ্গড়ের

শ্রেণীতে পড়িলেন? সমালোচকও আবর্জ্জনা ঘাঁটেন, তাই বলিয়া কি তিনি পতিত অস্পৃশ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেন?

যতই চিন্তা করি ততই মনে হয়—লেখকসম্প্রদায় পুরুষ, সমালোচক-সম্প্রদায় নারী। পুরুষের কায সৃষ্টি, নারীর কায লালন-পালন। লেখক ব্রহ্মার মত সৃষ্টি করিয়া দিয়া খালাস; সমালোচক ব্রহ্মময়ীর মত পালন করিতেছেন ও সংহার করিতেছেন—তিনি এক মূর্ত্তিতে জগদ্ধাত্রী, আর এক মূর্ত্তিতে কালী করালী শবাসনা লোলরসনা। অথবা দেব-লীলার কথা ছাড়িয়া নরলোকের কথাই বলি। পুরুষ স্বদেশ-বিদেশ হইতে রোজগার করিয়া অর্থ আনিয়া দেন, হাট-বাজার হইতে জিনিশ-পত্র কিনিয়া আনিয়া দেন, নারী রাখেন ঢাকেন, ফেলেন ছড়ান, কাযের জিনিশ কাযে লাগান, অকেযো জিনিশ ফেলিয়া দেন। এই জন্য মনে হয়, সমালোচনা নারীপ্রকৃতিরই উপযুক্ত কায। (সম্মার্জ্জনী যে তাঁহা-দিগেরই ব্রহ্মাস্ত্র!) আরও একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি-বেন যে, এ কার্য্যের ভারগ্রহণে নারীরই প্রকৃত অধিকার। সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিতে, খুঁত ধরিতে, তাঁহারা অদ্বিতীয়া। সমালোচনাও ত ক্ষেত্রান্তরে ঐ ধরণেরই কার্য্য। অতএব তাঁহারা ঐ কার্য্যের ভার যত শীঘ্র লয়েন, ততই সমাজের ও সাহিত্যের মঙ্গল। কবে সে শুভদিন আসিবে? কবে তাঁহারা সমালোচনা অর্থাৎ সম্মার্জ্জনী-চালনার ভার (শুধু গৃহস্থালীতে নহে, সাহিত্যপ্রাঙ্গণেও) গ্রহণ করিয়া আমা-দিগকে কৃতার্থ করিবেন? কু-লেখকের ঘাড় হইতে ঝাঁটার চোটে অবিদ্যার (দুষ্ট-সরস্বতীর) বোঝা নামাইয়া দিতে তাঁহাদিগের মত আর কে আছে? কথায় বলে 'যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে।'

কথাটা মোলায়েম করিয়া বলিতে গিয়াও দেখিতেছি, এক অনর্থ

ঘটাইলাম। বেজায় মোলায়েম হইয়া গেল। কেহ কেহ আদিরসের আশঙ্কা পর্য্যন্ত করিতেছেন। আচ্ছা, তাল সামলাইয়া লই।

বাস্তবিক পুরুষের হাতে সমালোচনার ভার পড়াতে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরুষের পরুষ প্রকৃতিতে পড়িয়া শতমুখী-প্রহার লাঠিবাজিতে, এমন কি, কসাইগিরিতে দাঁড়াইয়াছে। তবে কেহ কেহ বলিবেন যে, রাজপথ সাফ করিতে গেলে পোকাটা মাকড়টা ছুঁচাটা ইঁদুরটাও ত মারিতে হয়। সেই হিসাবে সাহিত্যের বাঁধা সড়কে সমালোচকের ঝাড়ুর আঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখক-সংহারও ঘটে—তাহা গোহত্যা ব্রহ্মহত্যার সঙ্গে তুলনীয় নহে।

কেহ কেহ সমালোচককে ঠ্যাঙ্গাড়ে গুণ্ডা লাঠিবাজ বলিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাঁহাকে জল্লাদ বলিয়া বসেন। এ দিক্ দিয়া দেখিলে, সমালোচক জল্লাদ নহেন, জজ বা বিচারক। তিনি প্রণিধান-পূর্ব্বক প্রমাণ-প্রয়োগ পর্য্যালোচনা করিয়া কাহাকেও বেকসুর খালাস দেন, কাহাকেও বা ফাঁসির হুকুম দেন। তবে বিচার-কার্য্যেও অবশ্য (অনরারী) অনাহারী অর্থাৎ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন! তাঁহারা মূলা-চোরের ফাঁসি দিতেও পিছপাও নহেন। কেন না, তাঁহারা—আনাড়ী। সাহিত্যের আদালতেও এক দল বেকার ভদ্রলোক (অনারারী) অনাহারী হইয়া বিচারকার্য্য চালাইতেছেন। তাঁহারা পদে পদে পরিচয় দেন যে, তাঁহারা আনাড়ী। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন না করিয়া তাঁহারা শিষ্টের দমন আর দুষ্টের পালন করিয়া বসেন। নামজাদা সমালোচক জেফ্রীর হাতে কবিশেখর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কি লাঞ্ছনা হইয়াছিল, সেই মামুলি কথা সকলেই জানেন।

আবার দেখিতেছি, 'কোমল' ছাড়াইয়া 'কড়ি'তে তুলিয়াছি। আচ্ছা, এবার আবার মিহি সুরে ধরি।

লেখক রাঁধুনী, সমালোচক 'চাকুনী' (সাধুভাষার ভক্তগণ 'পাচক' ও 'আস্বাদক' ধরিয়া লউন।) সেকালের রাজাদের খাদ্য শত্রুকর্ত্তৃক বিষাক্ত হইতে পারিত এই আশঙ্কায় খাদ্য চাকিয়া দেখার জন্য একজন কর্ম্মচারী (taster) থাকিত। পাঠকও সাহিত্যজগতের রাজা। পাছে তাঁহার পাতে বিষাক্ত খাদ্য পরিবেষণ করা হয়, তাই সমালোচক চাকিয়া দেখার, অর্থাৎ সুপথ্য কুপথ্য সৎকাব্য অসৎকাব্য বাছিয়া দিবার ভার লইয়াছেন। নাঃ, ইহাও চলিবে না। বর্ত্তমান লেখক যে ব্রাহ্মণের ভোজনপ্রিয়তা বিস্মৃত হয়েন নাই, ইহাতে তাহাই সপ্রমাণ হইবে। অতএব আর একভাবে কথাটা বলি।

সমালোচক সাহিত্য-বাগানের উড়ে মালী, রোপিত বৃক্ষলতার পাট করেন, আগাছা তুলিয়া ফেলেন। তবে বানরের হাতে খন্তা দিলে সে যেমন আগাছা ভাবিয়া ফলবান্ সুবৃক্ষ ও পুষ্পভারাবনতা এলালতা কাটিয়া ঝাঁটাইয়া উপড়াইয়া মোচড়াইয়া সাবাড় করে, কাঁচা উড়ের হাতেও সখের বাগিচার সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়। সাহিত্যের আরামবাগেও মাঝে মাঝে সে দুর্গতি দেখা যায়। অজ পাড়াগেঁয়ে মূর্খ চাকর ফিলটারের কয়লাবালি, ধূলামাটি মনে করিয়া ফিলটার ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া ধুইয়া মুছিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, শুনিয়াছি। সাহিত্য-ফিলটারেও কখন কখন অজ্ঞ সমালোচকের হাতে প্রয়োজনীয় বস্তুর দুর্গতি হয়, ইহাও দৃষ্ট হয়। ঈশপের গল্পে মোরগ মহামূল্য মণি পাইয়া অখাদ্য অগ্রাহ্য বলিয়া ঠোকর মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল ও টনটনে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছি ভাবিয়া উচ্চরবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়াছিল। অনেক উদর-ভরণ-তুষ্ট ও গলাবাজিতে দড় সমালোচকও কুক্কুট-জাতীয়।

জগতে জীবশ্রেষ্ঠ মানব এবং মানবসমাজে আবার নরশ্রেষ্ঠ সমালোচক। তাঁহাকে যখন ইতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করিয়া ফেলিলাম,

তখন আরও একটু অগ্রসর হই। সমালোচক মধুমক্ষিকা; তিনি সাহিত্যের সাজান বাগানে বিচরণ করিতে করিতে পাঁচ ফুল হইতে মধুপান করেন, আর 'কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন লভিলে'ন, তাহা গুন্ গুন্ (গুণ গুণ ?) করিয়া বলিয়া বেড়ান। তবে প্রকৃতিবশে কখন কখন দংশন করেন—কিন্তু তাই বলিয়া তিনি খল সর্প, ক্রূর বৃশ্চিক বা পিপীলিকার সজাতি নহেন। 'মক্ষিকা ব্রণমচ্ছন্তি'—(১) এই প্রবচন তাঁহার ন্যায় মধুমক্ষিকার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

এক সুরে ধরিলাম, অন্য সুরে ছাড়িলাম, বার বার সুর বদলাইলাম। কিন্তু আমার স্বভাবই এই। যাক, আজকাল দেশে যে সকল কবিবর ও সমালোচক-প্রবরের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য আমার প্রিয় কবির কথায় উপসংহার করি—

But seldom comes the poet here,
And the critic's rarer still.

---

(১) মক্ষিকা যে শুধু ব্রণই চাহে, তাহা নহে, মিষ্টরসেও আকৃষ্ট হয়, তাই ধনীর মধুভাণ্ডে সে একেবারে লাগিয়া থাকে। তাহার ফলে সমালোচনায় চাটুকার-বৃত্তি আসিয়া যোটে। আমাদের সাহিত্যেও এ রোগ দেখা দিয়াছে।

চুট্‌কী।

[মানসী, আশ্বিন ১৩১৮ ; সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৮ ; মানসী, কার্ত্তিক ১৩১৯ ;

ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২৩ ; বসুমতী, ২৯এ আশ্বিন ১৩২২]

১। প্রজাপতি ও মৌমাছি।

যে সকল পাঠক এখন একখানা বই তখন একখানা বই, এখন একটু তখন একটু পড়ে, কিছুই নিঃশেষ করিয়া পড়ে না, কোন জিনিশই তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করে না, একজন ইংরেজ লেখক তাহাদিগকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কুকুর যেমন মাঠে পোঁ করিয়া এক দৌড় দিল, হঠাৎ এক জায়গায় থামিয়া গিয়া একটা ঝোপ একটু শুঁকিল, আবার এক দৌড় দিল, আবার এক জায়গায় থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল, সেখানে হয়ত একটা ঘাস বাতাসে নড়িতেছে, সেটা একবার সাম্‌নের পা দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল,—কোথাও বেশীক্ষণ স্থিতি নহে, এ শ্রেণীর পাঠকও তেমনি কোন জিনিশে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারে না। পণ্ডিতী ভাষায় ইহাকে বলে 'পল্লবগ্রাহিতা'।

ইংরেজ লেখক তুলনাটা অভদ্র ভাবে দিয়াছেন। আমার মনে হয়, এ শ্রেণীর সৌখীন পাঠক প্রজাপতি-জাতীয়। প্রজাপতি এ ফুল হইতে ও ফুলে, এ ডাল হইতে ও ডালে উড়িয়া বসিতেছে, ঘন ঘন পাখা নাড়িতেছে, (গ্রীষ্মকালে নভেল-পড়া বাবুদেরও পাখা নাড়া অভ্যাসটা আছে), আবার উড়িতেছে, স্ফূর্ত্তির প্রাণ, কোন স্থির লক্ষ্য নাই, কোন কার্য্যে অভিনিবেশ নাই।

আর প্রকৃত পাঠক মৌমাছি-জাতীয়। মৌমাছি যে ফুলে বসিবে, তাহার সমস্ত মধুটুকু নিঃশেষ করিয়া সংগ্রহ না করিয়া অন্য ফুলে বসিবে

না, পাঁচফুলের মধু আহরণ করিয়া নিজের চাকে মধুসঞ্চয় করে। প্রকৃত পাঠক, যে গ্রন্থ হইতে যতটুকু জ্ঞান আদায় করা যায়, তাহা আয়ত্ত না করিয়া সেখানি ছাড়েন না; এইরূপ পাঁচ রকমের পাঁচ খানা পুস্তক হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। পণ্ডিতী ভাষায় ইঁহারাই 'আফলোদয়কর্ম্মা'।

২। পলাশী-চূতবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।

'পলাশীর আম্রবনে' দুইটি অমৃত ফল ফলিয়াছে, এবং দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আশৈশব ইংরেজী পড়িয়া, 'সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই মান অপমান' করিয়াও বাঙ্গালী ইংরেজী লিখিতে গেলে তাহা 'বাবু-ইংলিশ' হইয়া পড়ে। আবার যদি বেচারা 'রাজার নন্দিনী প্যারী'র পায়ে তেল দেওয়া ছাড়িয়া 'দীন দুঃখিনী মা'এর ঘরে ফিরিয়া আসে, 'জননী বঙ্গভাষা'র সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে ভাষায় আবার ইংরেজী-ইংরেজী গন্ধ পাওয়া যায়। কৃষ্ণকালী যেমন 'পুরুষ কি নারী' চেনা যায় না, ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালীর রচনাও সেইরূপ ইংরেজী কি বাঙ্গালা বুঝা যায় না। কাল ছেলে কালী মাখিলে জল মাখিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, জল মাখিলে কালী মাখিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালী ইংরেজী লিখিলে বাঙ্গালা-বাঙ্গালা ঠেকে, বাঙ্গালা লিখিলে ইংরেজী-ইংরেজী ঠেকে।

৩। ইংরেজী শিক্ষা।

রূপকথায় এক-রকম কাজলের কথা শুনিয়াছিলাম। তাহা চোখে দিলে, যে সব জিনিশ শুধু-চোখে দেখা যায় না, সে সব দেখিতে পাওয়া যায়, একটা সুন্দর জগৎ চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়ায়। ইংরেজী শিক্ষা ঠিক সেই কাজল। এই কাজল চোখে পরিয়া ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র,

চন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, আমাদের প্রাচীন কাব্য-নাটক, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ, এমন কি, আমাদের মেয়েলি ছড়া ও ছেলে-ভুলান গল্পের ভিতর যে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন (ও আমাদিগকে দিয়াছেন), তাহা কি ইংরেজী শিক্ষার পূর্ব্বে আমরা পাইয়াছিলাম? অথচ অনেকে ইংরেজী শিক্ষাটা দেশ হইতে উঠাইতে চাহেন। তাঁহারা গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার রাধিকার মত নাকীসুরে তান ধরিয়াছেন—

'মুছাইয়ে দে গো আমার নয়নের অঞ্জন'।

৪। গুহ্য ও উহ্য।

কাব্য যেখানে বুঝা যায় না, সেইখানেই তাহা transcendental! ধর্ম্ম যেখানে বুঝা যায় না, সেইখানেই তাহা আধ্যাত্মিক! দর্শন যেখানে বুঝা যায় না, সেইখানেই তাহা চরম জ্ঞান! যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত অপ্রাপ্য মনসা সহ। ইংরেজ কবি বলিয়াছেন,—Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter অর্থাৎ যে গান শুনা যায়, তাহা অপেক্ষা যে গান শুনা যায় না তাহা অধিক মধুর; সেইরূপ যাহা বুঝা যায় তাহা অপেক্ষা যাহা বুঝা যায় না তাহা অধিক গভীর! অতএব গুহ্যতত্ত্ব চিরদিন উহ্যই থাকে। এইজন্যই বুঝি আমাদের সমাজে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকেন না; তিনি, উনি, সে প্রভৃতি সর্ব্বনামেই সারেন—কেন না তাঁহাদের প্রেম অতি মধুর, অতি গভীর। জগতে একমাত্র হিন্দুর দাম্পত্যসম্পর্কই আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত। সুতরাং সম্বোধনটাও আধ্যাত্মিকতার পরা কাষ্ঠা!

৫। কাব্য ও কাব্য-সমালোচনা।

মিল্‌টনের কাব্যগ্রন্থাবলী পাঁচ শিকায় পাওয়া যায়, অথচ উক্ত কাব্য-গ্রন্থাবলী-অবলম্বনে র‍্যালে সাহেব যে সমালোচনা-পুস্তক লিখিয়াছেন,

তাহার মূল্য তিন টাকার উপর। এইজন্য একটি ছাত্র বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম,—"দেখ, যে লোক খনি হইতে সোণা তোলে,তাহার মজুরি যৎসামান্য; কিন্তু যে সেই সোণার উপর কারুকার্য্য করে অর্থাৎ খোদার উপর খোদকারি করে, তাহার 'বাণী' অধিক। সুতরাং ভবের বাজারের ন্যায় ভাবের বাজারেও সোণার প্রকাশকের কার্য্য অপেক্ষা সোণার বিকাশকের কার্য্যের অধিক কদর হইবে, কাব্য অপেক্ষা সমালোচনার মূল্য অধিক হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?"

৬। গদ্য ও পদ্য।

পদ্যে লিখিত হইলেই কবিতা হয় না, তাহার সাক্ষী—ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোল, ইতিহাস, এমন কি আইনের ধারা ও ডাক্তারী ঔষধের ব্যবস্থা (prescription) পর্য্যন্ত পদ্যে রচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পদ্যে লিখিত অথচ কবিত্ববর্জ্জিত সাহিত্যকে সাহিত্যভোজের 'ধোকার ঝাল' (বা ইংরেজী ডিনারের mock-turtle) বলিতে পারা যায়। আর গদ্যে লিখিত অথচ সরস কবিত্বপূর্ণ রচনাও বহু সাহিত্যে পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের সাহিত্যে 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এগুলি 'খাগড়াই মুড়কি'—হঠাৎ দেখিলে শুক্‌না খট্‌খটে মনে হয়, কিন্তু ভিতরে রসে ভরা। আর না-গদ্য না-পদ্য (neither fish nor flesh nor good red herring, prose run mad or verse run tame) দেখিলে আমার কলিকাতার ক্ষীর বা রাবড়ীর কথা মনে হয়—ইহাতে দুধের ভাগ অল্পই, নানারূপ ভেজাল-মিশান জলের ভাগই বেশী।

৭। অনুবাদের অনুবাদ।

দীপ হইতে দীপ জ্বালিলে আলোকের উজ্জ্বলতার হ্রাস হয় না; ছবি হইতে ছবি তুলিলে তাহা নিতান্ত ম্লান হইয়া পড়ে না; পাত্র হইতে

পাত্রান্তরে জল ঢালিলে জলের স্বাদুতা কমে না ; তেজারতিতে সুদের সুদ তস্য সুদ হয়, জমিদারীতে পত্তনির উপর দরপত্তনি, দরপত্তনির উপর ছেপত্তনি হয়—কিন্তু অনুবাদের অনুবাদ, সে একেবারে সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়া পড়ে। শালার শালার সঙ্গেও বরং সম্পর্ক থাকে, কিন্তু অনুবাদের অনুবাদের সঙ্গে অনেক সময় মূলের কোন সম্পর্কই থাকে না।

৮। গন্ধকের গুণ।

নরক পূতিগন্ধি ও কৃমিকীটাকীর্ণ, অথচ নরকে মড়ক হয় না কেন ? অনেকদিন এই সমস্যার মীমাংসা করিতে পারি নাই। তাহার পর, যখন মিল্‌টনের নরক-বর্ণনায় পড়িলাম, নরকে অফুরন্ত গন্ধক পুড়িতেছে (Ever-burning sulphur unconsumed), তখন বুঝিলাম সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটির বন্দোবস্ত ভাল, এই গন্ধকের গুণেই সকল সংক্রামক রোগের বীজাণু বা জীবাণু (bacilli) নষ্ট হয়।

৯। ইতিহাস।

ইতিহাস যে হাস্যরসাত্মক, তাহা ইহার নামেই প্রকাশ। ইহার নামের তাৎপর্য্য—হাস্যেই যাহার ইতি অর্থাৎ শেষ ; স্থূল কথা, ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু, ইহাতে সার কিছু নাই। এই জন্যই একজন বিলাতী জ্ঞানী বলিয়াছেন, ইহাতে নাম ও তারিখ ছাড়া আর সবই ঝুটা (In history everything is false except the names and the dates)। এই বুঝিয়াই 'পৃথিবীর ইতিহাস'-লেখক (সাঁতরা-গাছীর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী নহেন)—বিলাতের স্যর ওয়াল্‌টার র‍্যালে তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। অধুনা আমাদের দেশে যে ঐতিহাসিক গবেষণা ও মৌলিক অনুসন্ধানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথা বেশ সপ্রমাণ হয়। দেখুন,

বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উড়িয়াছে, অন্ধকূপ কলিকাতা হইতে উড়িয়াছে ; আদিশূরের যজ্ঞে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ আনয়ন, বিক্রমাদিত্য রাজা ও তাঁহার নবরত্ন, সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়, এ সবই পণ্ডিতগণ হাসিয়া উড়াইয়াছেন। Historic doubts about Napoleon নিতান্ত গাঁজাখুরি ব্যাপার নহে। সাধে কি বায়রন বলিয়াছেন,—I've stood upon Achilles' tomb,

And heard Troy doubted: time will doubt of Rome.

১০। নারীকবি।

নারীর কোমলহৃদয়-প্রসূত ও কোমলকর-কলিত কবিতা-কুসুমের দর্শনে স্পর্শনে অনেকে 'কুসুমে কুসুমোৎপত্তি' প্রত্যক্ষ করিয়া উল্লসিত হয়েন। আমার কিন্তু ইহাতে আপশোষ হয়। আমার মনে হয়,—নারী কবিতার প্রেরণা দিবেন, পুরুষ সেই প্রেরণাবশে কবিতা লিখিবে ; নারী দেবীর আসনে বসিয়া পূজা লইবেন, পুরুষ তাঁহার শ্রীপদে কবিতা-কুসুমাঞ্জলি ঢালিয়া জীবন সার্থক মনে করিবে, ইহাই স্বভাবের নিয়ম।

১১। বাঙ্গালা সাহিত্যের দিক্‌পাল।

সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইন্দ্রচন্দ্র-পাত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রবীণ লেখক ইন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ উভয়েরই অন্তর্ধান হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই জন দিক্‌পাল চলিয়া গেলেন। বাকী রহিলেন কি বায়ু ও বরুণ? বায়ু, অর্থাৎ ফাঁপা শূন্যগর্ভ (wind-bag) সাহিত্যিক, এবং বরুণ, অর্থাৎ যাঁহার রচনায় ক্ষীর নাই, নীর আছে। 'বুঝ লোক, যে জান সন্ধান'।

১২। অনুপাতে তালজ্ঞান।

অনেকে দুঃখ করেন, কয়েকখানি মাসিক পত্রের বিরাট্ কলেবর ও বিপুল প্রচারের অনুপাতে সেগুলিতে পুস্তক-সমালোচনা অতি অল্প স্থান

অধিকার করে। কিন্তু ইহাই স্বাভাবিক। হস্তীর বৃহৎ শরীরের তুলনায় চক্ষুঃ দুইটি ক্ষুদ্র। সমালোচনাও ত চোখ দিয়া দেখা। [ইহা হইতে কেহ না বুঝিয়া বসেন, লেখক সম্পাদকগণকে হস্তিমূর্খ বলিতেছেন।]

১৩। সাহিত্যে মেলবন্ধন।

কুলীনদের মধ্যে মেলবন্ধন আছে। যখন এ সব বিষয়ে বাঁধাবাঁধি ছিল, তখন সমান মেলে ভিন্ন কেহ পুত্রকন্যার বিবাহ দিতেন না, এমন কি আহার-ব্যবহার পর্য্যন্ত করিতেন না। কলিকাতায় সাময়িক সাহিত্যের লেখকদিগের মধ্যেও অনেক স্থলে এইরূপ দেবীবরী ব্যাপার দেখা যায়। অনেক পত্রেরই এক একটা দল আছে, সেই দলভুক্ত সকলেই পরস্পরের গুণমুগ্ধ, পরস্পরের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ; ভাবের আদান-প্রদান পরস্পরের মধ্যেই হয়। অন্য দলের সঙ্গে অনেক সময় মুখ দেখাদেখি নাই, বাক্যালাপ ত দূরের কথা। অবশ্য দু'চারিজন তেজস্বী (?) পুরুষ আছেন, তাঁহারা মেলভঙ্গ করিয়া সর্ব্বদ্বারী হইয়াছেন। কিন্তু কুলীন-সমাজে তাঁহারা ধিক্কৃত। সকল দলে মিশিতে গিয়া এই সকল সাহিত্যিক বাদুড়ের ন্যায় না পশু না পাখী বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

১৪। সমালোচনার স্বরূপ।

বাঙ্গালী জন্মমাত্র বাক্য-বাগীশ, তবে বাক্‌স্ফূর্ত্তির পূর্ব্বে এই শক্তি, বটবীজে শাখাপল্লবের ন্যায়, প্রচ্ছন্ন থাকে। পরে যথাকালে গোঁফের রেখার সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তি রসনাগ্রে প্রকাশিত হইলে পরনিন্দা পরচর্চ্চা নামে প্রথিত। আবার লেখনীর অগ্রে প্রকাশিত হইলে ইহাই সমালোচনা নামে পরিচিত। [যেমন এই বিড়াল বনে গেলেই বন-বিড়াল হয়।]

১৫। সমালোচক-বাসুকি।

পুরাণে শুনিয়াছি, মর্ত্ত্যবাসীর পাপের ভার যখন বাড়িয়া উঠে, তখন বাসুকি মাথা নাড়েন; ফলে ভূমিকম্প হয়। সেইরূপ সাহিত্য-জগৎ সমালোচকের সহস্রফণার উপর অবস্থিত; সুতরাং সাহিত্যে দোষস্পর্শ হইলেই সমালোচক মাথা নাড়েন, ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে বিষম ভূমিকম্প হয়। (যেন হলধরের পদভরে ধরণী টলমল করে।)

১৬। 'দাদা হাম্বারব ছেড়ো না।'

একটি বিলাতী গল্পে পড়িয়াছিলাম, এক জন চাষা ধেনুরব—বেণুরব নহে—বড় সুন্দর অনুকরণ করিতে পারিত। নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম-গুলিতে কোথাও মেলা বসিলে, চাষা হাম্বারবে জনসাধারণকে মোহিত করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিত। ক্রমে কিন্তু তাহার সাহস বাড়িয়া গেল। সে গর্ব্বভরে এক দিন ঘোষণা করিল,—'আমি সকল জন্তুর স্বর অবিকল নকল করিতে পারি।' এবং তদনুসারে সে ক্রমান্বয়ে ষাঁড়ের ডাক, গাধার ডাক, শূকরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ, ঘোড়ার চিঁহি, ভেড়ার ভ্যা ভ্যা, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, বিড়ালের মেউ মেউ, ইঁদুরের কিচির মিচির প্রভৃতি অনুকরণ করিতে লাগিল। কিন্তু এগুলি তেমন জমিল না। সকলে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। ভিড়ের ভিতর হইতে আর এক জন চাষা বলিয়া গেল—'দাদা, হাম্বারব ছেড়ো না (Stick to the cow, man)।'

বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশের অনেক লেখককেও ঠিক এই পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করে। যখন দেখি, স্বভাবকবি শৈশব হইতেই সঙ্গীত ও কবিতা-রচনায় যশোলাভ করিয়া তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের ধারা আবিষ্কার করিতে সুরু করিলেন, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, 'Stick to the cow, man' 'দাদা হাম্বারব ছেড়ো না।'

আবার যখন দেখি বাগ্মিবর বিফল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের আসরে নাম জাহির করিয়া শেষটা জুজুর ভয়ে কণ্টকাকীর্ণ রাজনীতির রাজপথ ছাড়িয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বেণুকুঞ্জ ও সমাজতত্ত্বের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইলেন, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, 'Stick to the cow, man' 'দাদা, হাম্বারব ছেড়ো না'।

আবার যখন দেখি, যিনি সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া বিদ্বৎসমাজে বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছেন, তিনি সে সম্ভ্রম তুচ্ছ করিয়া কাব্যরচনার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়—'Stick to the cow, man' 'দাদা হাম্বারব ছেড়ো না!' আবার যখন দেখি, যিনি রাশি রাশি চমকপ্রদ উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্যের হাটে বেশ পশার জমাইয়া ফেলিয়াছেন, তিনি তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে লেখনীচালনা করিতেছেন, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়—'Stick to the cow, man' 'দাদা, হাম্বারব ছেড়ো না!'

আবার যখন দেখি, যিনি ন্যায়শাস্ত্রের ঘটত্ব-পটত্বের ন্যায় ব্যাকরণের ষত্বণত্বহ্রস্বত্ব-দীর্ঘত্ব প্রভৃতির বিচারব্যাপারে বাঙ্গালাসাহিত্যের নিরীহ পাঠকের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া খুব একজন হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া কাব্যসৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে বদ্ধপরিকর হইয়া ভারতবর্ষের বক্ষে প্রবন্ধের পীরামিড প্রস্তুত করিতেছেন, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়—'Stick to the cow, man' 'দাদা, হাম্বারব ছেড়ো না'! এইরূপ যখন দেখি, ঐতিহাসিক পরলোক-রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন, পল্লীচিত্র-কার সাধুপুরুষগণের জীবনচরিত আলোচনা করিতেছেন, কবি হাস্যরসিক সাজিতেছেন, বৈজ্ঞানিক বর্ণপরিচয় প্রণয়ন করিতেছেন, গণিতবিৎ নীতিশিক্ষার পুস্তক লিখিতেছেন, এক কথায়—কর্ম্মকার কুম্ভকার-বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়—'Stick

to the cow, man' 'দাদা, হাম্বারব ছেড়ো না!' [পাঠকবর্গ আশ্বস্ত হউন, একজন প্রবীণ সাহিত্যসেবী ও নিপুণ সমালোচক এই অধম লেখককেও ইতঃপূর্ব্বে প্রকারান্তরে এই পরামর্শই দিয়াছেন,—অর্থাৎ জাতব্যবসা ছেলে-লেখান ছাড়িয়া সাহিত্যের আসরে মজুরা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারও ঐ কথা,—'Stick to the cow, man' 'দাদা, হাম্বারব ছেড়ো না'!]

১৭। ধোপার গাধা ও ইঁদুর।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'মশলাবাঁধা কাগজে' আমাদের দেশের গ্র্যাজুয়েটদিগের ধোপার গাধার সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। উভয়েই চতুষ্পদ বা উভয়েই অম্লানবদনে কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া নহে, অন্য কারণে। ধোপার গাধার পিঠে কাশ্মীরী শালও আছে, বোম্বাই চাদরও আছে, ফরাশডাঙ্গার ধুতী-শাড়ীও আছে, আবার রেলির ঊনপঞ্চাশও আছে (স্বদেশীতেও ঊনপঞ্চাশ নাই কি?), সবই সে পিঠে বহিতেছে, কিন্তু কোন থানিই তাহার নিজস্ব নহে। আমাদের গ্র্যাজুয়েটগণও কালিদাস ভবভূতি, শেক্‌স্‌পীয়ার মিল্‌টন, বেকন স্পেন্‌সারের দুই গৎ জানেন, আবার বিলাতি ওঁচা লেখকগণের রচনাও দুদশ পাতা পড়িয়াছেন; অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি সবই কিছু কিছু জানেন, কিন্তু কোনটাই ভালরূপ জানেন না। প্রকৃত assimilation এর কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

বোধ হয়, প্রকৃত assimiliation এর দৃষ্টান্ত ইঁদুর! মনে করুন, ঐরূপ এক বস্তা কাপড় গাধার পিঠে না চড়াইয়া যদি ইঁদুরের পেটে চালান যায়, তাহা হইলে যথাসময়ে দেখা যাইবে বস্তাকে বস্তা উড়িয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। ইঁদুর সব গলাধঃকরণ করিয়াছে,

অথচ তাহার পেট চিরিয়া একটুকরা কাপড়ও পাওয়া যাইবে না। সব তাহার রক্তমাংসে অস্থিমজ্জায় পরিণত হইয়াছে। ইহাকেই প্রকৃত assimiliation বলে।

১৮। অধ্যাপনার প্রণালী।

যে খুব খানেওয়ালা সেই যে রন্ধনে পটু ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। যে অনেক বই পড়িয়াছে সেই যে অন্যকে পড়াইতে পারে, ইহা মনে করাও ভুল। আবার ভোজনে দড় এবং পাকা রাঁধুনী হইলেই যে পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান থাকে, এমন কোন কথা নাই। সেইরূপ বিদ্বান্ ও শিক্ষাদানতৎপর হইলেই যে অধ্যাপনার বৈজ্ঞানিক প্রণালী জানিবে, এমন কোন কথা নাই। ইহা একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার, শিক্ষা-সাপেক্ষ।

১৯। শালের হাঁসিয়া লাগান ও কাঁথা সেলাই।

সাহিত্যপুস্তকের বিলাতী সংস্করণ দেখিলে শালের হাঁসিয়া লাগানর কথা মনে হয়। আদত কাশ্মীরী শাল ও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যপুস্তক একই শ্রেণীর ; বিলাতী সংস্করণে প্রদত্ত টীকা পূর্ব্বভাষ প্রভৃতিও বহুমূল্য হাঁসিয়ার ন্যায় সুন্দর এবং মনোহর। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের কী (Key) গুলি ঠিক যেন কাঁথা সেলাই, ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে টীকাটীপ্পনী—to, of, the, it, as, for, এর উপর নোট, কমা ফুলষ্টপের উপর নোট, একেবারে ঠাশা-গাঁথা টানা-বুনানি।

তবে আজকাল কাশ্মীরী শালের নকলে জার্ম্মান ঝুঁটো শাল হইতেছে। কোন কোন বিলাতী টীকা এই জার্ম্মান শালের অনুরূপ হইয়া পড়িতেছে। পক্ষান্তরে কাঁথা সেলাইএ পূর্ব্ববঙ্গে অনেক গৃহলক্ষ্মী বিচিত্র কারুকার্য্য দেখাইয়া যশোলাভ করেন। কোন কোন দেশী কী-মেকারও এইরূপ যশোলাভ করেন।

২০। কলেজের ছাত্র না কয়েদী ?

শিক্ষাব্যবসায়ীদিগের অদ্ভুত ব্যবস্থায় কলেজের ছাত্রেরা জেলের কয়েদী। তাহাদের পিতৃদত্ত নাম লুপ্ত হয় (blotted out and rased from the books of life !) ও শুষ্ক গণিতের সংখ্যা সেই স্থান অধিকার করে। কয়েদীদিগের ন্যায় তাহারা নম্বরওয়ারী। শিক্ষকগণ এই নম্বর ডাকিয়া হাজিরাবহিতে তাহাদের হাজিরা লেখেন। ইহাতেও কি আপনারা প্রাচীন কালের গুরু-শিষ্যের স্নেহ-সম্পর্ক আশা করেন ?

২১। Attend, attend to ; attendance, attention.

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীতে দেখা যায়, প্রত্যেক ছাত্র শতকরা এত পরিমাণ লেক্‌চার attend করিবে, attend to নহে ; তাহাদিগের attendance (উপস্থিতি) সম্বন্ধে কড়া ব্যবস্থা, attention (মনোযোগ) সম্বন্ধে নহে। অতএব হাজিরা দিলেই ব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখান হইল না কি ?

২২। সৌরজগতে কত চাঁদ ?

যেমন জ্যোতিষ্কের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ, জহুরীর মধ্যে লভচাঁদ মোতিচাঁদ, জুয়াচোরের মধ্যে উমিচাঁদ, দেশদ্রোহীর মধ্যে জয়চাঁদ, মাতালের মধ্যে নিমচাঁদ, বাচালের মধ্যে নদেরচাঁদ, সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে লালচাঁদ, জুতানির্ম্মাতার মধ্যে লাকচাঁদ, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিধারীদিগের মধ্যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ। (সম্প্রতি নাকি এই বৃত্তি ব্যস্তবৃত্তি হইয়াছে।)

২৩। লজিকে জ্ঞান।

একজন ছাত্র নূতন নূতন লজিক পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, মামা ও শালা genus এক, কিন্তু species আলাদা ! চূড়ান্ত জ্ঞান !

আমাদের দেশে বিশ্বাস, নাক দিয়া জল খাইলে মানুষ খুব সবল হয়। এই বিষয়ে তর্ক উঠিলে একজন লজিক-পড়া ছাত্র বলিয়া উঠিল—'দেখ, জানোয়ারের মধ্যে হাতী খুব বলবান্—তাহার কারণ, হাতী নাক দিয়া জল খায়।' অকাট্য যুক্তি!

২৪। পরীক্ষার্থী ও চিররোগী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা ঠিক যেন চিররোগী। চিররোগী প্রথমে ডাক্তার-বৈদ্য ডাকাইয়া রীতিমত চিকিৎসা করায়। পরে তাহাতে ফল না হইলে নানারূপ পেটেণ্ট ঔষধ খায়, সংবাদপত্রের স্তম্ভে যে ঔষধের বিজ্ঞাপন দেখে তাহাই আনায়, দেখে যদি তাহাতেই পীড়ার উপশম হয়। শেষে কিছুতে কিছু না হইলে স্বপ্নাদ্য-মাদুলি-ধারণের ব্যবস্থা করে। পরীক্ষার্থীরা প্রথমে শিক্ষকের লেক্‌চার শুনিয়া পরীক্ষার জন্য রীতিমত প্রস্তুত হয়। যখন দেখে তাহাতে পাশের পড়া তৈয়ারি হয় না, তখন রকম রকম ব্যাখ্যা-পুস্তক কিনিতে থাকে, Model Questions, Guide প্রভৃতির শরণ লয়—এগুলি ঠিক পেটেণ্ট ঔষধ। তাহাতেও যখন সুবিধা হয় না, তখন কোথায় কোন্ প্রশ্নকর্ত্তা কি প্রশ্ন বলিয়া দিয়াছেন গুজবে যেরূপ শুনে, সেই মত প্রশ্নের উত্তর আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করে—ঠিক স্বপ্নাদ্য-মাদুলি-ধারণ নহে কি?

২৫। পেটেণ্ট পুস্তক।

একখানি বিলাতের বিবরণে পড়িয়াছিলাম,—বিলাতী কোন মনিহারী দোকানে Pears' Soap বা Rimmel এর Scent চাহিলে, দোকানদার বলে,—'আমাদের ফার্ম্মের তৈয়ারী ঐ জিনিশ গুণে উহার সমকক্ষ অথচ দরে সস্তা। তাহাই লউন না কেন?' আমাদের দেশের পুস্তক-বিক্রেতা

ও পুস্তক-প্রকাশকদিগেরও ঐ বুলি। কোন একখানা সদ্‌গ্রন্থের একটা নামজাদা সংস্করণ চাহিলে, তাঁহারা বলিয়া বসেন—'আমাদের ঘরের সংস্করণ লউন, দরে সুবিধা হইবে অথচ ভাল জিনিশ।'

স্কুল-কলেজেও প্রায় ঐ ব্যবস্থা। প্রায় প্রত্যেক কলেজের অধ্যাপকের একটা করিয়া সংস্করণ আছে, তিনি নিজের কলেজে নিজের পেটেণ্টই চালাইতে চেষ্টা করেন। স্কুলে ত আরও চমৎকার ব্যাপার। শিক্ষকদিগের নিজের নিজের স্বনামী বা বেনামী সাহিত্যপুস্তক, ব্যাখ্যাপুস্তক, অনুবাদপুস্তক, অঙ্কপুস্তক, ইতিহাস, ভূগোল আছে; কোন ছাত্র যে হঠাৎ এক স্কুল ছাড়িয়া অন্য স্কুলে যাইবেন, তাহার যো-টি নাই। গেলেই সেট্-কে-সেট্ বই বদল। সব নূতন ভোল বা পেটেণ্ট। পাকা চাল বটে!

২৬। ভাষা ও সভ্যতা।

লোকের ভাষা হইতে সভ্যতা ও আচারবিচারের বেশ পরিমাপ করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

পাড়াগাঁয়ের লোকে বলে, খিদে লাগা, তেষ্ণা লাগা; কলিকাতার লোকে বলে, খিদে পাওয়া, তেষ্ণা পাওয়া। এই প্রভেদের কারণ কি? পাড়াগাঁয়ে খোলা হাওয়ায় পরিপাকশক্তি ও অন্যান্য শারীরিক শক্তি খুব সতেজ। কাযেই শারীরিক অভাবগুলি তাহাদিগকে তীব্র বেদনা দেয়, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতিতে তাহাদিগের রীতিমত পীড়াবোধ হয়। পক্ষান্তরে, সহুরে লোকের বদ্ধ বায়ুতে বাস করিয়া হজমশক্তি প্রভৃতি (Sluggish) মন্দা পড়িয়া যায়, তাহারা একটা নিয়ম-রক্ষার জন্য খায়, ঘুমায়; তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে না।

আরও একটা কথা। সহরে জীবনসংগ্রাম (Struggle for

existence) বড় কঠোর, কাযেই আহার-নিদ্রা প্রভৃতি সহরের লোকের নিকট এক একটা উপসর্গ। যেমন ভূতে পায়, পেঁচোয় পায়, তেমনই তাহাদেরও ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, ঘুম পায়। এই প্রাকৃতিক অভাবগুলা না থাকিলেই যেন তাহাদের ভাল হইত।

আবার দেখুন, পাড়াগাঁয়ে কোনও প্রতিবেশী আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'অমুক ব্যক্তি বাড়ী আছেন' ? কলিকাতায় জিজ্ঞাসা করে, 'অমুক ব্যক্তি ঘরে আছেন ?' পাড়াগাঁয়ে ভেদবুদ্ধি নাই, সমস্ত বাড়ীটাতে পরিবারস্থ সকলের সমান অধিকার। সহরে এক এক জনের এক এক খাস্ কামরা রিজার্ভ করা, সেখানে বাটীর অন্য লোকের প্রবেশ-নিষেধ। পায়রার খোপের ন্যায় এক এক খোপে যোড়ে যোড়ে থাকেন। সেখানেই বামুন-ঠাকুর ভাতের থালা আনিয়া দেয়, পংক্তিভোজনের ব্যবস্থা নাই। আহার-বিহার সব সেই ঘরে।

আরও দেখুন, পাড়াগাঁয়ে বলে, 'আক্রা' ; সহরে বলে, 'মাগ্‌গি'। পাড়াগাঁয়ের লোকে সাধারণতঃ গরীব, তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ নীচু, চড়া দাম দেখিলে তাহারা পেছোয়, বলে আক্রা (অক্রেয়), কিনিবার মত নহে। সস্তা হইলে খাইব। সহরের লোকে বলে, মাগ্‌গি (মহার্ঘ), দাম বেশী, কিন্তু কেনে। দেড় টাকা সেরের পটোল, আট আনা সেরের নূতন আলু, ইত্যাদি।

পাড়াগাঁয়ে বলে, কাপড় 'কাল'; কলিকাতায় বলে কাপড় 'ময়লা'। সহুরে লোক সৌখীন, কাপড় একটু অপরিষ্কার (ময়লা) হইলেই ধোপাবাড়ী দেয় ; পাড়াগেঁয়ে লোক যতক্ষণ কাপড় 'কাল' অর্থাৎ ময়লা জমিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ না হয়, ততক্ষণ ছাড়ে না।

পাড়াগাঁয়ে বলে, 'সোন্দর' (সুন্দর), কলিকাতায় বলে, 'ফরসা'। সহরের সৌখীন লোকে ধব্‌ধবে রংটা আগে চায়, সর্ব্বদোষ হরে গোরা !

কেন না, তাহারা সদাসর্ব্বদা সাহেব-মেম দেখে। পাড়াগাঁয়ের লোক অত-শত বুঝে না, তাহারা 'সুন্দর' চাহে।

২৭। স্বর ও ব্যঞ্জন।

বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জন দেখিতে পাই। স্বরবর্ণ অন্যের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে। মানুষের মধ্যেও ঠিক এই প্রভেদ নাই কি? এক শ্রেণীর লোক স্বাবলম্বনের বলে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, কখনও পরের দ্বারস্থ হন নাই। ইঁহারা Self-made men—স্বনামপুরুষো ধন্যঃ, ইঁহারাই স্বরবর্ণ। আর এক শ্রেণীর লোক পরের কপালে করিয়া খান; কেহ বাপের, কেহ শ্বশুরের, কেহ ভগিনীপতির জোরে মাথাচাড়া দেন; পিতৃনামা চ মধ্যমঃ। কেহ কেহ বা বাহিরের মুরুব্বী পাকড়াইয়া মানুষ হন। ইঁহাদের নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার সাধ্য নাই। এই-গুলি ব্যঞ্জনবর্ণ। বর্ণমালায় স্বর অপেক্ষা ব্যঞ্জনের সংখ্যা অনেক বেশী; সমাজেও স্বয়ংসিদ্ধ অপেক্ষা পরমুখপ্রেক্ষীর সংখ্যা অনেক বেশী।

২৮। হিন্দু-বিবাহ।

হিন্দুবিবাহ শ্রাদ্ধাদি দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। ইহাতে প্রেমের সম্পর্ক নাই, হেমের সম্পর্ক। শাস্ত্রে লিখিয়াছে (অনুষ্টুপ্ হইলেই শাস্ত্র)—'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' (এখানে সমাহারদ্বন্দ্ব ইতি উল্লুকভট্টকৃত টীকা। কামিনী ও কাঞ্চন এক পর্য্যায়ভুক্ত, রায়সাহেবের পুস্তক দেখুন; অতএব সমাহারদ্বন্দ্ব বাধে না।) 'হতো যজ্ঞ স্ত্বদক্ষিণঃ' এইরূপ হত-গজগোছের কি একটা শ্লোক আছে। অতএব বিবাহে পণগ্রহণ সিদ্ধ! বাস্তবিক, অর্থলাভের দুই পন্থাঃ—patrimony ও matrimony! ইহারই একশেষদ্বন্দ্ব money?

২৯। বাল্যবিবাহ।

বাল্যবিবাহটা ঠিক (vaccination) টিকা দেওয়ার মত। শৈশবে ব্যবস্থা করাই বিধি। নতুবা অনেক দোষ ঘটে। অনেক ছাত্রের এল্ এ, বিএ ক্ল্যাসে উঠিয়া বিবাহ হয় ও তাহারা যথাসময়ে ফেল হয়। বাল্য-বিবাহিতের দল বেশ কাটাইয়া উঠে। যথা——।

৩০। সীতা ও বঙ্গনারী।

স্ত্রী শুধু স্বামীর একচেটিয়া সম্পত্তি নহেন, সমস্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ, পরিবারস্থ সকলের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে, এইরূপ একটা কথা ৺চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি হিন্দুভাবের লেখকগণ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে, দীনেশ বাবু তাঁহার 'রামায়ণ ও সমাজ' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, রামের নির্ব্বাসনকালে সীতাদেবী পরিবারস্থ সকলের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হইয়া তাঁহার সঙ্গে বনে গেলেন, কাহারও মুখাপেক্ষা করিলেন না। দীনেশ বাবু বলেন, ইঁহাই প্রকৃত হিন্দুনারীর আদর্শ। আমাদের সমাজের নারীগণ এই আদর্শভ্রষ্ট হইতেছেন, কবে এই আদর্শ আবার ফিরিয়া আসিবে—ইত্যাদি বলিয়া দীনেশ বাবু আক্ষেপ করিয়াছেন।

দীনেশ বাবু আক্ষেপ করেন কেন? হালের মেয়েরা ত বুড়া শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে পায়ে ঠেলিয়া, একান্নবর্ত্তি-পরিবারপ্রথার তোয়াক্কা না রাখিয়া, স্বামীর সঙ্গে তাঁহার চাকরীস্থানে দূরদেশে যান। প্রবাস আর বনবাস ত একই! তবে আজকাল লক্ষ্মণ দেবর সঙ্গে যান না; স্বামীর ভাই অপেক্ষা পত্নীর ভাই-ই বেশী আদরের। তাই অনেক সময়ে শালাবাবুই এই প্রবাস-যাত্রার দ্বিতীয় সঙ্গী হয়েন! তা'র পর—সুবর্ণমৃগের সন্ধানে

স্বামীকে পাঠান ত গৃহিণীদের নিত্যকর্ম্ম। অতএব তাঁহারা সীতার চেয়ে কম কিসে?

৩১। পারিবারিক জীবন ও ঐকতান-বাদন।

সঙ্গত বাঁধিবার সময় যাহাই হউক, একবার জমিয়া গেলে ঐকতান-বাদনে প্রত্যেক যন্ত্রের স্বতন্ত্র স্থুর শুনা যায় না, সবগুলি মিলিয়া একটি মধুর ঐকতান ঝঙ্কার শুনা যায়। প্রকৃত পারিবারিক জীবনেও এই মধুর ঐকতান বিরাজ করে।

গীতবাদ্যে ইহার ব্যতিক্রম হইলেই কর্ণজ্বালা উৎপাদন করে। পারিবারিক জীবনেও ঐক্যের অভাব হইলে দেখিতে শুনিতে বড়ই খারাপ হয়। কোনও পরিবারে কর্ত্তার জয়ঢাকের ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং শব্দে সকলে ত্যক্ত, কোথাও বা গিন্নীর কাঁসীর ট্যাং ট্যাং শব্দে মাথা ধরিয়া যায়, কোথাও বা বিধবা মুখরা ভগিনীর বেস্থুরা বেহালা পিড়িং পিড়িং করিয়া রসভঙ্গ করিতেছে, কোথাও বা ধনীর কন্যা বৌমা তাঁহার টেবূল্-হার্মোনিয়ম লইয়া সমস্ত ঘরটা যুড়িয়া বসিয়াছেন, অন্য বাদ্যযন্ত্রবাদকদিগকে মানে মানে আপন পথ দেখিতে হইতেছে; বৌমা এত ভিড় ভালবাসেন না, একাকিনী তাঁহার হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া পাড়া মাৎ করিবেন, স্থির করিয়াছেন!

৩২। পুরাতন ও নূতন।

পুরাতন চাউল স্বাস্থ্যের অনুকূল। পুরাতন চাল-চলনও সামাজিক স্বাস্থ্যের অনুকূল। শাস্ত্রে বলে,—

যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন যাস্যন্ন দুষ্যসে॥

তবে তাই বলিয়া খুব পুরাতন পোকা-ধরা দুর্গন্ধ চাউল লঘু পথ্য বলিয়া সেব্য নহে। আমাদের সমাজেও বৈদিক আচারের দোহাই দিয়া ষোড়শী-বিবাহ বা গোমাংস-ভক্ষণের পুনঃপ্রচলন পুরাতন চাল বলিয়া শ্রদ্ধার যোগ্য নহে। এ সব স্থলে মধ্যপথ-অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

একটু বয়স হইলে নূতন চাউল পেটে সয় না। একটু বয়স হইলে নূতন চাল-চলনও বরদাস্ত হয় না। যাহাদের অগ্নি প্রবল, অর্থাৎ যুবক-যুবতীদিগের, নূতন চাউল বেশ হজম হয়; নূতন চাল-চলন, ধরণ-ধারণ, কায়দা-কানুনও তাঁহাদের বেশ ধাতে সয়। নূতন চাউল খাইতে মিষ্ট, কিন্তু হজম করা কঠিন। নূতন চালচলনও মিষ্ট লাগে, কিন্তু হজম করা কঠিন।

৩৩। টিকি।

টিকি দুই প্রকার—হজমি ও বদ্‌হজমি। এক সম্প্রদায় লোক আছেন, তাঁহারা সন্ধ্যা হইলে হোটেলে খানা খান, সরাপখানায় ও তাড়িখানায়ও যান, আরও কত স্থানে কত ভাবে বিরাজ করেন—অথচ মাথায় বিরাট্‌ শিখা। এই শিখা অগ্নিশিখার ন্যায় সর্ব্বভুক্‌—অথবা আদার কুচির ন্যায় হজমি! যেমন রামকবচ-ধারণে ভূতের উৎপাত-নিবৃত্তি হয়, তেমনি শিখাধারণে আচারের বা শুচিবায়ুর উৎপাত-নিবৃত্তি হয়। [একগাছা চুল পেটে গেলে পেট ফাঁপে; আর একগোছা চুল মাথায় ধারণ করিলে পরিপাক-শক্তি আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পায়। ইহাকেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য!]

আর এক সম্প্রদায় লোক হিতোপদেশের ব্যাঘ্রের ন্যায় গোহত্যাদি মহাপাতক করিয়া, শেষে অজীর্ণরোগে ধরিলে গঙ্গাস্নায়ী নিরামিষাশী সাজেন, থিয়সফিষ্ট-লীলা প্রকট করেন। ইঁহাদের শিখা বদ্‌হজমি!

Dyspepsia বা অজীর্ণ রোগের এই morbid symptom এর কথা ডাক্তারী কেতাবে লেখে না। অথচ এটা জানা না থাকিলে প্রকৃত রোগনির্ণয় হয় না। সচরাচর চল্লিশের নীচে এ রোগ ও তাহার আনুষঙ্গিক উপসর্গ দেখা যায় না।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহের ন্যায় এমন কে আছেন যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এই উভয়-জাতীয় টিকি সংগ্রহ করিয়া রমেশভবনে রক্ষা করিবেন এবং বৈজ্ঞানিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণে নিগূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে অনুরোধ করিবেন?

[যথার্থ আস্তিক ব্যক্তি চূড়াকরণের সময় হইতেই শিখাধারণ করেন ও অন্যান্য সদাচার পালন করেন। তাঁহাদের শিরোদেশের শিখা সমাজের শিরোভূষণ।]

৩৪। তবে খাই।

ন'দের একজন বামুন বিদেশে গিয়া পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া একটা বাজারে পৌঁছিলেন এবং আধপয়সার মুড়ি ও আধপয়সার মূলা কিনিয়া কোঁচরে মুড়ি রাখিয়া এক গাল করিয়া মুড়ি আর এক কামড় করিয়া মূলা খাইতে খাইতে পথ চলিতে লাগিলেন। [প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র]। পথে কোন লোকের সঙ্গে দেখা হইলেই মূলা-মুড়ি খাওয়া বন্ধ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—'মশায়ের বাড়ী কি অমুক দেশে?' (নিজের দেশের নাম করিয়া।) তাহাতে সে 'না' বলিলে আবার জিজ্ঞাসা করেন,—'তবে কি অমুক দেশে?' (নিজের মামার বাড়ীর দেশের নাম করিয়া।) তাহাতেও 'না' বলিলে ফের জিজ্ঞাসা করেন—'তবে বুঝি অমুক দেশে?' (এবার নিজের শ্বশুরবাড়ীর দেশের নাম করিয়া)। তাহাতেও যখন লোকটি 'না' বলে, তখন বামুন খুব এক মুঠো মুড়ি এক হাতে লইয়া ও মূলায় খুব একটা কামড় দিয়া বলিলেন,—'তবে খাই।'

অর্থাৎ জানাশুনা লোকে না দেখিলেই অনাচারে পাপ নাই। অনেকের হিন্দুয়ানি এই 'তবে খাই' তন্ত্রের।

Corollary : মেয়েদের ঘোমটা টানাও অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়মে।

৩৫। এটা অনুষ্টুপের দেশ।

আমাদের এটা অনুষ্টুপের দেশ। ভালমন্দ যেরূপই আচারবিচার হউক, সমর্থনে একটা অনুষ্টুপের শ্লোকের এক পাদ ঝাড়িতে পারিলেই আমাদের মাথা হইতে একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া যায়, আমাদের (conscience) ধর্ম্মজ্ঞান বেশ হাল্‌কা ঠেকে। গুরুর চরণের ন্যায়, অনুষ্টুপের চরণ আমাদের মাথায় লাগিলে, আমরা বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি হই।

'দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি'—অতএব ময়রার দোকান হইতে ঝীর আনীত বেগ্‌নি, ভাজি, আলুর দম, শিঙ্গারা খাইতে দোষ নাই, কিন্তু ঝীর হাতে রান্না আলুর দম খাওয়া যায় না। 'পুনঃপাকেন শুধ্যতি'—অতএব দক্ষিণ-বঙ্গে ব্রাহ্মণের (কোথাও কোথাও বিধবারও) সিদ্ধচাউলের অন্নভোজনে দোষ নাই। 'দন্তলগ্নন্তু দন্তবৎ'—অতএব থড়্‌কে লওয়ার অপ্রয়োজন। 'বিদেশে নিয়মো নাস্তি'—অতএব মধুপুরে গিয়া সস্তায় মুর্গি যত পার চালাও। 'আতুরে নিয়মো নাস্তি'—অতএব আঁতুড়ঘরে পোয়াতীকে পেঁয়াজ-রশুন খাওয়াও। 'ঔষধার্থং সুরাপানম্'—অতএব এক পেগ খাও—কেননা না খাইলেই অসুখ করে। Prevention is better than cure.—Prophylactic ঔষধের এই নিয়ম।

এই ধূয়া অবলম্বনে একটা কবিতা লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু 'ও রস বঞ্চিত' ইত্যাদি।

৩৬। 'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।'

গীতা বলিতেছেন (৪।১৭) 'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ'। বাঙ্গালা দেশে গীতার চর্চ্চা খুব। সুতরাং বাঙ্গালী এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া

লইয়াছে। চাকরিই করি আর ব্যবসাই করি, আমাদের সকল কর্ম্মের শেষ গতি—গৃহিণীর গহনা গড়ান (অনুপ্রাসটুকু রসান লাগান) !

৩৭। Love.

ইংরেজী Love কি সংস্কৃত 'লভ্' ধাতুর জ্ঞাতি ? পঞ্জিকায় যখন 'মেষরাশির স্ত্রীলাভ' লেখা দেখি, তখন ত 'Love' ও 'লাভ' একই কথা বলিয়া মনে হয়। লভ্ ধাতু আত্মনেপদী ভ্বাদিগণীয় ; বিলাতী Love-টাও কেবল আত্মতৃপ্তি এবং নিতান্ত পার্থিব, of the earth, earthy ; till death do us part, সম্বন্ধো জীবনাবধিঃ, একের মরণেই দাম্পত্য-প্রণয়ের অবসান, হিন্দুর ন্যায় পরকাল পরজন্ম পর্য্যন্ত পৌঁছে না।

আর 'লুভ্' ধাতুর সহিত যদি ইহার জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করি, তাহা হইলে কি দাঁড়ায় ? শাস্ত্রে বলে, কামিনীর লোভ কাঞ্চনের লোভ অপেক্ষাও অধিকতর মোহকর। লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু। পরস্ত্রী-লোভে রাবণ সবংশে উৎসন্ন গিয়াছিল, ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসের এই দোষে ট্রয় ভস্মসাৎ ও বহু বীর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, আলাউদ্দিন চিতোর-ধ্বংস করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব দাঁড়াইল এই যে Lover = লুব্ধক, হরিণ-নয়নার প্রতি নয়নশরঘাতে সদাতৎপর। প্রেমিক তাহা হইলে রিপু-ষট্কের প্রথমের অধীন নহেন, তৃতীয়ের অধীন।

'লুভ্' ধাতু দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী। অতএব মূলে ইহা লোভ বই আর কিছুই নহে বটে, কিন্তু পরিণামে ইহাতে দিব্যভাব ও স্বার্থশূন্যতা বিরাজিত। ইংরেজ কবিগণ তাই ইহার জয়গান করিয়া বলিয়াছেন—

'Love is Heaven and Heaven is Love.'

'For this the passion to excess was driven—
That self might be annulled'.

৩৮। আমার জন্মভূমি।

(নব-সংস্করণ) (১)

টাকা মোহর গিনি ভরা আমাদের এ বসুন্ধরা।
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।
ও যে মামলা দিয়ে তৈরি সে দেশ ডিক্রি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

জজ মুন্‌সফ সদর-আলা কোথায় উজল এমন ধারা,
কোথায় এমন ছেলের বুড়োয় মামলা নিয়ে লেগে।
ও তা'রা মামলার ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে মামলার ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

এমন দগ্ধ আইন কাহার, কোথায় এমন নথির বাহার,
কোথায় এমন কোর্ট-ফী ষ্ট্যাম্প ডেমির সাথে মেশে
এমন ধনের উপর ঢেউ খেলে যায় মামলা কাহার দেশে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

---

(১) মেগ্যাস্‌থেনিস বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সময়ে ভারতবাসীরা মামলা-বাজ ছিল না। আর আজ দেশ মামলায় মামলায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। এই আক্ষেপে কবির বিখ্যাত গানের নবসংস্করণ-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

টাকায় টাকায় ভরা শাখী(২) কোর্টে কোর্টে গাহে পাখী(৩)
গুঞ্জরিয়া আসে টাউট (tout) পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে।
তা'রা ব্রীফের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ব্রীফের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

ভায়ের মায়ের সঙ্গে ভেদ, পার্টিসানের বিষম জেদ,
উকিল তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।
মামলার দেশে জন্ম যেন মামলা করেই মরি।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

---

(২) যাহাকে টাকার গাছ বলে, বড় বড় কৌঁসুলী।
(৩) অর্থাৎ বসন্তের কোকিল—উকিল-মোক্তার।

নদীয়ায় কুরুক্ষেত্র।[১]

(ঐতিহাসিক গবেষণা)

(প্রতিভা, পৌষ ১৩২২)

'History...a process of ingenious guessing'.

GEORGE ELIOT.

বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত, কবি ও সাধক 'পণ্ডিতের খনি' নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতিভালোকে নবদ্বীপ 'ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ' বলিয়া কীর্ত্তিত। আবার শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের উদয়ে 'সপ্তদ্বীপমধ্যে সার নবদ্বীপধাম।' ৺ দীনবন্ধু মিত্র উচ্ছ্বাস-ভরে গায়িয়াছেন, 'সুবিখ্যাত নবদ্বীপ কত মহাজনে। যাদের সুকীর্ত্তি শোভে ভারতীভবনে।' নবদ্বীপের এই গৌরব-ভাস্কর সমগ্র নদীয়া জেলাকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও অনেক নদীয়াবাসীর মনস্তৃপ্তি হয় না,—মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি। তাই দেশপ্রীতির আতি-শয্যে কেহ বা নবদ্বীপকে কালিদাসের জন্মভূমি ও সাধনাক্ষেত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া নদীয়ার প্রাচীনত্ব-সংস্থাপনে উদ্‌যোগী, কেহ বা বল্লালসেনের জয়স্কন্ধাবার বিক্রমপুরকে নদীয়া জেলার একখানি ক্ষুদ্র নগণ্য গ্রামের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া নদীয়া জেলার লুপ্তগৌরব-উদ্ধারে বদ্ধপরিকর। কিন্তু বল্লালসেনের কাল বা বিক্রমাদিত্যের কাল প্রাচীন কাল হইলেও, অতিপ্রাচীন কাল নহে। অতএব প্রকৃতপক্ষে নদীয়ার গৌরবজ্ঞাপন ও প্রাচীনত্বখ্যাপন করিতে হইলে, আরও সুদূর অতীতের ইতিহাস উদ্ঘাটন করিতে হয়। আজকাল রাঢ়, বরেন্দ্র, পূর্ব্ববঙ্গ, কামরূপ, সর্ব্বত্র প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ধারকল্পে অনুসন্ধান-সমিতি বসিয়াছে, চারিদিকে

---

(১) রাসপূর্ণিমায় দীনধামে পূর্ণিমামিলনে পঠিত (৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩২২)।

গভীর গবেষণার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নদীয়া 'শুধুই ঘুমায়ে রয়'। এই ক্ষোভে নদীয়ার তরফ হইতে সামান্য একটু গবেষণার সূত্রপাত করিলাম। উপযুক্ত উৎসাহ ও অধিকতর অবসর পাইলে এবিষয়ে আরও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিব।

ভূগোলের হিসাবে ধরিতে গেলে, নবদ্বীপের গৌরবে সমগ্র নদীয়া জেলার গৌরব-বোধের তাদৃশ প্রবল কারণ নাই, কেন না অধুনা নবদ্বীপ গঙ্গার ওপারে—সুতরাং রাঢ়ে। ক্ষুদ্র গ্রাম বিক্রমপুরের নবোদ্ভাবিত গৌরবেও নদীয়া জেলার গৌরব-বৃদ্ধি হয় না, কেন না গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বল্লালের আমলে এই স্থান গঙ্গার ওপারে, অর্থাৎ রাঢ়ে অবস্থিত ছিল। অতএব প্রকৃতপক্ষে নদীয়া জেলার প্রাচীন গৌরব ঘোষণা করিতে হইলে, বেশ একটু সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। যে সকল অংশ রাঢ়ের সীমানা হইতে সুদূরে সংস্থিত, পরন্তু যে সকল অংশের মুর্শীদাবাদ, চব্বিশ-পরগণা, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার তৌজিভুক্ত হইবারও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, সেই সকল অংশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিতে হইবে।

আমি নদীয়া জেলার লোক, সুতরাং নদীয়া জেলার গৌরব-বর্দ্ধন ও প্রাচীনত্ব-প্রকটনের জন্য সমুৎসুক। তজ্জন্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক মস্তিষ্কচালনা করিয়া, বিস্তর গবেষণা করিয়া, নদীয়া জেলার প্রাচীন গৌরবের প্রকৃত কেন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছি। এই গৌরব একেবারে মৌরূসী-স্বত্বে নদীয়াবাসীরা ভোগ করিতে পারিবেন, কস্মিন্কালে খারিজ হইবার আশঙ্কা নাই। কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন যে, আমি নিজের বাসগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানের মাহাত্ম্যখ্যাপন করিতে বসিয়াছি। কিন্তু সে সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি যে, এই জেলার প্রকৃত প্রাচীন-গৌরবকেন্দ্র

আমার বাসগ্রাম হইতে দূরে অবস্থিত, অধিকন্তু মধ্যে একাধিক নদীর ব্যবধান। অতএব আমার এই সিদ্ধান্ত স্বার্থ-প্রণোদিত বা পক্ষপাতদোষদুষ্ট নহে। ঐতিহাসিক তত্ত্বপ্রকটনে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা অবশ্যকর্ত্তব্য, গত সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাসশাখার সভাপতি মহাশয়ের প্রকটিত এই মূলসূত্র মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হই নাই।

'নদীয়ায় কুরুক্ষেত্র' এই শব্দদ্বয় উচ্চারিত হইবামাত্র হয়ত অনেকে মনে করিবেন যে, নদীয়ায় সোণার গৌরাঙ্গ 'কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া আকুল ক্রন্দন করিয়া যে হুলস্থূল কাণ্ড বাধাইয়াছিলেন—যাহাতে রক্তের স্রোত বহে নাই, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা বাজে নাই, কেবল প্রেমভক্তির নয়নাসার বহিয়াছিল, আর হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোল উঠিয়াছিল, আমি বুঝি ভাষার কৌশলে তাহাকেই 'কুরুক্ষেত্রকাণ্ড' বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছি। কিন্তু আমি সে প্রসঙ্গ তুলিতেছি না। আবার হয়ত অনেকে মনে করিবেন যে, বখ্‌তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপজয় অথবা ক্লাইভের পলাশীজয়কে আমি অতিশয়োক্তির আশ্রয় লইয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলিতেছি। কিন্তু ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। এ কার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র যখন চূড়ান্ত করিয়া কাব্যের মারফত করিয়া গিয়াছেন, তখন 'মদ্‌বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ' ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় না। পক্ষান্তরে, আমি বলিতে চাহি যে এই নদীয়া জেলা শুধু 'সপ্তদশ অশ্বারোহী'র সাহায্যে বখ্‌তিয়ারের কীর্ত্তিভূমি বা 'সংখ্যায় অল্প সৈনিকের দলে'র পৃষ্ঠপোষকতায় ক্লাইভের কীর্ত্তিভূমি নহে—ইহা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর রণতাণ্ডবেরও রঙ্গভূমি অর্থাৎ মহাভারত-বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধেরও ঘটনাস্থল।(২) অতএব নদীয়ার প্রাচীনত্ব-গৌরব সুদূরকালব্যাপী।

---

(২) যেমন ট্রয়যুদ্ধের ঘটনাস্থল যে আধুনিক ফরাসী দেশ—ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসের নামে প্যারিস-সহরের নামকরণেই তাহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে।

এই অভিনব প্রাচীন-গৌরবের আবিষ্কারে আমার একমাত্র সহায়—ভাষাতত্ত্ব। আজকাল অনেকে খন্তা কোদাল লইয়া মাটী খুঁড়িয়া শিলা-লিপি তাম্রশাসন খুঁজিয়া প্রত্নতত্ত্ব বাহির ও জাহির করিতেছেন, কিন্তু আমি পূর্ব্বাহ্নেই খোলসা বলিতেছি যে, ও সব কায সদ্‌ব্রাহ্মণের করণীয় নহে। কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, আমাদের বিদ্যা—শস্ত্রঞ্চ নহে, শাস্ত্রঞ্চ। তাই ছুরি দিয়া কখন আম কাটি নাই (প্রকৃতিদত্ত অস্ত্র দন্ত দ্বারা ছাড়াইয়াছি), নিজের কাপড় নিজে সেলাই করিতে, নিজের দাড়ি নিজে কামাইতে, দর্জ্জির মত ছুঁচ বা নাপিতের মত ক্ষুর কখনও ধরি নাই; আয়স-অস্ত্রের মধ্যে কেবল ষ্টীল পেন ও আলপিন ব্যবহার করি; কিন্তু একদিন পিন দিয়া কাগজ আঁটিতে পিন ফুটিয়া অঙ্গুলিতে রক্তপাত হইয়াছিল, সেই অবধি কলমে নিব পরাইতে বা কাগজে পিন লাগাইতে অন্য লোক ডাকি, কদাচ স্বহস্তে স্পর্শ করি না। তাই বলিতেছি, মজুরের মত মাটি কাটিয়া কোহিনূর পর্য্যন্ত লাভ করিতে চাহি না, শিলালিপি তাম্রশাসন ত দূরের কথা। এক কোদাল মাটিও কাটিব না, অথচ প্রত্ন-তত্ত্বের উদ্ধার হইবে—যেমন গঙ্গার জল গঙ্গায়ই থাকে অথচ পিতৃপুরুষের উদ্ধার হয়! সেরেফ ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে যদি আর্য্যদিগের আদিবাসস্থান সম্বন্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ ও ভারী ভারী কেতাব লেখা হইতে পারে, তবে এ ক্ষেত্রেই বা না হইবে কেন? ভূতত্ত্বে জীবাশ্ম ও জীবকঙ্কালের ন্যায় ভাষাতত্ত্বেও শব্দকঙ্কাল অতীতের সাক্ষ্যদান করে। তবে চক্ষুষ্মান্‌ই কেবল তাহা দেখিতে পায়—যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, কুরুক্ষেত্র-নামক একটি স্থান উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে আছে বটে। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। তেমন ত বিক্রমপুর একটা প্রকাণ্ড পরগণা পূর্ব্ববঙ্গে রহিয়াছে, তথাপি নদীয়া জেলার একটী ক্ষুদ্র গ্রাম তাহার গৌরব হরণ করিতে বসিয়াছে। আসল কথা,

এক সময়ে—সম্ভবতঃ বৌদ্ধপ্রভাববিধ্বংসী শঙ্করাচার্য্যের সময়ে—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সমস্ত তীর্থস্থান এককেন্দ্রীকরণের প্রবল চেষ্টা হয়, তাহারই ফলে কাশীধামে কেদার-কামাখ্যা-জগন্নাথ-বৈদ্যনাথের আবির্ভাব। ইহারই জের—মোগল-রাজধানী দিল্লীর নিকট কুরুক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা। আসল কুরুক্ষেত্র নদীয়া জেলায়। ক্রমে সে কথা বলিতেছি।

আসল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে বাঙ্গালা মুল্লুকে হইয়াছিল, তাহার বহু প্রমাণ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে সঞ্চিত রহিয়াছে, (৩) প্রণিধান করিয়া দেখিলেই ধরা পড়ে। 'কেঁদে কুরুক্ষেত্র', 'কুরুক্ষেত্র কাণ্ড' প্রভৃতি চলিত কথা বাঙ্গালা ভাষায় আসিল কি করিয়া, ইহা কি কখন কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? শুধু তাহা কেন, মহাভারতোক্ত বহু ঘটনা বা বিষয়ের স্মারক শব্দ ও শব্দসজ্ঘ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত রহিয়াছে। যথা 'কীচকবধ', 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'সপ্তরথীতে ঘেরা,' 'বিদুরের ক্ষুদ', 'পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ', ইত্যাদি। মহাভারতে উল্লিখিত বহু ব্যক্তির নামে আজিও বাঙ্গালীর নামকরণ হয়। যথা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, সাত্যকি ইত্যাদি। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মহাভারতের আমল হইতে একটা ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা বাঙ্গালাদেশে সুরক্ষিত আছে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য যেরূপ প্রাচীন আজকাল গবেষণা দ্বারা সাব্যস্থ হইতেছে, তাহাতে এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে যে, মূল মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায়ই রচিত হইয়াছিল,(৪)

---

(৩) যেমন কালিদাসের বহু স্মৃতি বাঙ্গালা ভাষায় জড়িত রহিয়াছে। যথা, 'কহে কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।' অধুনাও একজন তরুণ বাঙ্গালী কবি ঐ নামে পরিচিত।

(৪) এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ নিম্নলিখিত বেদবাক্য (সাহেবের উক্তি) উদ্ধৃত করিতেছি। "In the opinion of some

পরে তাহা পশ্চিমের পণ্ডিতসংসদ্ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া অধম-তারণ বেদব্যাসের নামে চালান; কাশীদাসী মহাভারত সেই মূল বাঙ্গালা মহাভারতের পুনঃ-সংস্কারের ফল এবং কালীসিংহ প্রভৃতি, ধরিতে গেলে, অনুবাদের অনুবাদ করিয়াছেন। এইটুকু দেখুন, 'মহাভারত' বাঙ্গালা দেশের এমন নিজস্ব জিনিশ যে, আমরা স্থানে অস্থানে শব্দটি উচ্চারণ করি। ভারতের অন্য কোন প্রদেশের লোক এরূপ করে কি? আবার দেখুন, 'মহাভারতের কথা অমৃত-সমান' আমাদের এমন মজ্জাগত হইয়াছে যে, এই ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুসরণের মরসুমেও মহাভারত-অবলম্বনে বহু কাব্য নাটক প্রবন্ধ আখ্যায়িকা শিশুপাঠ্য ও স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতেছে; অন্য পরে কা কথা, প্রতিভাশালী মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত এই পথের পথিক,—প্রমাণ 'শর্ম্মিষ্ঠা' 'কুরুক্ষেত্র' 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'ভীষ্ম'। যাহা হউক, সাহিত্যের ধারা আবিষ্কারের চেষ্টা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া ভাষাতত্ত্বের উপরই ভরাভর করি।

এক্ষণে নদীয়া জেলার কতকগুলি স্থানের নাম লইয়া গবেষণা করিলে এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনেকটা কিনারা হইবে। যাঁহারা তথাকথিত পূর্ব্ববঙ্গ (৫) রেলপথে যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা চাকদহ,

---

scholars, this poem (as well as the Ramayana) may even have been originally composed in some popular dialect which would certainly best account for the irregular and apparently prakritic or dialectic forms in which these works abound."—Ency. Brit. 11th Ed. vol. 24 Art. Sanskrit p. 169.

(৫) কলিকাতা হইতে কাঁচরাপাড়া পর্য্যন্ত ২৪ পরগণা, ও কাঁচরাপাড়া ছাড়াইয়া দামুকদিয়া ঘাট পর্য্যন্ত নদীয়া জেলা, অথচ লাইনের নাম পূর্ব্ববঙ্গ। জানি না, ভবিষ্যতে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়া বসিবেন কিনা, রেলস্থাপনার সময়ে এসকল স্থান পূর্ব্ববঙ্গে ছিল, পদ্মার গতিপরিবর্ত্তনে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে!

রাণাঘাট, বগুলা, জয়রামপুর, প্রভৃতি ষ্টেশনের নামের সহিত পরিচিত। আবার নারায়ণপুর, মাঝদিয়া, কুড়ুলগাছি, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম এইসকল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। ইহা ছাড়া শান্তিপুর, বীরনগর, কৃষ্ণ-নগর, স্বরূপগঞ্জ, প্রভৃতি স্থানের নামও অনেকের সুপরিচিত। প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মহাভারতের কাল হইতে ভাষার ক্রমিক বিবর্ত্তন-পরিবর্ত্তনে নদীয়া জেলায় অবস্থিত এই সকল স্থানের নামগুলি বিকৃত হইলেও, ইহারা আজও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও মহাভারত-বর্ণিত অন্যান্য ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন অঙ্গে বহন করিতেছে।

(১) প্রথমে নদীয়া নামটাই ধরুন না কেন? বহু তথ্যভাণ্ডার "নদীয়াকাহিনী" নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কেহ নয়টি দীপ অর্থাৎ প্রদীপ, কেহ নয়টী দ্বীপ, কেহ নূতন দ্বীপ ইত্যাদি রূপে নামটির ব্যাখ্যা করেন। 'নদীবহুল' বলিয়া নদীয়া জেলার এইরূপ নাম এই মতবাদও শুনিয়াছি। বাস্তবিক কিন্তু মূল নাম 'নদী আয়া!' অর্জ্জুন ভীষ্মকে গঙ্গাজল পান করাইবার জন্য যখন ভূমিতে শরপ্রয়োগে পাতাল-গঙ্গা ভোগবতীর ধারা প্রবাহিত করান, তখন তদ্দর্শনে সকলে সবিস্ময়ে হিন্দীতে বলিয়া উঠেন 'নদী আয়া'! বিস্ময় প্রভৃতির প্রভাবে হিন্দী বাৎ বাহির হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, ইহা বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন। দর্পণকারও বলিয়াছেন, 'বিষাদে বিস্ময়ে ক্রোধে হিন্দিরুক্তির্ন দুষ্যতি!' [পাতালে চন্দ্রের অদর্শনে ভোগবতীর জলে জোয়ারভাটা হয় না; তজ্জন্য নবদ্বীপতলবাহিনী গঙ্গায় জোয়ারভাটা নাই।]

(২) এইরূপ, স্বরূপগঞ্জ বিশ্বরূপগঞ্জের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। অর্থাৎ এইস্থানে ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বীয় বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। 'অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্র' অনন্তরূপ বহুদূর ব্যাপিয়াছিল, সুতরাং রণক্ষেত্র হইতে কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্বরূপগঞ্জ পর্য্যন্ত বিরাট্ পুরুষের দেহ স্পর্শ

করিয়াছিল, ইহা বিচিত্র নহে। অজ্ঞলোকে আদিস্থিত 'বি' উপসর্গ বিবেচনায় বর্জ্জন করে। 'শ্ব-রূপ' লিখিলে কদর্থ হইয়া পড়িবে আশঙ্কায় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ বেগতিক বুঝিয়া দন্ত্য 'স' দিয়া বাণান প্রবর্ত্তন করেন। এই স্থানের পবিত্রতা স্মরণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'স্বরূপগঙ্গস্য দক্ষিণে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ' বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

(৩) শান্তিপুরের মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের সহিত নিবিড় সম্পর্ক কি আর বুঝাইতে হইবে? নতুবা ঘোর কলিকালেও কি এই পুণ্যভূমিতে নদীয়ার নিমাইএর শুভাগমন হয় এবং ভীষ্মের তুল্য জ্ঞানী ও পূতচরিত্র অদ্বৈতাচার্য্য ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম হয়?

(৪) চাকদহ=চক্রহ্রদ। এইখানে কর্ণের রথচক্র বসিয়া যায়। হ্রদ প্রাকৃত উচ্চারণে হদ ও পরে (metathesis) বর্ণবিপর্য্যাসের নিয়মে হদ=দহ হইয়াছে, যেমন সংস্কৃতভাষায় হিন্‌স্ ধাতু হইতে সিংহ ও খন্ ধাতু হইতে নখ! এবং বাঙ্গালায় বাসাত, বাসাতা, বাস্ক, ডেস্ক প্রভৃতি উচ্চারণ।

(৫) রাণাঘাট=রণঘট। এইখানে ঘটোৎকচের রণাঙ্গন। বাঙ্গালায় অকার অনেক স্থানে আকার হইয়া যায়, যথা অমাবস্যার সাধারণ উচ্চারণ আমাবস্যা। সম্ভবতঃ, আড়ংঘাটারও হিড়িম্ব-হিড়িম্বার সহিত ঐতিহাসিক সংযোগ আছে।

(৬) বগুলা। ইহার সংস্কৃত আকার বক-কুল্যা। সংস্কৃতজ্ঞ-মাত্রেই 'কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরিৎ' ইত্যমরবচন জানেন। বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই কুল্যা বা জলাশয়ে বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরাদিকে নানা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উক্ত সরিৎ আজও এখান হইতে লোপ পায় নাই, বগুলার অদূরে হাঁসখালিতে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সম্ভবতঃ, এখানে তখনও এখনকার মত বহু হংস বিচরণ করিত, বকরূপী ধর্ম্ম

তন্মধ্যে 'হংসমধ্যে বকো যথা' হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন। 'বক' বাঙ্গালা উচ্চারণে 'বগ' হইয়া যায়, তাহা এই নবান্নের সময় 'কাগারে বগারে নবান্ন খারে' বলিলেই ধরা পড়িবে, শাগের ক্ষেত আর দেখাইবার দরকার নাই।

(৭) নারায়ণপুর। এইখানে নারায়ণী সেনার সমাবেশ হইয়াছিল।

(৮) কৃষ্ণগঞ্জ। এইখানে শ্রীকৃষ্ণের তাম্বু বা পটমণ্ডপ অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ, কৃষ্ণনগরে (হিন্দী কিষণগড়ে) শ্রীকৃষ্ণ গড়খাই করিয়াছিলেন। আধুনিক কালের নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের নামে ইহার নামকরণ হয় নাই। ইহা বর্দ্ধমানের ন্যায় অতি প্রাচীন সহর।

(৯) বীরনগর। এইখানে কুরুক্ষেত্র-সমরের বাছা বাছা বীর বা মল্লগণ কুচকাওয়াজ করিতেন। সম্প্রতি কিছুকাল হইতে এই স্থান জ্বরে উৎসন্নপ্রায়; এইজন্য উক্ত জ্বরের নাম ম্যালেরিয়া=মল্ল+অরি। এই স্থানের জলহাওয়ার গুণে চুঁচুড়ার সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বালককালে অমিতবলে মুষ্ট্যাঘাতে বাক্স ভাঙ্গিয়াছিলেন। এখনও সেই 'ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' পুরুষ 'মরা হাতী লাখ টাকা' প্রবাদবাক্য স্মরণ করাইয়া দেন।

নদীয়া জেলায় জলাঙ্গীর তীরবর্ত্তী বীরপুর গ্রামেও এই বীরগণের আর একটি বারিক ছিল। তাই সেখানকার মাটীর গুণে সেদিনও কয়েকজন যুবক অদ্ভুত বীরপনার পরিচয় দিয়াছে। এমনি স্থানমাহাত্ম্য!

(১০) মাঝদিয়া। এই গ্রামটি কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্য-সংস্থানের ঠিক মাঝামাঝি স্থান ছিল। এইখানে 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' (গীতার ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের রথ রক্ষিত হইয়াছিল। লর্ড কর্জ্জনের আমলে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইলে এখানে একখানি স্মৃতিফলক বসাইবার ব্যবস্থা হইত।

(১১) **জয়রামপুর।** এই গ্রামের নামে একটি বিষম গলদ আছে। ইহার প্রকৃত নাম জয়দ্রথপুর, লিপিকরপ্রমাদে জয়রামপুর হইয়াছে, যথা সিঙ্গিগ্রাম বনাম সিদ্ধিগ্রাম। দ্রৌপদীহরণ-প্রয়াসী, শত্রুর ব্যূহমধ্যগত বালক-অভিমন্যুর সাহায্যার্থিগণের নিবারণকারী, শ্যালকের আজ্ঞাকারী প্রতিপাল্য পাষণ্ড জয়দ্রথের নামে এই গ্রামের নাম বলিয়াই ইহার নাম লইলে সেদিন অন্ন হয় না, এইরূপ অখ্যাতি আছে। নতুবা যে 'রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে', সেই রামনাম ভক্ত ও ভোক্তা হনুমানের মুখে 'জয়রামে' রূপান্তরিত হইয়া ভোজন-ব্যাঘাত ঘটাইবে, ইহা অবিশ্বাস্য। আর তাহা যদি হইত, তবে অদূরবর্ত্তী রামনগরের নামেই বা সে ব্যাঘাত হয় না কেন? ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্।

(১২) কুড়ুলগাছি। ইউক্লিডের দ্বাদশ স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় এই দ্বাদশ গৌরবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রামেই প্রাচীন কুরুক্ষেত্র, বা অসমস্ত-ভাবে কুরুর ক্ষেত্র। পরে প্রথম র=ড় হইয়া (যথা মরা=মড়া, পার=পাড়) ও দ্বিতীয় র=ল হইয়া (যথা প্রাচীর=পাঁচীল, রলয়োরৈক্যম্) কুরুর=কুড়ুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে (ইহা কঠোর কুঠারের অপভ্রংশ নহে)। যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্তিকায় বহু রক্তপাত হওয়ায় ও বহু মৃতদেহ প্রোথিত থাকায়, উহা কালক্রমে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়; এই সমস্ত উর্ব্বরা ভূমিতে বহু বৃক্ষের উদ্ভব হওয়াতে 'ক্ষেত্র' 'গাছি'তে পরিণত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্তও এই অঞ্চলে আম-কাঁঠালের আওলাত যথেষ্ট। অতএব ভাষাতত্ত্বের অভ্রান্ত সাক্ষ্যে সপ্রমাণ হইল যে, আধুনিক কুড়ুলগাছিই প্রাচীন কুরুক্ষেত্র। Q. E. D.

* * * * *

* * * *

* * *

ইংরেজীতে Words and Places নামে একখানি উপাদেয় পুস্তক আছে; তাহাতে গ্রন্থকার গ্রাম-নগর প্রভৃতির নাম হইতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কাশিত করিয়াছেন। আমাদের ভাষায় অদ্যাপি এরূপ পুস্তক প্রণীত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ বিষয়ে সামান্য একটু চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে উক্ত প্রণালীর প্রথম চেষ্টা বলিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি একটু অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিবেন, সুধীবর্গের নিকট আমার এইমাত্র বিনীত প্রার্থনা। (৬)

---

(৬) ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী প্রধান শিক্ষক আমার পরমাত্মীয় ৺ দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকটিত তথ্যের আবিষ্কর্ত্তা। তিনি ইহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া অকালে পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার খাঁটি সোণায় কিঞ্চিৎ পাইন ও রসান দিয়া সাহিত্যের প্রদর্শনীতে দাখিল করিলাম।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য।

(নক্সা)

(ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩২৩)

'গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।'

'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।'

'A little learning is a dangerous thing.'

গৌরচন্দ্রিকা

পরের জিনিশ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া ফেলিয়াছি(১) অথচ ঘরের জিনিশ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ঐরূপ একটা ইতিহাস লিখিতে পারিলাম না, এ জন্য বন্ধুরা প্রায়ই খোঁটা দেন। আমরা যে অনেকেই "ঘর করেছি বাহির, বাহির করেছি ঘর;" সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি? ইংরেজী পঠিত বিদ্যা, সংস্কৃত অপঠিত বিদ্যা। তবে ভরসা এই যে, পণ্ডিত-বংশে জন্মবশতঃ (অপঠিত হইলেও) সংস্কৃত ভাষায় উত্তরাধিকারসূত্রে 'অশিক্ষিত-পটুত্ব' জন্মিয়াছে, অর্থাৎ 'না-পড়ে'-পণ্ডিত' হইয়া পড়িয়াছি। আজকাল প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণার ক্ষেত্রে, বর্ত্তমান লেখকের ন্যায় 'না-পড়ে'-পণ্ডিতে'র সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। অতএব অকুতোভয়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার ও উদ্ভাবন

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যে একটা প্রকাণ্ড জাল (forgery), আগাগোড়া কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণদিগের বানানো ঝুটা জিনিশ, তাহা অশেষ-

---

(১) প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৬। 'ফোয়ারা'য় পুনর্মুদ্রিত।

শেমুষী-সম্পন্ন দার্শনিক ডিউগ্যাল্ড্ ষ্টুয়ার্ট ইউরোপে এই ভাষার আবিষ্কারের সমকালেই হাতে হাতে ধরাইয়া দেন।(২) জালীয়াতী-জুয়াচুরি ব্যাপারে যে আমাদের দেশের লোক সিদ্ধহস্ত, তাহা মেকলে সাহেবের(৩) প্রসাদে সকলেই অবগত আছেন। চাণক্য হইতে আশুতোষ পর্য্যন্ত জম্বুদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ যে কুশাগ্রীয়ধী এবং আফলোদয়কর্ম্মা, অর্থাৎ একটি কায আরম্ভ করিলে শেষ না দেখিয়া ছাড়েন না, তাহাও আমরা চক্ষের উপর দেখিতেছি। সুতরাং ব্রাহ্মণ-জাতির ষড়যন্ত্রে এরূপ একটা কটমট কৃত্রিম ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভাবন কোন প্রকারেই অসম্ভাব্য বা অবিশ্বাস্য ব্যাপার নহে। কিন্তু জালীয়াতী কাণ্ড জানিয়াও যে অদ্যাপি ইউরোপীয়গণ এই অর্ব্বাচীন ভাষার আলোচনা করিতে বিরত হয়েন নাই, তাহার কারণ—তাঁহারা একবার যাহা ধরেন, তাহা ভুলই হউক আর ঠিকই হউক, কিছুতেই ছাড়েন না—Settled fact বলিয়া মানিয়া লয়েন, এটি তাঁহাদিগের জাতীয় প্রকৃতি।

সংস্কৃতভাষাসৃষ্টিতে যে ব্রাহ্মণজাতির অসদভিপ্রায় (criminal intention) ছিল, তাহার কয়েকটি প্রমাণ একটু প্রণিধান করিলেই লক্ষ্য হয়।

[/০] হিন্দুরা উত্তমর্ণকে ফাঁকী দিবার মতলবে সম্পত্তি 'দেবোত্তর' (দেবত্রা) করে, ইহা আপামর-সাধারণে বিদিত আছেন। এই প্রকার

(২) Dugald Stewart, the philosopher, wrote an essay to prove that not only Sanskrit literature but also the Sanskrit language was a forgery made by the crafty Brahmans.—MACDONELL: History of Sanskrit Literature, *Introductory.*

(৩) Chicanery, perjury, forgery are the weapons, offensive and defensive, of the people of the Lower Ganges.—MACAULAY: *Essay on Warren Hastings.*

কু-অভিসন্ধিতেই ইঁহারা ভাষাটাকে দেবভাষা বলিয়া রাখিয়াছেন,—তাহা হইলে আর এই নবসৃষ্ট ভাষার সম্পর্কে অন্য ভাষার নিকট ঋণ স্বীকার করিতে হইবে না। তথাপি দুই-একজন গৃহশত্রু বিভীষণ—পিক, তামরস প্রভৃতি শব্দ ম্লেচ্ছ ভাষা হইতে ঋণরূপে গৃহীত, এই ঘরের কথা বাহির করিয়া দিয়াছেন!

(৵০) বেনামীতে সম্পত্তিরক্ষাও হিন্দুদিগের আর একটি জুয়াচুরি বুদ্ধি। সংস্কৃত-ভাষায়ও এই ফন্দী খাটাইয়া বহু ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ একজনের নামে চালান হইয়াছে। যথা—পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ, বেদান্তসূত্র, পাতঞ্জল-দর্শনের টীকা, সমস্তই বেদব্যাসের রচিত! এমন কি, বেদ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্কলিত। পতঞ্জলি দর্শন-ব্যাকরণ-বৈদ্যকশাস্ত্র—ত্রিবিধ বিষয়েই গ্রন্থরচনা করিয়াছেন! কালিদাস একাধারে কবি, নাটককার, ছন্দঃশাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিদ্! দণ্ডী—কাব্য ও অলঙ্কার উভয় বিভাগেই গ্রন্থরচনা করিয়াছেন! অথচ তিনি দণ্ডী সন্ন্যাসী! এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যেন গুরুঠাকুরের নামে বিষয় বেনামী করার মত। এই বেনামীর চূড়ান্ত কাণ্ড মৃচ্ছকটিকের বেলায় দেখা যায়। মৃচ্ছকটিক রাজা শূদ্রকের বেনামীতে চালান হয়, অথচ শূদ্রক দশদিনাধিক শতবর্ষ বাঁচিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিলেন—এ কথাও স্পষ্ট করিয়া গ্রন্থারম্ভে বলা আছে! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

(৶০) পাছে লোকে সহজে তাঁহাদিগের মতলব বুঝিতে পারে, এই জন্য কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ সুপ্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষর ছাড়িয়া এমন কাঁকড়া অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা যাহার-তাহার পক্ষে দন্তস্ফুট করিবার যো নাই। সুতরাং গোঁজামিল দিবার এমন অপূর্ব্ব সুযোগ অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ বাণান ভুল সামলাইবার জন্য দুষ্টামি করিয়া সন্দিগ্ধ অক্ষরগুলি অস্পষ্ট করিয়া লেখে বটে, কিন্তু ইহা

তদপেক্ষাও গর্হিত ব্যাপার। এই কৌশলে দুরাত্মা ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্রে 'অগ্রে' পাঠে 'অগ্নে' ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়া বিধবাদিগকে স্বামীর চিতায় পোড়াইয়া তাহাদিগের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিত। ধর্ম্মের নামে কি ঘোরতর প্রবঞ্চনা! শেষে সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই নৃশংস প্রথা রহিত করেন।

বেদ

যাহা হউক, ব্রাহ্মণেরা অনেক জাল-জুয়াচুরি কাণ্ড করিলেও এই উদ্ভট ভাষার উদ্ভাবয়িতা বলিয়া সম্পূর্ণ প্রশংসা (credit) পাইতে পারেন না। ভাষাটা মূলে বেদিয়াদিগের সৃষ্টি। ইহার প্রমাণ, এই ভাষার আদিগ্রন্থের নাম 'বেদ'। বেদের ভাষা বড় কাঁচা, কেন না অল্পবুদ্ধি বেদিয়ারা পাকা জালিয়াত ছিল না। পরে কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ কৌশলে ভাষাটি আত্মসাৎ করিয়া ইহাকে বেশ পাকাইয়া তোলেন, এবং বেদের আদিম অংশের সহিত তাঁহাদিগের রচনা যুড়িয়া দেন। বেদব্যাস(৪) উভয় অংশ পৃথক্ করিয়া সাজাইয়া বেদিয়াদিগের রচিত অংশের নাম দিলেন 'মন্ত্র' এবং ব্রাহ্মণদিগের রচিত অংশের নাম দিলেন 'ব্রাহ্মণ'। ব্রাহ্মণেরা বেদিয়াদিগের হাত হইতে ভাষাটা শোধন করিয়া লইলে, ইহার নাম হইল, 'সংস্কৃতভাষা' বা সংক্ষেপে 'ভাষা'।

বেদিয়াদিগের রচিত 'মন্ত্র' অংশ সাপের মন্তর। ইহা সুর করিয়া পঠিত হইত। ইহা ছন্দে রচিত, তজ্জন্য বেদের ভাষার নাম 'ছন্দঃ'। এই সকল সাপের মন্তরের কোন অর্থ নাই; যাঁহারা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি-

(৪) এই বেদব্যাস আধা ব্রাহ্মণ, আধা বেদিয়া ছিলেন; অর্থাৎ তিনি পুরাপুরি আর্য্যরক্তসম্ভূত ছিলেন না। তাঁহার জন্ম-বৃত্তান্তে এই রহস্য উদ্ভাসিত। সুতরাং তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অপক্ষপাত দেখাইতে পারিয়াছিলেন।

ব্যাপারে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা ভালরূপেই জানেন। ইহা কেবল শুনিতে ও শুনাইতে হয়, তজ্জন্য ইহার আর এক নাম 'শ্রুতি'। কোন-কোন মহাপণ্ডিত বলেন, বেদ চাষার গান। কিন্তু এ কোন কাযের কথা নহে। চাষার গান হইলে ইহাতে স্পষ্টতা অর্থাৎ প্রসাদগুণ থাকিত, সহজে অর্থগ্রহ হইত, রবিবাবুর কবিতার মত হেঁয়ালি হইত না। এই অর্থাভাব হইতে বুঝা যায় যে, বেদ চাষার গান নহে, সাপের মন্তর।

ইংরেজী সভ্যতার আলোক এ দেশে বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে লোকে বনে-জঙ্গলে বাস করিত। ইহার বহু প্রমাণ বৃহদারণ্যকে, রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে, মহাভারতের বনপর্ব্বে, কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রথম সর্গে এবং অমরকোষের বনৌষধিবর্গে সঞ্চিত রহিয়াছে। আশা করি, রাধাকুমুদ বাবুর ন্যায় কোন প্রত্নতাত্ত্বিক এই সকল মালমশলার সদ্‌ব্যবহার করিবেন। বেদের কাণ্ড, শাখা, প্রাতিশাখ্য প্রভৃতি শব্দ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, বিলাতী সভ্যতা আমদানী হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ শাখামৃগের ন্যায় বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা প্রভৃতিতে বাস করিতেন। এ সম্বন্ধে খুব বাঁধাবাঁধি ছিল, কেহ নিজের শাখা ছাড়িয়া অন্য শাখায় আরোহণ করিলে তাহা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। অত্র প্রমাণং যথা—স্বশাখাশ্রয়মুৎসৃজ্য পরশাখাশ্রয়ং তু যঃ। কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্মেধা মোঘং তস্য চ যৎকৃতং॥ যাহারা অধিকতর বুদ্ধিমান্, তাহারা জঙ্গলের মধ্যেই এক-একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া কুটীর বাঁধিয়া বাস করিত ; বেদের অন্তর্গত গৃহ্যসূত্রগুলি তাহাদিগের রচিত।

অরণ্যবাসকালে সর্পভীতি স্বাভাবিক। এই ভয়ে ভীত হইয়া ব্রাহ্মণগণ সাপুড়িয়া বেদিয়াদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণগণ গৃহহীন অর্থাৎ ভবঘুরে বেদিয়াদিগের কুঁড়েঘর তুলিয়া দিবেন, বেদিয়ারাও মন্ত্রের

চোটে সাপ মারিবে, এইরূপ 'রামসুগ্রীবয়োরিব' মিলন হইল। ইহারই ফলে বেদমন্ত্রের প্রচার। এই সর্পবিদ্যাই যে আসল বেদ, এ কথা বেদের বহু স্থলে স্পষ্ট লেখা আছে। 'The Sarpavidya is the Veda'. (MAX MULLER: History of Ancient Sanskrit Literature, *Introduction.*)

বেদিয়াদিগের মন্ত্রবলেই হউক, আর হাত-সাফাইএর গুণেই হউক, বহু বিষধর সর্প ধৃত ও হত হইয়াছিল। কিন্তু সাপ মরিলেও বাতাস পাইয়া বাঁচিয়া উঠে, সুতরাং জড় মারিবার জন্য আগুনে পোড়াইতে হয়। এই অগ্নিসংস্কারের প্রয়োজনে বেদবিহিত হোম, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়া-কাণ্ডের আয়োজন হইয়াছিল। সর্পজাতির অগ্নিসংস্কারের একটা মোটা-মুটি ইতিহাস 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। কিন্তু এই ইতিহাস বিকৃত আকারে লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় অপক্ষপাতী বেদব্যাসের রচনার উপর কলম চালাইয়া ব্রাহ্মণেরা ইহাতে নিজেদের মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছেন, এবং বেদিয়াদিগের কৃতিত্ব-কথা একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের বহু স্থলে ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ কারসাজির পরিচয় পাওয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার সাহেবের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের অবতরণিকায় বিস্তারিত আলোচনা আছে।

উপনিষদ্ ও দর্শন

কালাপানির ওপার হইতে লালপানি আমদানি হইবার পূর্ব্বেও এ দেশের লোকের নেশা-করা অভ্যাস ছিল। তবে সে নেশা গাঁজা, চরস, ভাঙ্গ, আফিম প্রভৃতিতেই আবদ্ধ থাকিত, জলপথে চলিত না। নেশার চরম অবস্থায় যে লেখা বাহির হইত, তাহার নাম 'উপনিষদ্'।(৫) ইহাই

(৫) নেশার 'শ' ও উপনিষদের 'ষ' এক নহে বলিয়া সোরগোল করিবার

হইল পরা বিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই নেশা একবার অভ্যাস হইলে আর কিছুই ভাল লাগে না, পৃথিবীর আর সব বস্তু ভ্যালসা বলিয়া বোধ হয়, এবং সব ছাড়িয়া এই নেশার উপরই ঝোঁক পড়ে। এই জন্যই জার্ম্মানীর শোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন,—'It has been the solace of my life, it will be the solace of my death'. অস্যার্থঃ— 'ইহা আমার জীবনের সান্ত্বনা হইয়াছে, এবং মৃত্যুকালেও সান্ত্বনা হইবে।' ব্রাহ্মণগণ নেশায় যে আনন্দ উপভোগ করিতেন, সেই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন—'আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। রসো বৈ সঃ রসোঽহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' এই রসের জন্যই 'চরস' নামের উৎপত্তি; তুরিতানন্দ বা তুরীয়ানন্দের নামকরণও ইহার প্রসাদাৎ। আনন্দগিরি এই আনন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। উক্ত আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সাধুসন্ন্যাসিগণ গঞ্জিকা সেবন করেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, নেশার উপর টেক্স হওয়াতে এক্ষণে দেশে তত্ত্বচিন্তার অবনতি হইয়াছে ও হইতেছে। কেবল বহুমূত্রগ্রস্ত বৃদ্ধগণ কালাচাঁদের কৃপায় দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া আজও ভারতীয় তত্ত্বচিন্তাস্রোতঃ অব্যাহত রাখিয়াছেন, তাঁহারাই যাহা-কিছু ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করেন।

নেশার গোলাপী অবস্থায় সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি অনেকরূপ অন্যের অপ্রত্যক্ষ পদার্থ দেখা যায়; তদনুসারে উপনিষদের নামকরণ হইয়াছে— মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর ইত্যাদি। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানও এইরূপ নেশার ঝোঁকে হয়। এই সকল ভুল দেখা সম্বন্ধে যে শাস্ত্রে আলোচনা

প্রয়োজন নাই। শ ষ স বিভেদ পূর্ব্বে ছিল না। পরিষদের সংগৃহীত অমুদ্রিত পুস্তকাবলী দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনার পর খ্রীষ্টান পাদরী কে, এম, ব্যানার্জ্জি হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার জন্য পশ্চিম অঞ্চল হইতে পাণিনি আমদানি করিয়া এই সব উৎপাত ঘোটাইয়াছেন।

আছে, তাহাকে দর্শনশাস্ত্র বলে। মীমাংসাদর্শনে এই সকল ভুল দেখার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। কেহ-কেহ 'তৈলে ভাণ্ডমস্তি' কি 'ভাণ্ডে তৈলমস্তি' স্থির করিতে না পারিয়া নেশার ঝোঁকে ভাঁড় মাথায় ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করিয়াছেন। ইহাতে বহু পরিমাণ মধ্যমনারায়ণ প্রভৃতি কবিরাজী তৈল নষ্ট হওয়ায় 'হিন্দু-রসায়ন'-প্রণেতা সুধী ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার' সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন।

বীটনের অভিধানে 'গঙ্গেশ্বর ফতোয়াশ্চির্ত্তামর্ণি,' 'প্রতীক্ষা টীপ্পনী', 'অনুমাক দীধুতি' (a treatise on memory) এই তিনখানি দার্শনিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই অমূল্য গ্রন্থগুলির এ দেশে চল নাই। সম্ভবতঃ পুঁথিগুলি বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের মত কোন অধ্যবসায়শীল প্রত্নতাত্ত্বিক তথা হইতে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে পারেন না কি? মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় নেপাল-ভ্রমণকালে পুঁথি তিনখানির খোঁজ করিলে ভাল হয়। লঙ্কা, চীন বা তিব্বতের ভাষায় এগুলির অনুবাদ আছে কি না, তদ্‌বিষয়ে সন্ধান লইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করি।

কাব্য

আদিকাব্য—রামায়ণ

সংস্কৃতভাষায় বহু উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, তন্মধ্যে রামায়ণ সর্ব্বপ্রধান। বাল্মীকি আদিকবি অর্থাৎ আদিরসের কবি এবং রামায়ণ আদিকাব্য অর্থাৎ আদিরসের কাব্য। তবে 'লোক-রহস্যে' যে লিখিয়াছে, ইহাতে অল্পস্বল্প করুণরসও আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ফলতঃ

রামায়ণে আদি ও করুণরসে মিলিয়া রস-সঙ্করের উদ্ভব হইয়াছে; এই কারণে অনেকে ইহাকে 'কাব্য' না বলিয়া 'আখ্যান' বলেন। বীটনের অভিধানে অতি অল্প কথায় এই গ্রন্থের সারনিষ্কর্ষ করিয়া দিয়াছে। যথা—"Their oldest poet, Valmiki, sang in plaintive strains the murder of a youth who lived happily with his mistress in a beautiful wilderness and was mourned by her in heart-rending lamentations." এই প্রেমিক যুবক বালী কি সুগ্রীব, এবং যুবার প্রেয়সী তারা কি শূর্পনখা, ঠিক বুঝা গেল না। নিষাদবাণবিদ্ধ চক্রবাকের জন্য চক্রবাকীর খেদ কি এই আকার ধারণ করিয়াছে? জানি না, পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডের ধোপার হাতে ধোপদস্ত হইয়া সীতার কাহিনী বিলাতে এই আকারে পৌঁছিয়াছে কি না।

রামায়ণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, ইহাতে সুন্দরবনের চাষ আবাদ প্রভৃতির কথা বর্ণিত আছে, সুন্দরকাণ্ডে তাহার সবিশেষ তথ্য রহিয়াছে। রাম লাঙ্গলধারী চাষী ও সীতা লাঙ্গলের ফাল ভিন্ন আর কিছুই নহে।(৬) কেহ বলেন, ইহা গ্রীক হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসী হইতে চুরি-করা, হেলেন-হরণ ও ইউলিসিসের ধনুর্ভঙ্গের অনুকরণ ইহাতে জাজ্বল্যমান।(৭) কেহ বলেন, ইহা আগাগোড়া রূপক,(৮) সূর্য্য কর্ত্তৃক ধরার অন্ধকার-দূরীকরণের কথা, তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা। (বীর হনূমান্ সেই রাগে সূর্য্যকে বগলে পূরিয়াছিলেন।) এত সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এ সকল মতের বিচার করা চলে না। পাঠকবর্গকে একাদশ সংস্করণের এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিট্যানিকা এবং ম্যাক্‌ডনেলের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস দেখিতে অনুরোধ করি।

---

(৬) Lassen and Weber. (৭) Weber. (৮) Max Muller.

রামায়ণের নামকরণ সম্বন্ধেও বহু মতভেদ আছে। কেহ বলেন, রামের অয়ন অর্থাৎ বনগমন, রামবনবাস ইহার আসল আখ্যানবস্তু; সীতাহরণ, রাবণবধ, সীতার বনবাস প্রভৃতি সমস্ত প্রক্ষিপ্ত! কেহ বলেন, রামের কথা আছে এই অর্থে 'অয়ন' প্রত্যয়, যথা শিবায়ন, রসায়ন! 'লোক-রহস্যে'র লেখক—'রামা যবন' হইতে রামায়ণ হইয়াছে—এইরূপ রহস্যভেদ করিয়াছেন। কিন্তু এই শেষোক্ত মত বিচারসহ নহে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মুসলমানবিদ্বেষ ছিল না। স্বয়ং নবীনচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—

'যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতিহেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতাজিত বৈরিভাব'—ইত্যাদি।

সুতরাং মুসলমানদিগের সম্বন্ধে 'রামা' এবং 'যবন' এইরূপ অবজ্ঞা-সূচক পদপ্রয়োগ সম্ভবপর নহে। আমার মনে হয়, 'রামা' ও 'জন' এই দুই পদে 'শাকপাথিবাদিত্বাৎ সমাসঃ' হইয়া 'রামাজন' হইয়াছে; অর্থাৎ রামের স্ত্রী 'রামা' সম্বন্ধে যে সব জনপ্রবাদ রটিয়াছিল, পুস্তকে সেই সমস্ত বর্ণিত। জনপ্রবাদ নানারূপ, সুতরাং রামায়ণও নানারূপ,—যথা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বাল্মীকীয় বা আর্ষ রামায়ণ, বালরামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ; ইহা ছাড়া বহু অত্যদ্ভুত রামায়ণের খবর দীনেশবাবুর নিকট পাওয়া যায়। আজকাল যেমন অনেকে খেয়ালের বশে 'কাজ' না লিখিয়া 'কায' লিখিতেছেন, সেই রূপ লিপিকরের খেয়ালে 'রামাজনে'র বর্গ্য জ অন্তঃস্থ য হইয়া গিয়াছে—এবং পরে পদমধ্যবর্ত্তী 'য' বাঙ্গালীর মুখে উচ্চারণের জন্য 'য়' হইয়া অনর্থ ঘটাইয়াছে। 'রামাজন'ই ইহার প্রকৃত বাণান ও উচ্চারণ।

হিন্দুর 'রামাজন' ও মুসলমানের 'রমজান' মূলে এক ব্যাপার, কেবল আকারের হেরফের!

অন্যান্য কাব্য

সংস্কৃতভাষায় আরও কতকগুলি কাব্য আছে, যথা—মনোরমা, লীলাবতী, সুবোধিনী, পঞ্চদশী, ইত্যাদি। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইংরেজী নভেল রোমোলা, প্যামেলা প্রভৃতির অনুকরণে প্রথম দুইখানির নায়িকার নামে নামকরণ হইয়াছে। (ইংরেজীতে 'লীলা' নামে নভেলও আছে—লিটনের লিখিত।) প্রথমখানি কিছু বাড়াইয়া এবং কয়েকটি নূতন চরিত্রসৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন; এবং পাছে ধরা পড়েন সেই ভয়ে 'মনোরমা' নাম চাপিয়া রাখিয়া 'মৃণালিনী' নামে চালাইয়াছেন। (বঙ্কিমচন্দ্র পরের জিনিশ নিজস্ব করিয়া লইয়া কিছুতেই তাহা কবুল করিতেন না, এ অভ্যাস তাঁহার ছিল।) দ্বিতীয়খানিকে ৺দীনবন্ধু মিত্র নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। 'সুবোধিনী' আসলে 'সুরধুনী' অর্থাৎ ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী' কাব্যের সহিত অভিন্ন, লিপিকর-প্রমাদে এরূপ বর্ণবিন্যাস দাঁড়াইয়াছে। শুধু হাতের লেখা পুঁথিতে কেন, মুদ্রিত পুস্তকেও অনেক সময় 'র' 'ব' লইয়া গোলযোগ ঘটে, ফলে নায়িকার নাম 'বাণী' কি 'রাণী' তাহা[৯] সাব্যস্থ হইয়া উঠে না। চতুর্থখানিতে নায়িকার বয়স সূচিত—তিনি কন্যাত্বজাতোপযমা সলজ্জা নবযৌবনা। ইংরেজীতে 'Sweet Seventeen' নামে একখানি নভেল আছে। 'পঞ্চদশী' উহারই সংস্কৃত সংস্করণ।[১০] তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যৌবনারম্ভ

---

(৯) 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'মন্ত্রশক্তি' নামক গল্পের নায়িকা।

(১০) ইহার তুলনায় ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ষোলবছুরে পেত্নী' নামকরণ নিতান্ত গ্রাম্য।

শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীঘ্র হয় বলিয়া (সমাজ-সংস্কারকগণ যদিও এ কথা আমলে আনেন না)—প্রতীচীর সপ্তদশীকে প্রাচীর পঞ্চদশী বানাইতে হইয়াছে। যে সময়ে এই পুস্তক প্রণীত হয়, তখন অবশ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায়—শ্রীবিষ্ণুঃ—মাতৃকুলাসনে বয়স লইয়া কড়াক্কড় হয় নাই, ষোড়শীবিবাহের ধূয়াও উঠে নাই।

'কবিকল্পদ্রুম' ও 'কাব্যপ্রকাশ' Palgrave's Golden Treasuryর মত অনেকগুলি স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র উৎকৃষ্ট কবিতার সমষ্টি, বাঙ্গালা 'পদকল্প-তরু'র সমশ্রেণীর। 'মুগ্ধবোধ' ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সহজ কবিতায় পূর্ণ, অনেকটা Children's Treasuryর মত; কবিতাগুলি এত সরল যে মূর্খেও অক্লেশে বুঝিতে পারে, তজ্জন্যই পুস্তকের নাম 'মুগ্ধবোধ' অর্থাৎ মুগ্ধান্ মূঢ়ান্ বোধয়তি। এত ক্ষুদ্র অথচ এত সহজ কবিতা জগতের সাহিত্যে অন্য কুত্রাপি নাই। একটি নমুনা দেখুন—'সহর্ণের্ঘঃ।' (ইহার অর্থ যদি না বুঝেন তবে পাঠক বৈষ্ণবই নহেন।) বীটনের অভিধানে এই পুস্তককে Beauty of Knowledge by Goswami বলা হইয়াছে। ইংরেজী Dodd's Beauties of Shakespeare প্রভৃতি পুস্তকের নাম ইহার সহিত তুলনীয়। [এই গোস্বামীই কি ছাত্রপাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা H. Gossain ?]

এতদ্ভিন্ন সংস্কৃতভাষায় রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, রসরত্নাকর, প্রভৃতি বহু রসাল কাব্য আছে। অধুনা পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত প্রোফেসার প্রফুল্লচন্দ্রের পাল্লায় পড়িয়া এগুলি কিমিয়াশাস্ত্রের কেতাব হইয়া পড়িয়াছে! এই জন্যই কথায় বলে, 'পয়োঽপি শৌণ্ডিকীহস্তে বারুণীত্যভিধীয়তে'। আবার হয় ত কোন্ দিন প্রফুল্লচন্দ্রের প্রসাদাৎ শুনিব যে, কৃষ্ণনগরের রসসাগর কিমিয়াশাস্ত্রের রস্কো (Roscoe) এবং ঐ অঞ্চলের শারদীয়া পূজার ভোজের পাতে পরিবেষিত সুশুভ্র রসকরা পারায় ভরা!

দৃশ্যকাব্য—নাটক

অনেকের ধারণা, সংস্কৃতভাষার নাটক গ্রীকভাষার নাটকের অনুকরণ। কিন্তু গ্রীকজাতির সহিত হিন্দুদিগের যে সময়ে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, সে সময়ে যে এই জাল ভাষার জন্মই হয় নাই, এই মোটা কথাটা তাঁহারা ভুলিয়া যান। পক্ষান্তরে, ম্যাকডনেল সাহেব যে দেখাইয়াছেন, রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের নাটকের সহিত সংস্কৃতভাষার নাটকের যথেষ্ট মিল আছে,(১১) এই কথাটা প্রণিধানযোগ্য। আমার বিবেচনায়, শেক্‌স্‌পীয়ার প্রভৃতির নাটকের অনুকরণেই কালিদাসাদির নাটক রচিত হইয়াছিল। এই জন্যই কালিদাসকে The Shakespeare of India বলে। শেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক স্যর টমাস রো ভারতবর্ষে রাজদূত হইয়া আসেন; তাঁহার দপ্তরে অবশ্যই শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকগুলি ছিল, তদ্দৃষ্টে হিন্দুরা অনুকরণ করে।

এই অনুকরণের একটি স্পষ্ট প্রমাণ—ইংরেজী নাটকের নামকরণে যেমন Romeo and Juliet, Antony and Cleopatra প্রভৃতি নায়ক-নায়িকার নাম গাঁটছড়া-বাঁধা, তেমনই সংস্কৃত নাটক নলোদয়, আনন্দলহরী, চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি, পরিভাষেন্দুশেখর, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, ভামিনী-বিলাস, রাজত-রঙ্গিণী, মদনপা-রিজাত প্রভৃতিতেও নায়ক-নায়িকার নাম গাঁটছড়া-বাঁধা। গ্রীক নাটকে এ প্রথা নাই। কোথাও বা নায়কের নাম আগে, নায়িকার নাম পরে বসিয়াছে, কোথাও বা ইংরেজী Ladies and Gentlemen এর নজিরে নায়িকার নাম আগে নায়কের নাম পরে বসিয়াছে। শেষের প্রথাই শিষ্টসম্মত—'পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ' তাহার সাক্ষী।

---

(১১) MACDONELL: History of Sanskrit Literature, Ch. 13.

'নলোদয়' বিখ্যাত কবি কালিদাস-কৃত। ইহার নায়িকা নলা ইলার গর্ভজাতা, নায়ক উদয় উদয়নের সংক্ষেপ। উদয়ন বহুবিবাহ-প্রবণ ছিলেন, সুতরাং বাসবদত্তা-রত্নাবলী-পদ্মাবতীর উপর তিনি গণ্ডা পূরাইবার জন্য নলা-নাম্নী নারীরও পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন, ইহাতে পাঠকবর্গের চমকিত হইবার কারণ নাই। ফলতঃ, এই কারণেই 'উদয়নকথা' গ্রামবৃদ্ধদিগের নিকট এত সরস ও মনোজ্ঞ।

'আনন্দ-লহরী'তে আনন্দ নায়ক, লহরী নায়িকা। এইরূপ 'চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি'তে চতুর্ব্বর্গ নায়ক, চিন্তামণি নায়িকা। চিন্তামণি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গলে'র প্রসাদে সুপরিচিতা। চতুর্ব্বর্গ কি বিল্বমঙ্গলেরই নামান্তর? এই দুইখানি নাটক ইংরেজী Moralities শ্রেণীর রূপক (allegory)। 'পরিভাষেন্দুশেখরে' পরিভাষা নায়িকা, ইন্দুশেখর নায়ক; ইন্দুশেখর শিবের নামান্তর, এবং পরিভাষা শক্তির নামান্তর; তিনি, ভাষা অর্থাৎ শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মল্লিনাথ বায়ুপুরাণ হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন,—শব্দজাতমশেষন্তু ধত্তে শর্ব্বস্য বল্লভা। অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দুশেখরঃ॥ 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী'তে সিদ্ধান্ত নায়ক, কৌমুদী নায়িকা। সিদ্ধান্ত সিদ্ধার্থের অপপাঠ বলিয়া সন্দেহ হয়। ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের 'কৌমুদী-সুধাকর' উহারই উপর চূণকাম করা (সুধা = চূণ)!

"ভামিনী-বিলাসে' ভামিনী নায়িকা, বিলাস নায়ক। এই নাটকের রচয়িতা জগন্নাথ রাজা আইন আকবরীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। ব্রুয়ার সাহেবের Dictionary of Phrase and Fable হইতে উক্ত রাজার নাম জানা যায়।[১২] রাজত-রঙ্গিণীতে রাজত নায়ক, রঙ্গিণী নায়িকা।

(১২) King Ayeen Akbery sent a learned Brahman &c—Art. *Juggernaut*, BREWER: Dictionary of Phrase and Fable, New Edition, Revised, Corrected and Enlarged.

কেহ কেহ এখানিকে 'রাজ-তরঙ্গিণী' উচ্চারণ করিয়া ইতিহাস বলিয়া ভ্রম করেন। (যেমন 'শশাপ সা' 'শশা পসা' উচ্চারণ করিয়া অনেকে রঘুবংশে শশার সন্ধান পান!) হিন্দুরা কখন ইতিহাস লেখে নাই এবং কেন লেখে নাই, সে সব তথ্য ম্যাক্সমূলর, ম্যাকডনেল প্রভৃতি বিলাতী পণ্ডিত সুনিপুণভাবে(১৩) নিরূপণ করিয়াছেন। তবে 'ইতিহাস' শব্দটা যে তাহাদের ভাষায় রহিয়াছে, তাহা 'শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা'র মত।

'মদনপা-রিজাতে' মদনপা নায়িকা, অরিজাত নায়ক। লোকে উচ্চারণের সুবিধার জন্য মদন-পারিজাত করিয়া ফেলে (যেমন ইংরেজী pre-sentimentকে অনেকে presenti-ment করিয়া ফেলে।) 'মদনপা' মদনিকা-মদয়ন্তিকার মাসতুতো ভগিনী, 'অরিজাত' অজাতশত্রুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। আমাদের কবি হেমচন্দ্র ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

কাব্য সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। কেন না অনেকের ধারণা, সংস্কৃতভাষায় কেবল আদিরসাশ্রিত কাব্যই আছে, অন্য কিছুই নাই। এই ভ্রান্তমত-নিরসনের জন্যই আমাদের লেখনী-ধারণ। আমরা ক্রমে দেখাইব যে, এই ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, মুদ্রাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়ের, এবং পানাহার, প্রসাধন-কলা, নৃত্যগীতবাদ্য, প্রভৃতি হাল্‌কা বিষয়ের গ্রন্থের অভাব নাই।

---

(১৩) MACDONELL: History of Sanskrit Literature; *Introductory.* MAX MULLER: History of Ancient Sanskrit Literature; *Introduction.*

চিকিৎসাশাস্ত্র

আজকালকার নানা রোগের প্রাদুর্ভাবের দিনে চিকিৎসাশাস্ত্রের কথাই আগে বলি। কালিদাস কবি বলিয়াই খ্যাত, কিন্তু ইংরেজ কবি গার্থ এবং মার্কিন কবি হোম্‌সের মত তিনিও একাধারে কবি ও চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহার কবিত্বরসাভিষিক্ত চিকিৎসা-কার্য্য দেখিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি দেন; তদবধি লোকে চিকিৎসক-মাত্রকেই 'কবিরাজ' আখ্যা দিয়া থাকে (যেমন তিলের নির্য্যাস তৈলের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া সর্ষপ প্রভৃতির স্নেহকেও লোকে 'তৈল' বলিয়া থাকে।) স্ত্রীরোগে কালিদাসের অসাধারণ বিচক্ষণতা ছিল; এমনও শুনা যায় যে তিনি স্ত্রীলোকের প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য মধ্যে-মধ্যে স্ত্রীবেশ ধারণ করিতেন। তাঁহার প্রণীত 'কুমার-সম্ভব' ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ। তাঁহার আর একখানি চিকিৎসা-বিষয়ক পুস্তক পত্নীকে সম্বোধন করিয়া লিখিত; আমাদের সাহিত্যে গিরিজা বাবুর 'গৃহলক্ষ্মী'তে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। কালিদাসের পত্নী বিখ্যাত বিদুষী ছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। উক্ত পত্নী (গ্রাম্যভাষায় মাঘ) 'শিশুপালবধ' রচনা করিয়াছেন। ইহা শিশুচিকিৎসা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়, ইংরেজ-রাজ্যেই যে পরীক্ষা দেওয়ার ভয়ে শিশুগণ তাড়াতাড়ি ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে তাহা নহে, ইংরেজ-রাজ্য-স্থাপনের পূর্ব্বেও শিশুমড়ক (infant-mortality) একটা সমস্যা (problem) হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

'অমরকোষে' অমরত্ব-লাভের জন্য জীবনী সালসা (elixir of life) প্রস্তুত করিবার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁহারা 'অমরকোষ'কণ্ঠস্থ করেন, তাঁহারা সকলেই দীর্ঘায়ুঃ হয়েন দেখা যায়। ইহা এই চিকিৎসা-প্রণালীর

অমোঘ ফলের পরিচয়।(১৪) 'শারীরক-ভাষ্যে' শরীর-পোষণের এবং 'শ্রীভাষ্যে' দেহের কান্তিবিকাশের তত্ত্ব বিবৃত। গ্রন্থদ্বয় চুণীবাবুর 'শারীর-স্বাস্থ্যবিধানে'র সঙ্গে সমান আসনের যোগ্য। ইহা ছাড়া সুপ্রজননবিদ্যা (eugenics) সম্বন্ধে বৃহৎ জাতক, লঘু জাতক, প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।

জীবন-চরিত

সংস্কৃত ভাষায় বহু জীবন-চরিত বর্ত্তমান। জীবনচরিত-রচনার আর্ট এই ভাষায় এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল যে শুধু গদ্যে কেন, পদ্যে এবং গদ্যপদ্যময় নাটকাকারে পর্য্যন্ত জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছিল। হর্ষচরিত ও দশকুমারচরিত গদ্যে লিখিত; নৈষধচরিত, বুদ্ধচরিত ও নবসাহসাঙ্ক-চরিত পদ্যে লিখিত; মহাবীরচরিত, উত্তররামচরিত, মহানাটক ও বিক্রমোর্ব্বশী—এই জীবনচরিত-চতুষ্টয় নাটকাকারে লিখিত। 'মহাবীর-চরিতে' মহাবীর অর্থাৎ হনুমানের অবদানপরম্পরা মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু, বর্ণনায় সরসতা-সঞ্চারের জন্য রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সমসাময়িক ব্যক্তির বৃত্তান্তও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত, বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, রামতনু লাহিড়ির জীবনচরিত এবং হালে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনচরিত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জীবনচরিতে এই প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। ইংরেজীতে

---

(১৪) অনেকে অমরকোষকে অভিধান বলিয়া ভ্রম করেন। অভিধান-খানির নাম অমরকোষ নহে, অমরসিংহ। নামের আংশিক সাম্যে এই ভ্রম ঘটে। (যেমন শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি ও শার্ঙ্গধর-সংহিতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ।) বীটন লিখিয়াছেন—'There are in all 18 dictionaries of high reputation but the Amar-sinha is deemed the best.'

ম্যাসন-প্রণীত মিল্‌টনের জীবনচরিত এই শ্রেণীর গ্রন্থের অগ্রণী। 'উত্তর-রামচরিত' উত্তর অর্থাৎ পরশুরামের পরবর্ত্তী দাশরথি রাম অর্থাৎ রাম দি সেকণ্ডের জীবন-কথা (উত্তম অর্থাৎ সর্ব্বশেষ রাম, বলরাম বা রাম দি থার্ডের নহে।) 'মহানাটক' মহাবীর-চরিতের ন্যায় মহাবীর হনুমানের জীবনচরিত, কিন্তু ইহা তাঁহার স্বরচিত আত্মজীবনচরিত, মহাবীরের লিখিত এইজন্য মহানাটক বলিয়া অভিহিত (যেমন অনেকে মনে করেন ভট্টিকবির লিখিত বলিয়া ভট্টিকাব্য নাম।) ইহা অনেকটা Confessions of Rousseau, Confessions of St. Augustine, এবং রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্রে'র(১৫) মত। হনুমানের নাটকীয় প্রতিভা (dramatic faculty) খুবই প্রখর ছিল। তাঁহার বংশধরগণ টেক্সের ভয়ে মৌনবৃত্তি অবলম্বন করিলেও আকার-ইঙ্গিতে এই শক্তির পরিচয় দেন। (ইংরেজীতে এই শ্রেণীর নাটকীয় কলাকে mime বা pantomime বলে। আমাদের দেশে কবির লড়াইএও এইরূপ মূক অভিনয় হইত।) 'বিক্রমোর্ব্বশী' বিক্রমাদিত্যের জীবনচরিত, তাঁহার সভাকবি কালিদাসের রচিত (যেমন হর্ষচরিত হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচিত।) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় 'সাবধানী' ঐতিহাসিকও হর্ষচরিতের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন। আশা করা যায়, তিনি ও তাঁহার সহযোগী ভ্রাতৃবৃন্দ ক্রমে-ক্রমে দশকুমারচরিত, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতিরও ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিবেন। বাস্তবিক

(১৫) ছিন্নপত্রের সহিত সাদৃশ্য এই যে রবীন্দ্রনাথের বাতিল খসড়া যেমন সংগৃহীত হইয়া ছিন্নপত্র নাম ধারণ করিয়াছে, সেইরূপ হনুমানের ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল; সেইগুলি উদ্ধার করিয়া মহানাটক সঙ্কলিত হইয়াছে। মধুসূদন বা দামোদর (একই কথা!) মিস্ত্রী এই সব পাথর যোড়া দেন।

এই গ্রন্থগুলি কুলপঞ্জিকাদির ন্যায় হাসিয়া উড়াইবার জিনিশ নহে। এগুলিতে ইতিহাসের খাঁটি মাল যথেষ্ট আছে।

ভূগোল

ভূগোলশাস্ত্রে 'বিশ্বকোষ' ও 'মেদিনীকোষ' Complete Gazetteer, 'আর্য্যভট্ট' বা 'আর্য্যভটে' আর্য্যাবর্ত্তের বিবরণ, 'বাস-বদত্তা'য় যে সকল দেশে মনুষ্যের বাস আছে সেই সকল দেশের বিবরণ। 'কথাসরিৎসাগরে' পৃথিবীর জলভাগের ও 'হিতোপদেশে' স্থলভাগের বিবরণ, সরল গল্পের আকারে লিখিত—অনেকটা Story of the Earth, Land and Seaর মত। 'বৃহৎকথা'য় জলস্থল উভয় ভাগের কথা একত্র ছিল; কিন্তু এই গ্রন্থ এক্ষণে লুপ্ত। কথাসরিৎসাগর ও হিতোপদেশের একটি বিশিষ্টতা এই যে, উভয় গ্রন্থেই শুধু স্থানের নীরস তালিকা নাই, সঙ্গে-সঙ্গে তত্তৎস্থানের রাজহংস, ময়ূর প্রভৃতি জলচর-স্থলচর প্রাণীর বৃত্তান্তও আছে। যাঁহারা সেকালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ক্লার্ক সাহেবের জিওগ্র্যাফি পড়িয়াছেন, তাঁহারা প্রণালীটা সহজে ধরিতে পারিবেন।

হিতোপদেশের প্রকৃত রচয়িতা কে জানা যায় না। হিন্দুরা সত্য-গোপনের জন্য নারায়ণভট্ট বা বিষ্ণুশর্ম্মার নামে চালাইয়াছেন। জয়দেবও বিষ্ণুর অন্যতম কীর্ত্তি 'ভূগোলমুদ্‌বিভ্রতে' বলিয়া গিয়াছেন। হিতোপদেশে বর্ণিত কর্পূরদ্বীপ শ্বেতদ্বীপ অর্থাৎ Albionএর সহিত অভিন্ন। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত জরদ্গব-নামক গৃধ্র = গিধ্‌ধর = শিয়াল = Jackal (Wilkins কৃত হিতোপদেশের ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য) ইউরোপের Reynard the Foxএর সহিত এক কি না, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। আর এক কথা, এই 'হিতোপ' কি Utopiaর সংস্কৃত ভাষায় অক্ষরানুবাদ (transliteration)? তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহা ইংরেজী

পুস্তকের তর্জ্জমা। দেশশ্চাসৌ কর্পূরদ্বীপঃ স্বর্গ এব, রাজা চ দ্বিতীয়ঃ স্বর্গপতিঃ—ইত্যাদি দেখিয়া Ideal Commonwealthএর কথাই ত মনে হয়।

এই ভাষায় স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্থান সম্বন্ধেও পুস্তক আছে। যথা কাশিকাবৃত্তি = কাশীর বৃত্তান্ত = Benares Commentary (ইংরেজী-টুকু ম্যাকডনেলের তর্জ্জমা); এখানি বাঙ্গালা 'কাশী-পরিক্রমা'র মত গাইডবুক। যাঁহারা পূজাবকাশে কাশীতে সৌখীন তীর্থযাত্রা করেন, তাঁহারা এই গাইড-বুক একখানি খরিদ করিলে যথেষ্ট উপকার পাইবেন।

প্রাণিবৃত্তান্ত

কথাসরিৎসাগর ও হিতোপদেশ ছাড়া এই ভাষায় স্বতন্ত্র প্রাণিবৃত্তান্তও আছে। এগুলির নাম 'পুরাণ।' পুরাণে মৎস্যকূর্ম্মবরাহ প্রভৃতি জলচর ও স্থলচর প্রাণী এবং দ্বিপদ, চতুষ্পদ, ষট্পদ, অষ্টাপদ, লোমপাদ, উত্তানপাদ প্রভৃতি নানাপ্রকার জানোয়ারের বৃত্তান্ত আছে। নৃসিংহ পুরাকালের ম্যামথ-ম্যাষ্টোডনের মত এক প্রকার অতিকায় জীব ছিল।

হংসদূত, কোকিলদূত প্রভৃতি গ্রন্থে (carrier pigeon) সংবাদবাহী পারাবতের ন্যায় হংস-কোকিল প্রভৃতিকেও সংবাদবহন-কার্য্যে নিয়োগ করার নিদর্শন পাওয়া যায়। নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে এইরূপ হংসের দৌত্যের কথা আছে। পক্ষিজাতি সম্বন্ধে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার সহজ অর্থ—এতৎপাঠে পক্ষী (শকুন্ত) চিনিবার (অভিজ্ঞানের) উপায় শিক্ষা হয়। এই চিড়িয়াখানায় বিশ্বামিত্র বক-ধার্ম্মিক, কণ্ব গরুড়, দুর্ব্বাসাঃ গৃধ্র, দুষ্যন্ত শ্যেন, বিদূষক বাবদূক শুক, শকুন্তলা কপোতী ও যুগল-সখী বাস্তু ঘুঘু।

উদ্ভিদবিদ্যা

উদ্ভিদবিদ্যায় এই ভাষায় অনেকগুলি ভাল-ভাল গ্রন্থ আছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় সে সকলের কোন সন্ধান না রাখিয়া বিদেশীর দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। আশা করি, তিনিও একদিন মাইকেল মধুসূদনের মত ইহার জন্য আক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিবেন।

'রঘুবংশ' ও 'হরিবংশে' বাঁশের আওলাত সম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা আছে। বাঁশের উচ্চতা দেখিয়া কালিদাস ইহাকে 'সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ' বলিয়া অতিশয়োক্তি করিবেন এবং উচ্চ বাঁশের সঙ্গে ক্ষুদ্র কচার তুলনা করিবেন (ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ কচাল্পবিষয়া মতিঃ), কিছুই আশ্চর্য্য নহে। (অনেকে যেমন সরস্বতী লিখিতে স্বরস্বতী লিখিয়া বসেন, সেইরূপ অজ্ঞ লিপিকরগণ 'কচা' না লিখিয়া 'ক্বচা' লিখিয়া বসিয়াছে।) কচা অর্থাৎ ভেরাণ্ডা (এরণ্ড) ক্ষুদ্রতার আদর্শ। এই জন্যই প্রবাদবাক্য আছে,—নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।

রঘু অর্থাৎ বিখ্যাত রঘু ডাকাত (শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীর রঘুদয়ালও স্মর্ত্তব্য) যে বাঁশের লাঠি লইয়া ডাকাতী করিত, এই গ্রন্থে প্রধানতঃ সেই বাঁশের কথা আছে। এই রঘু ডাকাত ভবিষ্যতে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হয়েন। (ডাকাতেরা রাজবংশের আদিপুরুষ, এই তত্ত্ব বিলাতী লেখক রাস্‌কিন বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন)। 'রঘূণামন্বয়ং বক্ষে' অর্থাৎ রঘু অন্যায় করিয়া লোকের বুকে বাঁশ ডলিত—ইত্যাদি শ্লোকে কালিদাস রঘু ডাকাতের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রঘুর কার্য্যটি যে 'অন্যায়' এই স্পষ্ট বাক্য বলিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন!

বাঙ্গালাদেশে বাঁশের আওলাত বেশী এবং এই দেশেই রঘু ডাকাতের বাসভূমি ছিল, অতএব কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, অত্র সন্দেহো

নাস্তি। আবার নদীয়া জেলায় ভেরাণ্ডাকে 'কচা' বলে। ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, কালিদাস নদীয়া জেলার বাসিন্দা ছিলেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ কয়েক বৎসর হইতে নবদ্বীপবাসী গবেষকগণ সংগ্রহ ও প্রচার করিতেছেন। পিষ্টপেষণে প্রয়োজন নাই।

রঘুবংশে নানা রকমের বাঁশের কথা আছে, তন্মধ্যে শেষবর্ণিত অগ্নি-বর্ণেরই রঙ্গের জন্য জৌলুস বেশী। প্রাগ্‌বংশবাসী রামচন্দ্র অপেক্ষা শেষোক্ত বাঁশেরই না কি আজকাল উন্নতি। পরশুরামের মত 'নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে' ত একেবারেই লোপ পাইয়াছে।

'হরিবংশে'র হরি ডাকাবুকো ডাকাত ছিলেন না, তবে দধিদুগ্ধ, ননীমাখন, সুযোগ পাইলে আহিরিণী-গোয়ালিনীদিগের কাপড়খানা চোপড়খানা পর্য্যন্ত চুরি করিতেন। তিনি লাঠিবাজীর ধার ধারিতেন না, সরল বাঁশের বাঁশী লইয়া তাঁহার কারবার ছিল। শেষে তাঁহার ঘরে 'মুষলং কুলনাশনম্' জন্মিয়াই বংশনাশ করিল।

'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'য় শাল-কাঠ ছেদন-ভেদন-ভঞ্জন-কর্ত্তন করিয়া কিরূপে কড়ি-বরগা তৈয়ারি করিতে হয়, তাহার প্রণালী বর্ণিত।

ফুলের চাষ সম্বন্ধে এই ভাষায় এত সুন্দর-সুন্দর পুস্তক রহিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ফুলের ফসল' না বাহির করিলেও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত না। যাক, অবান্তর কথা ছাড়িয়া পুস্তকগুলির নাম উল্লেখ করি। যথা—সুপদ্ম, কুবলয়ানন্দ, পুষ্পবনবিলাস (পুষ্পবাণ ভুল বাণান), মল্লিকামারুত, মালতীমাধব, কুসুমাঞ্জলি, ছন্দোমঞ্জরী, বীজগণিত। যাঁহাদিগের ফুলবাগানের সখ আছে, তাঁহাদিগকে 'মালতীমাধবে'র 'বকুলবীথী' নামক প্রথম অংশটি পাঠ করিতে বলি। 'কুসুমাঞ্জলি'র বহু স্থলে 'সরিষার ফুল' দেখা যায়। ইহা তখনকার একটা প্রধান ফসল ছিল। 'বীজগণিতে' বীজ-বপন সম্বন্ধে উপদেশ আছে, এবং কয়টি বীজে

কতটা ফসল হয় তাহার গণনা সম্বন্ধে সঙ্কেত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায়,—কৃষিবিদ্যা হিন্দুদিগের হাতে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এখনও ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ।

বিবিধ

মুদ্রাতত্ত্ব (numismatics) সম্বন্ধে মুদ্রারাক্ষস ও চক্রদত্ত উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়খানিতে সর্ব্ববিধ চক্রাকার মুদ্রার বিবরণ প্রদত্ত। 'মৃচ্ছকটিকে' কৃত্রিম মুদ্রা-প্রস্তুত-করণের রহস্য উদ্ঘাটিত। ইহার আসল নাম মিচ্ছ কড়ি—false coin, কৃত্রিম মুদ্রা (পূর্ব্বে কড়িই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত); এই নাম সাধুভাষায় 'মৃচ্ছকটিক' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণতঃ বিটচেট-দ্যূতকার (gambler) প্রভৃতি লোকে কৃত্রিম মুদ্রা চালাইবার প্রয়াস করে, সেই জন্য উক্ত পুস্তকে ঐ সকল শ্রেণীর লোকের কথা আছে।

রত্নপরীক্ষা সম্বন্ধে রত্নপ্রভা, রত্নাবলী, উজ্জ্বলনীলমণি, মন্বর্থমুক্তাবলী, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ও ভামতীর নাম করা যাইতে পারে। ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ—এ বিষয়ে লাখ কথার এক কথা।

'মাল-বিকা-গ্নিমিত্রে' মহাজনদিগের বিক্রেয় মাল সম্বন্ধে Fire Insuranceএর ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। ইহা (political economy) অর্থশাস্ত্রের একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন।

সংহিতাগুলি যৌথ কারবার এবং Co-operative Credit Society প্রভৃতি-সংক্রান্ত তথ্যে পূর্ণ। ইহার প্রকৃত বাণান 'সংহতি'—চ্যুত-সংস্কৃতিতে 'সংহিতা' হইয়া গিয়াছে। এই সংহতির গুণেই বহু বিপ্লবের মধ্যে হিন্দুসমাজ আজও টিকিয়া আছে।

তন্ত্রে তাঁত ও বয়নবিস্তার আলোচনা। এগুলি শিব বা শিবার মুখনিঃসৃত উপদেশ অর্থাৎ লেক্‌চার। তাঁহারা জগৎকে বস্ত্র যোগাইয়া নিজেরা দিগম্বর-দিগম্বরী। ভারতের বয়নশিল্পের দশাই যে আজ এইরূপ! তন্ত্রের মধ্যে কাতন্ত্র ও পঞ্চতন্ত্র সুবিদিত। পঞ্চতন্ত্রে সোমিলক প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ তন্তুবায়ের জীবনচরিত আছে। কাতন্ত্রসূত্র, পিঙ্গলসূত্র, কল্পসূত্র, প্রভৃতিতে নানানুবর্ণী সূতার বিবরণ আছে।

নৃতত্ত্বে (ethnology) 'পার্ব্বতী-পরিণয়' বা পার্ব্বতীয় পরিণয় = Marriage-customs of the hill-tribes বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। 'ভট্টি-কাব্যে,' পদ্মিনী উপাখ্যানে উল্লিখিত ভট্টি-জাতির বিবরণ আছে। 'নাগানন্দ' Communism সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি না থাকিলেই নাগা-সন্ন্যাসীদিগের আনন্দ, সেই কারণে পুস্তকের এইরূপ নামকরণ।

'ভাবপ্রকাশ' মনোবিজ্ঞান (psychology) সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। 'শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা' শব্দ (Sound) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। 'মিতাক্ষরা' ও 'ভাষাপরিচ্ছেদ' ভাষাতত্ত্ব (philology) সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। শেষখানিতে Grimm, Bopp, Pott প্রভৃতির চর্ব্বিতচর্ব্বণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয় বলিয়া রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু দুষ্ট লোকে বলে যে বরং মূল বুঝা যায়, তথাপি অনুবাদ বুঝা যায় না। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়!

ব্যবহারাজীবগণ আশ্বস্ত হউন, তাঁহাদিগের প্রাণপ্রিয় ব্যবহারশাস্ত্রের গ্রন্থেরও এই ভাষায় অভাব নাই। যথা, কিরাতার্জ্জুনীয়, রাঘবপাণ্ডবীয়, বৃহন্নারদীয়, বাক্যপদীয়, ইত্যাদি। এগুলি Law Reports, এগুলিতে কয়েকটা ভারী-ভারী মামলার নজীর আছে, বাদী প্রতিবাদীর নাম একত্র করিয়া এবংবিধ নামকরণ।

যুদ্ধবিদ্যা পলাশীর লড়াইএর পূর্ব্বেও হিন্দুদিগের অজ্ঞাত ছিল না। 'মহামুদ্গর' (অনেকে 'মোহমুদ্গর' উচ্চারণ করেন) ইহার প্রমাণ। 'গোলাধ্যায়ে' গোলাগুলির ব্যাপার, তিতুমীরের ধ্যানলব্ধ। ইহার একটি সূত্র 'গুলি খা ডালা' সকলেই শুনিয়াছেন।

'সেতুবন্ধ' (building of a bridge) কুলী-মজুরের বুঝিবার সুবিধার জন্য দেশভাষায় লিখিত।

মহাভারত হিন্দুদিগের এন্‌সাইক্লোপীডিয়া(১৬) ; এই জন্যই প্রবাদ-বাক্য, 'যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে'। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্ব লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বীটন হিন্দুদিগের অভিধান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'There are in all 18 dictionaries of high reputation'। সম্ভবতঃ ইহা সুবিখ্যাত ফরাশী এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার অনুকরণ বা অনুবাদ, ফরাশডাঙ্গায় লিখিত।

গণিত ও জ্যোতিষ

গণিতশাস্ত্র বড় নীরস, তথাপি প্রবন্ধের সম্পূর্ণতার জন্য তাহারও কিছু উল্লেখ আবশ্যক। বৃত্তরত্নাকর—Geometry of the circle, ইউ-ক্লিডের জ্যামিতির নকল। হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট এই শাস্ত্র ধার করিয়াছে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। (Arithmetic) পাটীগণিতে বেতাল-পঞ্চ-বিংশতি, শুকসপ্ততি, চৌরপঞ্চাশিকা, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, দশরূপক, এই কয়খানি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তখানি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে ইহা নারায়ণের দশাবতারস্তোত্র, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। ইহাতে দশমিক প্রণালী (decimal system) বিবৃত।

(১৬) It is not an epic at all, but an encyclopædia—MACDONELL: History of Sanskrit Literature, Ch. 10.

হিন্দুরাই যে এই প্রণালীর উদ্ভাবয়িতা, এ কথা ইউরোপীয়গণও স্বীকার করেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী—Theory of Numbers। 'যোগশাস্ত্রে' নানা প্রক্রিয়ার যোগ (তেরিজ) যথা হঠযোগ, রাজযোগ, গুহ্যযোগ, ইত্যাদি এবং 'দায়ভাগে' নানা প্রক্রিয়ার ভাগের কৌশল উপদিষ্ট।

ফলিতজ্যোতিষে 'জাতকমালা' উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ে' চন্দ্রসম্বন্ধে, 'বীরমিত্রোদয়ে' সূর্য্যসম্বন্ধে (মিত্র সূর্য্যের নামান্তর, বীর হনূমান্ তাঁহার সহিত মিতা পাতাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই নাম) এবং 'চন্দ্রালোক' ও 'প্রক্রিয়া-কৌমুদী'তে (operation of the moon-light) শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ-ভেদে চন্দ্রের আলোকের তারতম্য-বিচার।

'পবনদূত' ও 'মেঘদূত' নভোবিজ্ঞান (meteorology) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। বীটন মেঘদূতকে নাটক বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন ('another great drama, Meghaduta')। গ্রন্থখানি পদ্যে লিখিত এবং শেষার্দ্ধ 'উত্তরমেঘ' নামে অভিহিত দেখিয়া প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথন (dialogue) বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকিবে।

মেঘদূতে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাম্' এই যে চারি প্রকার মেঘের শ্রেণী-বিভাগ আছে, ইহা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের Stratus, nimbus, cumulus, cirrusএর সহিত অভিন্ন। 'ধূম' অর্থাৎ ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘ (stratus); এই মেঘ দেখিলেই ময়ূর-জাতীয় কবিগণ কবিতা লেখেন (কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই জন্যই মেঘদূতের সাতিশয় পক্ষপাতী)। 'জ্যোতিঃ' অর্থাৎ বিদ্যুতে ভরা মেঘ (nimbus); এই মেঘ হইতে বজ্রপাত হয়। 'সলিল' অর্থাৎ জলে ভরা মেঘ (cumulus); এই মেঘে বৃষ্টি হয়। 'মরুৎ' (cirrus) অর্থাৎ এই মেঘ হইলেই ঝড় উঠিয়া মেঘখানি উড়াইয়া লইয়া যায়। তখন আর 'মন্দং মন্দং নুদতি পবনঃ' নহে, একেবারে 'অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ'!

গণিতবিজ্ঞান প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয় ছাড়িয়া এক্ষণে নৃত্যগীতবাদ্য, প্রসাধনকলা ও পানাহার প্রভৃতি হাল্‌কা বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

নৃত্যগীতবাদ্য

সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে এই ভাষায় অনেকগুলি ভাল-ভাল গ্রন্থ আছে, সেগুলির সাধারণ নাম 'গীতা'। এতৎসম্বন্ধে উপদেশও আছে—গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। কেন না, ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরম্, গানাৎ পরতরং ন হি।

'গুরুগীতা'য় চড়া বা কড়ি সুরের গীত সন্নিবিষ্ট। 'ষড়্‌জগীতা'য় ষড়্‌জ ঋষভগম প্রভৃতি সপ্ত সুরের প্রথম ষ এর সুর সাধা সম্বন্ধে উপদেশ। 'পিতৃ-গীতা'য়, পিতৃশ্রাদ্ধে যে কীর্ত্তনগান হয়, তাহাই সন্নিবিষ্ট। 'বৈষ্ণবগীতা'য় বৈষ্ণব ভিখারীদিগের গান। তুলসীপত্র তুলিতে-তুলিতে গুন-গুন করিয়া যে গান গায়িতে হয়, 'তুলসীগীতা'য় তাহাই আছে। মঙ্কিগীতা (Kipling) কিপ্‌লিঙের Song of the Banderloguesএর সহিত অভিন্ন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ মহাদেব শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে গীতশিক্ষা দিয়াছেন। অনেকের ধারণা এ স্থলে ভগবান্ অর্থে শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু সে ধারণা ভুল; ভগবান্ অর্থে মহাদেব, কেন না মহাদেবই শিঙ্গাডমরু বাজাইয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রচার করেন। 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত', এখানেও দেখা যায় ভূতনাথ মহাদেবই ভগবান্। মহাত্মা ম্যাকডনেল বলিয়াছেন, মূল মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের নামগন্ধও ছিল না(১৭); পরে বৈষ্ণবেরা এই মহাগ্রন্থ নিজস্ব করিয়া লইয়া তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রক্ষিপ্ত করে। ভগবদ্‌গীতায়ও অবশ্য এইরূপে বৈষ্ণবেরা শিবকে সরাইয়া তাঁহার আসনে শ্রীকৃষ্ণকে বসাইয়াছেন। খাঁটি গীতা যে শিবেরই

(১৭) MACDONELL: History of Sanskrit Literature, Ch. 10.

উপদিষ্ট, তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝা যায়। 'Siva puts on the form of his charioteer and gives him a lesson' &c—Preface to the *Hitopadesha* by B. Half-Wortham (The New Universal Library)। সাহেবেরা শৈব-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব হইতে দূরে থাকাতে নিরপেক্ষভাবেই লিখিবেন। অতএব এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের মতই শিরোধার্য্য।

সঙ্গীতশাস্ত্রে গীতগোবিন্দ শীর্ষস্থানীয়। ইহাতে গোবিন্দ অধিকারী তাঁহার সমগ্র কৃষ্ণযাত্রা সংস্কৃতভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছেন। কৃষ্ণযাত্রা ও গীতগোবিন্দ যে একই জিনিশ তাহা ম্যাকডনেল পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছেন। (তাঁহার পুস্তকের ১৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) পূজারী ঠাকুর ইহার টীকা লিখিয়াছেন। জয়দেব গোবিন্দ অধিকারীরই রাশিনাম, তিনি স্বতন্ত্র লোক নহেন। সংস্কৃতভাষায় ডাকনাম ছাড়িয়া রাশিনাম বলিতে হয়, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি উপলক্ষে সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাচ ও নাচের জের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা আছে। নাট্য ও নৃত্য, নট-নটী ও নর্ত্তক-নর্ত্তকী মূলে একই জিনিশ। (সেই জন্যই থিয়েটারের চলিত নাম 'নাচঘর' এবং আমাদের দেশের থিয়েটারের এ নামও সার্থক।) ভরত যৌবনে খুব নৃত্যশীল ও নাট্যকুশল ছিলেন, পরে ভারিকি হইয়া ও সব ছাড়িয়া জড়ভরত হইয়া পড়েন। শুনিয়াছি, যাঁহারা যৌবনে জিমন্যাষ্টিক করেন, তাঁহারা প্রবীণ হইয়া ও-সব ছাড়িলেই বাতে পঙ্গু হইয়া পড়েন।

'নৃত্যকর্ম্মপদ্ধতি'তেও নাচ সম্বন্ধে উপদেশ আছে। ব্রাহ্মণগণ আহ্নিকের সময় এই সকল নাচের কসরত দেখান। অনেকে অশুদ্ধ করিয়া পুস্তকখানির নাম উচ্চারণ করেন—'নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি'! আমরা 'শুদ্ধ' করিয়া দিলাম।

মুরারি নাচগান ছাড়িয়া বাজনার দিকে ঝুকিয়াছিলেন, এই জন্যই কথায় বলে, 'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ'। দেবতা মুরারি যমুনায় স্নানরতা গোপীদিগকে শুনাইয়া-শুনাইয়া বাঁশী বাজাইতেন, মানুষ মুরারি বাঁশীর পয়সা না যোটাতে কুলনারীদিগের স্নানঘাটের সোপানস্থিত ঘড়া লইয়া বাজাইতেন। [কলিকাতার রাস্তায় ভিক্ষুকের হাঁড়ি বাজান অনেকে শুনিয়াছেন। ভিক্ষুকের ঘড়াও যোটে না।] স্ত্রীলোককে না শুনাইলে কবির কাব্য, ওস্তাদের গীতবাদ্য কিছুই সার্থক হয় না, তাই কালিদাসের ঋতুসংহার ও শ্রুতবোধের প্রিয়া ও মেঘদূতের মালিনী এবং কূপারের মিসেস্ আন্‌উইন ও লেডী অষ্টেন। [অনেক ফক্কড় যুবক এই কারণেই স্ত্রীলোক দেখিলেই গান ধরিয়া দেয়।] মুরারি ঘড়ার বাজনা সম্বন্ধে যে পুস্তক লেখেন, তাহার নাম—অনর্ঘড়ারবঃ। মুদ্রিত পুস্তকে ছাপাখানার ভূতের উৎপাতে আনাগোনা 'ঘ'এর দুইবার আনাগোনায় অনর্ঘরাঘব হইয়াছে! [এই দুঃখেই খাঁটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ মুদ্রিত পুস্তক স্পর্শ করেন না।] ঘড়ার বাদ্য সম্বন্ধে একটি শ্লোক অনেকেই জানেন।

রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ কক্ষচ্যুতো হেমঘটস্তরুণ্যাঃ।
সোপানমার্গে প্রকরোতি শব্দং ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ঢঃ॥

প্রসাধন-কলা

শরীরের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য প্রসাধন-কলার চর্চ্চা হিন্দুদিগের মধ্যে ইংরেজী ও ফরাশী ফ্যাশান আমদানির পূর্ব্বেও ছিল। এই শাস্ত্রের সাধারণ নাম 'অলঙ্কারশাস্ত্র'। 'সাহিত্যদর্পণে', দর্পণের সাহায্যে কেশ-বেশ-বিন্যাসের প্রণালী প্রকটিত। এই দর্পণ বিলাসি-বিলাসিনীদিগের 'সহিত' অর্থাৎ সঙ্গে-সঙ্গেই থাকিত, তজ্জন্য ইহার নাম 'সাহিত্য-দর্পণ'। এখনও সৌখীন লোকের পকেটে বা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগে ছোট আয়না

থাকে। তবে তখনকার দর্পণ অবশ্য ধাতুনির্ম্মিত ছিল, তখনও বিলাত হইতে সস্তা কাচের আমদানি ও কাঞ্চনমূল্যে কাচক্রয়ের প্রচলন হয় নাই। (আজও বিবাহে ধাতুময় দর্পণ বরের হস্তে ধৃত হয়।) 'কাব্যাদর্শ'ও এই শ্রেণীর গ্রন্থ।

'বেণীসংহারে' বেণীবন্ধনের প্রণালী বর্ণিত। ভীমসেন বিখ্যাত হেয়ার-ড্রেসার ছিলেন। 'প্রিয়দর্শিকা'য় স্ত্রীলোকদিগের বেশবিন্যাসের কথা আছে; প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা, স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেষঃ—ইহার মূলমন্ত্র। 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে' রকম-রকম কণ্ঠাভরণ অর্থাৎ কণ্ঠমালা হার নেক্‌লেস প্রভৃতির প্রসঙ্গ আছে। সরস্বতী রূপজীবিনীদিগের প্রিয়-দেবতা, সুতরাং অলঙ্কারের কেতাবে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে থাকিবে, বিচিত্র কি? বামনের 'কাব্যালঙ্কারবৃত্তি'তেও গয়না-গাঁটির কথা। বামন বড় অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন। সাধারণতঃ কদাকার কুৎসিত লোকেরই অলঙ্কারের উপর ঝোঁক অধিক হয়।

পানাহার

এইবার মধুরেণ সমাপয়েৎ। ব্রাহ্মণগণ স্বকর্ম্মজ্ঞ, অর্থাৎ আহার-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ, এই খোসনাম তাঁহাদিগের বহু কাল হইতেই আছে। পুরাণাদিতে দেখা যায়, তাঁহারা আহারের আবদার ধরিয়া বহু রাজাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভোজনব্যাপার সম্বন্ধে কয়েকখানি সারবান্‌ পুস্তক লিখিয়া তাঁহারা থিওরি ও প্র্যাক্‌টিসের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন; অর্থাৎ হাতে-কলমে তাঁহাদিগের সিদ্ধবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকগুলির নাম—ভোজপ্রবন্ধ, ভোজচম্পূ, খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য। শেষোক্তখানি চুণী বাবুর 'খাদ্য' অপেক্ষাও উপাদেয়। ভোজ-চম্পূতে চপাটি, রুটি, পরোটা প্রভৃতি প্রস্তুতকরণের প্রণালী বর্ণিত।

চর্ব্বির অবাধ-বাণিজ্য না হওয়াতে তখনও লুচির তত রেওয়াজ ছিল না। 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে' খাঁড়গুড় দিয়া নানারূপ মিষ্টান্নমোদক প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া প্রকটিত। তখন জার্ম্মানী ও জাভা হইতে চিনি আমদানী না হওয়াতে—'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' ব্যবস্থানুসারে চিনির অনুকল্প খাঁড়গুড় দিয়াই মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। মিষ্টান্নের ময়লা রং বলিয়া কেহ নাক সিটকাইত না। ইংরেজের আমলে 'কালা বাঙ্গালী' গালাগালি হইয়া পড়াতে সকল কাল জিনিশই অবজ্ঞাস্পদ হইতেছে। মিষ্টান্ন ত মিষ্টান্ন, জুতা পর্য্যন্ত কাল চামড়ার না হইয়া বাদামী রঙ্গের হইতেছে। আশা করি, শীঘ্রই বাদামী রঙ্গের ছাতারও চলন হইবে।

'কলাপে' সুপক্ক কদলী সম্বন্ধে মুখরোচক আলোচনা; অনুমান, ইহা হনূমানের রচনা। 'কলাপক্ক' মুখে-মুখে বিকৃত হইয়া 'কলাপে' দাঁড়াইয়াছে। 'কারিকা'তে কারি (curry) রন্ধনের প্রথা এবং 'বার্ত্তিকে' বার্ত্তাকু অর্থাৎ বেগুন পোড়া, ভাজা, বেগ্নি প্রভৃতি ভাজিবার কথা। 'পাণিনি' পানীয় জল সম্বন্ধে চূণী বাবুর ন্যায় গবেষণা করিয়াছেন। 'পাতঞ্জলে' পাতকূয়ার জল সম্বন্ধে আলোচনা। কলের জলের উদ্ভবের পূর্ব্বে কলিকাতায় পাতকূয়াই সম্বল ছিল। আবার এখন দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, দীঘি-পুকুর মজিয়া যাওয়ায় পল্লীগ্রামে পাতকূয়াই সম্বল হইতেছে। সুতরাং ঘরে-দরে হাঁটুজল দাঁড়াইয়াছে। 'জলায়-বায়াবোহচীচঃ' সূত্রে কোথাকার জল কোথায় যায় ও কোথা হইতে আসে, ইত্যাদির বিচার আছে। 'কর্পূরমঞ্জরী'তে কর্পূর দ্বারা পানীয় জল সুবাসিত করিবার সঙ্কেত আছে। (তখনও জাতিধর্ম্মনাশা কেওড়ার জলের চল হয় নাই।) এই পুস্তকের একটি শ্লোক বড় মিষ্টি—

অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা
স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা।

'কাদম্বরী' সুরা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নিবন্ধ—'কাদম্বরীরসভরেণ মত্ত' হইয়া বাণভট্ট ও ভূষণবাণ বাপবেটায় এক বৈঠকে বসিয়া লিখিয়াছিলেন। এই দুষ্কর্ম্মের জন্য তাঁহারা কবুল জবাব দিয়াছেন—'মত্তো ন কিঞ্চিদপি চেতয়তে জনোঽয়ম্।'

উপসংহার

ভারতের এই ভূঁইফোঁড় ভাষা Jonah's gourd বা অকালকুষ্মাণ্ডের মত রাতারাতি খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এখন ইহার আর বাড়ের মুখ নাই। রোগীকে কৃত্রিম নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টার ন্যায়, অধুনা এই ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাদি কৃত্রিম উপায় দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। 'বিদ্যোদয়'-নামক মাসিকপত্রও এই ব্যাপারে কাঠবিড়ালীর কার্য্য করিতেছে। ইহা উক্ত পত্রের পরিচালকদিগের নিষ্ঠার পরিচায়ক বটে। কিন্তু শত্রুপক্ষ বলে, এই পত্রের প্রসার—ইহাতে প্রকাশিত বিদ্যা ও উদয় ইতি নামধারী নায়কনায়িকার প্রেমলীলাত্মক অফুরন্ত ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাসের কল্যাণে। এ কথা সত্য হইলে দেখিতেছি, সংস্কৃত মাসিকেরও বাঙ্গালা মাসিকের রোগে ধরিয়াছে। বাস্তবিক, আধুনিক পাঠকপাঠিকাগণ এমন গল্পখোর যে কাঁকড়া-অক্ষরে কেন, কিষ্কিন্ধ্যার ভাষায়ই হউক বা কামস্কটকার ভাষায়ই হউক, গল্প পাইলেই তাঁহারা তাহা গলাধঃকরণে ব্যগ্র। যাহা হউক, এ সকল লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া মনস্বী সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সনামা কবির স্পর্দ্ধাবাক্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিবেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

দর্পহারী মধুসূদন।

(শাশ্বতী, বৈশাখ ১৩২২)

পুরাকালে বলি-নামক এক প্রবলপরাক্রম রাজা ছিলেন। তিনি বাহুবলে বহুরাজ্য জয় করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়াছিল। অধীন সামন্তগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকিত, প্রজাগণ তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তিদর্শনে ভীতিবিহ্বল হইত, এমন কি, স্বয়ং রাজ্ঞী পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করিতেন না। ক্রমে রাজার মন এমন মোহাচ্ছন্ন হইল যে, তিনি নিজেকে অজেয় ও অমর বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী বৃন্দাবলী সাতিশয় ধর্ম্মশীলা, সচ্চরিত্রা, পতিব্রতা ও কোমল-হৃদয়া ছিলেন। তিনি রাজার ঘোর অহঙ্কার সন্দর্শন করিয়া সর্ব্বদা মনে মনে প্রার্থনা করিতেন, "হে নারায়ণ, হে মধুসূদন, আমার স্বামীকে সুমতি দাও।"

একদিন রাজা পাত্রমিত্রসভাসদ্‌গণকে আদেশ করিলেন, "কল্য সসৈন্যে রাজধানীর অদূরবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়াযাত্রা করিব। তোমরা সকলে আমার সঙ্গে যাইবে।" পরদিন প্রভাতে রাজা তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া সৈন্যসামন্ত ও পাত্রমিত্র-সভাসদ্‌বর্গ সমভিব্যাহারে মহাসমারোহে মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি কতিপয় সাহসী মৃগয়াপটু সঙ্গী লইয়া একটি বন্যবরাহের অনুসরণ করিতে করিতে বহুদূরে প্রয়াণ করিলেন। তিনি মৃগয়ার উৎসাহে অশ্বপৃষ্ঠে

কশাঘাত করিয়া এত বেগে বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন যে, কিয়ৎক্ষণ-মধ্যে সঙ্গিগণ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দ্রুতগামী বরাহ অরণ্যের নিবিড়তম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল, রাজা আর তাহার সন্ধান করিতে পারিলেন না।

বরাহের অনুসরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজা সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অতিমাত্র বেগে বহুপথ অতিক্রম করিয়া অশ্ব ক্লান্ত হইয়াছিল, রাজাও পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়াছিলেন; কিয়ৎক্ষণ চেষ্টার পর সঙ্গীদিগের দর্শনলাভে বিফলপ্রযত্ন হইয়া তিনি অগত্যা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন ও বৃক্ষচ্ছায়ায় শ্রমাপনোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অদূরে সুন্দর সরোবর দৃষ্টিগোচর হওয়াতে তিনি অশ্বরশ্মি বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিয়া ও রাজপরিচ্ছদ অশ্বপৃষ্ঠে রক্ষা করিয়া স্নানার্থ সরোবরতীরে উপস্থিত হইলেন। যদিও কিয়ৎক্ষণ ধীরসমীর-সেবনে তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ হইয়াছিল, তথাপি সরোবরের শীতল নির্ম্মল জল তাঁহার এতই তৃপ্তিকর বোধ হইল যে, তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া অবগাহন-স্নানের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না।

স্নানান্তে রাজা বৃক্ষতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে, অশ্ব ও রাজপরিচ্ছদ উভয়ই অন্তর্হিত হইয়াছে। এতদ্ব্যাপারে তাঁহার হৃদয় যুগপৎ বিস্ময় ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। সুযোগ বুঝিয়া কোন চতুর চোর বহুমূল্য অশ্ব ও রাজপরিচ্ছদ অপহরণ করিয়াছে, তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় চোরের সন্ধান করা তাঁহার অসাধ্য ছিল। তিনি তথায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। ক্রমে তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি যে নিবিড় অরণ্যানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার সন্নিকটে একটি নিষাদপল্লী অবস্থিত। তিনি সেই পল্লীর মণ্ডলকে অরণ্যরক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন ও তাহাকে বহুমান-

পুরঃসর নিষাদপতি আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। নিষাদপতি তাঁহার নিতান্ত অনুগত ও অনুরক্ত। রাজা এক্ষণে সেই নিষাদপতির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। নিষাদপতির ভবনে উপস্থিত হইলে আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হইবে না,এই চিন্তা করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি ধীরে ধীরে নিষাদপল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পদব্রজে গমনে অনভ্যস্ত রাজা অবসন্ন-দেহে সন্ধ্যাকালে নিষাদপতির ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন। নিষাদপতি সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় কুটীর-বাসী ছিলেন না। তাঁহার বাসভবন সুরম্য; অট্টালিকাদ্বারে সশস্ত্র দ্বারী ও অন্যান্য অনুচরবর্গ। রাজা তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগের প্রভুকে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। কিন্তু দ্বারী ও অনুচরবর্গ তাঁহার ধূলিমলিন দেহ, অর্দ্ধনগ্ন অবস্থা, দীন বেশ ও রুক্ষকেশ ইত্যাদি দর্শনে তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিল, পরন্তু তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত-বোধে ব্যঙ্গ্যবিদ্রূপে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। রাজা সমস্ত দিন অনাহারে ও পথিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, এক্ষণে তাহাদের দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহার ক্রোধোদয় হইল। যাঁহার মুখ হইতে আদেশবাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতেই শত শত অনুচর আজ্ঞা-পালনে ব্যস্ত, যাঁহার ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক হইতে না হইতেই সূপকারগণ নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় লইয়া প্রস্তুত, যাঁহার বিশ্রামসুখের জন্য ভৃত্যগণ দুগ্ধফেননিভ শয্যা রচনা করিতে, চামর ব্যজন করিতে ব্যগ্র, আজ তিনি ক্লান্তদেহে মলিনবেশে আহার ও বিশ্রামের জন্য নিষাদগৃহে আশ্রয়প্রার্থী এবং তথায় সমুচিত অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে অসহনীয় অবজ্ঞা ও উপহাস লাভ করিতেছেন। তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ক্রোধে আরক্তলোচন রাজা

ভৃত্যদিগকে ভৎ‍র্সনা করিলেন এবং তাঁহার আদেশ পালন না করিলে তাহাদিগের কঠোর শাস্তিবিধান করিবেন, এবংপ্রকার ভয়প্রদর্শন করিলেন। তাহারা তাঁহার বাগ্‌ভঙ্গীতে অধিকতর আমোদ বোধ করিল এবং তাঁহাকে উন্মত্ত জ্ঞান করিয়া তাঁহার গাত্রে মুষ্টি মুষ্টি ধূলি ও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাজাও উত্তরোত্তর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে উচ্চকণ্ঠে তাড়না করিতে লাগিলেন।

নিষাদপতি সন্ধ্যাকালে আমোদপ্রমোদে ব্যাপৃত ছিলেন। বহির্দ্বারের তুমুল কোলাহল-শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ব্যাপার কি অবগত হইবার জন্য একজন পার্শ্বচরকে বহির্দ্বারে প্রেরণ করিলেন। সে সংবাদ আনয়ন করিল যে, জনৈক উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেছে এবং দ্বারী তাহার আদেশপালনে অসম্মত বলিয়া তাহাকে তর্জ্জন করিতেছে। নিষাদপতি কৌতূহলপরবশ হইয়া সেই ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করাইবার জন্য পার্শ্বচরকে আদেশ করিলেন। তদনুসারে রাজা প্রমোদগৃহে উপনীত হইয়া, নিষাদপতি তাঁহার কতদূর অনুগ্রহভাজন এবং বিশ্বাসপাত্র, সে কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং তাঁহার গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গের নিকট কিরূপ দুর্ব্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও বর্ণনা করিলেন। কিন্তু নিষাদপতি রাজার দীন-হীন-বেশ-দর্শনে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না এবং ভৃত্যবর্গের ন্যায় তিনিও তাঁহাকে বায়ুরোগগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া দুই চারিটি দুর্বাক্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। রাজা নিষ্ফলরোষে ভবিষ্যতে তাঁহাকে এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সমুচিত শাস্তি দিবেন বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই তিনি প্রমোদগৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন। প্রভুর আচরণে উৎসাহিত হইয়া ভৃত্যগণ হতভাগ্য রাজাকে প্রহার করিতে করিতে নিষাদভবন হইতে

বহিষ্কৃত করিয়া দিল এবং যতক্ষণ তিনি তাহাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে না গেলেন, ততক্ষণ তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতে লাগিল।

অবমানিত রাজা নিষাদগৃহ হইতে মন্থরগমনে অগ্রসর হইয়া কিয়ৎকাল পরে এক প্রশস্ত রাজপথে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি। অতিরিক্ত শ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া তিনি পথিপার্শ্বে ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরে তিনি দূরে মহান্ কলকল শব্দ শুনিতে পাইলেন। অনতিবিলম্বে সেই রাজপথে বহু মনুষ্যের সমাগম হইল। এক দলের হস্তে উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা। সেই উজ্জ্বল আলোকে রাজা দেখিলেন, তাঁহারই একজন সামন্ত রাজা বহু অনুচর সমভিব্যাহারে শোভাযাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন। রাজা তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ অতিকষ্টে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ওহে সামন্তরাজ, আমি তোমার প্রভু বলি রাজা, অদৃষ্টবিড়ম্বনায় এই বেশে তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে রাজভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দাও।" রাজা এক সময়ে প্রবল বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ হইতে সামন্ত-রাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সামন্তরাজও নিষাদপতির ন্যায়, এই দীন ভিক্ষুককে স্বীয় প্রভু বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিলেন। তথাপি বিপন্নের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে আহার্য্য ও আশ্রয়-প্রাপ্তির সুবিধার জন্য একটি সুবর্ণমুদ্রা দান করিলেন। সেই সুবর্ণমুদ্রায় রাজার মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল, অথচ মুদ্রাপ্রদাতা সামন্তরাজ তাঁহাকে রাজা বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। ইহাতে রাজার ক্ষোভের সীমা থাকিল না।

অল্পক্ষণ পরে শোভাযাত্রা রাজার নয়নপথ অতিক্রম করিল। রাজা নিরাশ্রয়ে উন্মুক্ত আকাশতলে ধূলিশয্যায় শয়ান রহিলেন। তিনি দীর্ঘযামা

ত্রিযামায় এক নিমিষের নিমিত্তও সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তি-লাভ করিতে পারিলেন না।

ক্রমে রাত্রি অবসানপ্রায় হইল। উষার অস্পষ্ট আলোকে রাজা দেখিতে পাইলেন, একজন কৃষক দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ গোযান চালনা করিয়া রাজপথে অগ্রসর হইতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলেন, কৃষক কৃষিজাত ফলমূলবিক্রয়ার্থ রাজধানীর অভিমুখে গমন করিতেছে। রাত্রির অন্ধকারে এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্টে রাজা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৃষকের বাক্যে অবগত হইলেন যে, রাজধানী অনতিদূরে অবস্থিত। রাজা তখন কাতরবাক্যে কৃষককে অনুরোধ করিলেন,—"আমি অনাহারে ও পথিশ্রমে নিতান্ত দুর্ব্বল, তুমি আমাকে রাজপুরীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত শকটে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাও। একজন রাজ-কর্ম্মচারী আমার পরমাত্মীয়, তিনি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিবেন।" সকলেই অবিশ্বাস করিতেছে লক্ষ্য করিয়া তিনি কৃষকের নিকট নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলেন না। সরলপ্রকৃতি কৃষক প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করিয়া, বিপন্ন পথিকের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে শকটে দ্রব্যসম্ভারের উপর শয়ন করাইয়া এবং কৃষিজাত কিঞ্চিৎপরিমাণ ফলমূল প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিল। যথাসময়ে রাজপুরীর নিকটবর্ত্তী হইলে রাজা ধীরে ধীরে গোযান হইতে অবতরণানন্তর বার বার কৃষকের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন, এবং ভবিষ্যতে তাহাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া তাহার নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিলেন।

রাজা বিবেচনা করিয়াছিলেন, তিনি অন্যত্র বিড়ম্বিত হইলেও রাজ-প্রাসাদে প্রবেশমাত্রই দৌবারিকগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিবে ও সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিবে। তিনি ইহাও কল্পনা করিয়াছিলেন যে, এক অহোরাত্র তিনি উপস্থিত না থাকাতে রাজপুরী বিষাদকালিমায় পরিব্যাপ্ত

হইয়াছে, তাঁহার আগমনে প্রভাতসূর্য্যোদয়ে ধরার অন্ধকার-নাশের ন্যায় পরিজনবর্গের হৃদয় হইতে বিষাদরাশি দূর হইবে। কিন্তু সিংহ-দ্বারে প্রবেশ করিতে গিয়া তিনি সভয়ে দেখিলেন, দৌবারিকগণ আগন্তুকজ্ঞানে তাঁহার পরিচয় ও আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিল। রাজা নিষাদগৃহে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তৎস্মরণে দৌবারিক-দিগকে তিরস্কার না করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমাকে রাজ-সভায় লইয়া চল, বিশেষ প্রয়োজন আছে।" সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা উদ্ধতপ্রকৃতি ছিল না, সম্ভবতঃ এই দীনবেশী আগন্তুক তস্কর-কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব, এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা তাঁহাকে রাজসভায় লইয়া গেল।

রাজসভায় দণ্ডায়মান হইয়া রাজা সবিস্ময়ে দেখিলেন, রাজকার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে কোন বিশৃঙ্খলা হয় নাই। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সিংহাসনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, সিংহাসনে অবিকল তাঁহারই আকৃতিধারী পরিহিতরাজবেশ এক ব্যক্তি রাজদণ্ডহস্তে অধিষ্ঠিত, বামে তাঁহারই প্রিয়তমা মহিষী আসীনা। তদ্দর্শনে রাজা বিস্ময়াভিভূত হইলেন।

অল্পক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি গম্ভীরস্বরে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে সভাসদ্‌বর্গ, আমি তোমাদের রাজা—এখানে সমুপস্থিত। তোমরা আমাকে যথাবিহিত সম্মান-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ কেন?" তচ্ছ্রবণে সকলে সকৌতুকে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার রূপ ও বেশ-দর্শনে উক্ত বাক্যাবলী প্রলাপবচন বিবেচনা করিল।

সকলকে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, "এই সভায় বহু ধর্ম্মভীরু সত্যপ্রিয় ব্যক্তি বিরাজ করিতেছ। তোমরা কেহই কি আমাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর না? সিংহাসনস্থ ছদ্মবেশী

আগন্তুকই কি তোমাদের রাজা ?” সকলে একবাক্যে বলিল, “ইনি আগন্তুকও নহেন, ছদ্মবেশীও নহেন, ইনিই পূর্ব্বাপর আমাদিগের রাজা।”

তখন বিপন্ন রাজা কাতরনয়নে রাজ্ঞীর প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, “তুমি সতী সাধ্বী পতিব্রতা ধর্ম্মরতা, তুমিও কি এই ছদ্মবেশী আগন্তুককে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ ?” রাজ্ঞী তদ্‌বাক্যশ্রবণানন্তর সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে ‘ছদ্মবেশী আগন্তুকে’র চরণে প্রণত হইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, “প্রভু, আমি চিরদিন আপনার চরণাশ্রিতা দাসী। আপনিই আমার গতিমুক্তি।”

রাজা একেবারে নির্ব্বাক্। তিনি পুঞ্জীকৃত অবমাননা সহ্য করিয়াও দীন ভিক্ষুকের মত তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, কিন্তু রাজ্ঞীর এই বাক্যশ্রবণে তিনি দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায়, অভিমানে, অবনতমস্তকে সভাতল হইতে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কেহই তাঁহার গমনে বাধা দিল না। এক নিমিষের জন্য সিংহাসনাধিরূঢ় ‘ছদ্মবেশী আগন্তুকে’র অধর-প্রান্তে মৃদু হাস্য লক্ষিত হইল।

রাজসভা হইতে, রাজপুরী হইতে, রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, রাজা নিরাশহৃদয়ে নিজের অদৃষ্টবিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম ধরিয়া চলিলেন। এই দুর্দ্দিনে কোথায় আশ্রয় লইবেন, কি উপায়ে বিপদের প্রতিবিধান করিবেন, কি জন্য এই অচিন্তিতপূর্ব্ব বিধিবিড়ম্বনা ঘটিল, কোন সমস্যারই মীমাংসা করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পথ চলিয়া তাঁহার বাল্যের কথা স্মরণ হইল, বাল্যে পিতার সঙ্গে রাজধানীর অদূরসংস্থিত তপোবনে সাধুদর্শনে যাইতেন, স্মরণ হইল। সাধুর স্নেহময় ব্যবহারের কথা, জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণীর কথা, মনে পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ হইল যে, পিতার

পরলোকপ্রাপ্তির পর সিংহাসনারূঢ় হইয়া অবধি তিনি কখনও সাধুর সঙ্গলাভের জন্য উৎসুক হয়েন নাই, সাধুর সন্ধান পর্য্যন্ত লয়েন নাই। 'সাধু অদ্যাপি জীবিত আছেন কি, জীবিত থাকিলেও আমাকে চিনিতে পারিবেন কি, চিনিতে পারিলেও আর আমার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সস্নেহ ব্যবহার করিবেন কি,' ইত্যাদি বিতর্ক করিতে করিতে অনন্যগতি রাজা সেই সাধুসন্দর্শনে চলিলেন।

সাধুর উটজপ্রাঙ্গণে উপনীত হইয়া তিনি সাধুকে কুটীরাভ্যন্তরে উপবিষ্ট দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাতপূর্ব্বক কাতরস্বরে বলিলেন, "প্রভু, আমি বলি রাজা। আপনার শ্রীচরণদর্শনার্থ আসিয়াছি।" তচ্ছ্রবণে সাধু কঠোরবচনে উত্তর করিলেন, "কি বলিলে? তুমি বলি রাজা? মিথ্যা কথা। তোমার মত উন্মার্গগামী অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি আমার আশ্রম-প্রবেশের, আমার উপদেশগ্রহণের অধিকারী নহে। বিনয়ী অনুতপ্ত ধর্ম্ম-ভীরু ব্যক্তিকেই আমি গ্রহণ করি। তুমি এ শান্তিরসাস্পদ স্থান হইতে অবিলম্বে প্রস্থান কর।"

সাধুপুরুষের এই পরুষবাক্যশ্রবণে রাজা বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার শেষ অবলম্বনও নিষ্ফল হইল, জগতে তাঁহার আর আশ্রয়স্থান নাই। তখন সেই নৈরাশ্যের পীড়নে রাজার হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইল। তিনি প্রণিধান করিয়া বুঝিলেন, অত্যধিক অহঙ্কারবশতঃ তাঁহার এবংবিধ দুর্দ্দশা, তিনি সংসার সমাজ সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত, সাধুজনের অস্পৃশ্য। তখন তিনি কলঙ্কিত জীবনের জন্য নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া সাধুর চরণ ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "প্রভু, এতক্ষণে বুঝিয়াছি, আমি ঘোর পাপী। পাপাচারের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি। আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিব, অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে আমায় দীক্ষিত করুন।"

সাধুও রাজার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ত্বরিতচরণে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া করুণার্দ্রস্বরে বলিলেন,—"বৎস, আশ্বস্ত হও। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। দীক্ষার সময় আসে নাই। তোমাকে এই পট্টবস্ত্র দান করিতেছি, তুমি এই পরিচ্ছদে একবার রাজপুরীতে গমন কর। ভ্রষ্টরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।"

রাজার যদিও আর ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তথাপি তিনি সাধুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পট্টবস্ত্রপরিধানানন্তর রাজপুরীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি ক্ষণবিলম্বে সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে দৌবারিকগণ তাঁহার পথ রোধ করিল না, পরন্তু তাহারা অনুচ্চকণ্ঠে পরস্পরকে জ্ঞাপন করিল, "রাজার আদেশ,—তিনি ছদ্মবেশে নগর-পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, ছদ্মবেশে প্রত্যাগত হইলে বিনা অভিবাদনে তাঁহার পুরীপ্রবেশের পথ হইতে দূরে দণ্ডায়মান থাকিব। অতএব আমরা সেই আদেশানুযায়ী কার্য্য করি।" অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত হইলেও বাক্যগুলি রাজার কর্ণগোচর হইল, তিনি তচ্ছ্রবণে যুগপৎ বিস্মিত ও হৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি রাজপুরীর অসংখ্য দ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন প্রদোষকাল অতিবাহিত হইয়াছে। রাজা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী তল্পপৃষ্ঠে শয়ানা ও ঘোর নিদ্রাভিভূতা, ছদ্মবেশধারী আগন্তুক পুরুষ কক্ষতলে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতেছেন। তদ্দর্শনে রাজা পুনর্ব্বার দুর্ম্মনায়মান হইলেন ও মর্ম্মভেদী বিষাদে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেই গুরুনিশ্বাসপতনশব্দে রাজ্ঞী সুপ্তোত্থিতা হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন। তদ্দণ্ডেই রাজবেশধারী পুরুষের দেহে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল। রাজার সহিত তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট সৌসাদৃশ্য

অন্তর্হিত হইল এবং তৎস্থলে এক শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী জ্যোতির্ম্ময় দিব্য-পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। দিব্যপুরুষ স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"বলিরাজ, আমি স্বয়ং নারায়ণ। জগতের সকল রাজার আমারই অংশে জন্ম; প্রজাপালন আমারই ধর্ম্ম এবং এই অধিকার আমিই নরপালগণকে প্রদান করি। কিন্তু তুমি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিলে ও আসুরভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলে। তোমার চৈতন্যসম্পাদনের জন্য, তোমাকে সৎপথে পরিচালনের জন্য, তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়াছি, কেন না, আমিই লোকপালক নারায়ণ, আবার আমিই দর্পহারী মধুসূদন। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তোমার প্রকৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তোমার চিত্তাকাশ হইতে তমোমেঘ অপসারিত হইয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্মশীলা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা রাজ্ঞীকে লইয়া সুখে গার্হস্থ্যজীবন যাপন কর ও ধর্ম্মবিধিতে প্রজাপালন কর।"

রাজাকে এই কথাগুলি বলিয়া দিব্যপুরুষ রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৃন্দাবলী, তুমি আমার একান্ত ভক্তিমতী দাসী। তুমি নিয়ত আমাকে প্রার্থনা করিতে, 'দেব, আমার স্বামীকে সুমতি দাও।' তোমার প্রার্থনা-পূরণার্থই আমার এই ছলনা। আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মে তোমার অচলা মতি থাকুক।"

তদনন্তর রাজ্ঞী বৃন্দাবলী গললগ্নীকৃতবাসে যুক্তকরে বলিলেন,—

"প্রভু, দেব, নারায়ণ, যদি নিতান্তই দাসীর প্রতি সদয় হইয়াছেন, তবে একবার আমাদের উভয়ের মস্তকে প্রসাদচিহ্নস্বরূপ আপনার শ্রীচরণ স্থাপন করুন। আমরা কৃতার্থ হই।"

ভক্তবৎসল নারায়ণ তৎক্ষণাৎ বিরাট্ ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং দক্ষিণপদ স্বর্গে, বামপদ মর্ত্ত্যে ও তৃতীয় পদ বলি ও বৃন্দাবলীর মস্তকে

স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। বিরাট্‌মূর্ত্তির আবির্ভাবে উভয়েই সংজ্ঞাহীন হইয়া কুট্টিমোপরি লুন্ঠিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে জ্ঞানোদয় হইলে তাঁহারা দেখিলেন, নারায়ণ অদর্শন হইয়াছেন।

* * * * *

রাজা পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া যথানিয়মে সভাগৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তদবধি তিনি আর অহঙ্কারাদি রিপুর অধীন না হইয়া দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। উন্মাদগ্রস্ত রাজনামধারীর প্রলাপবাক্যের কথা সভাসদ্‌বর্গ অচিরেই বিস্মৃত হইল।*

---

* পদ্যে লিখিত একটি ইংরেজী আখ্যান-অবলম্বনে রচিত। শেষ অংশটুকু ভারতচন্দ্রের 'কেঁদে কহে বৃন্দাবলী' ইত্যাদি কবিতার অনুকরণ।

দাদা মশায় *

[শ্রীআমোদর শর্ম্মার খসড়া হইতে গৃহীত]

(ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৩)

"দাদামশায়, আপনার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, গঙ্গা-পানে পা করেছেন, মায়ার বাঁধন সবই একে-একে কেটে ফেলেছেন, আর এই পাপ নেশাটা ত্যাগ কর্‌তে পারেন না? এ ত সঙ্গেও আসে নি, সঙ্গেও যাবে না। জঞ্জালের রাশ যে ঝাঁট দিয়ে শেষ কর্‌তে পারি নে। গুলেতে, ছাইএতে, আধপোড়া কয়লাতে, দেশলাইএর কাঠীতে একাক্কার। দিন দু'বার ঝাঁট দেবার কথা, এ যে সাত বারেও জড় মরে না।"

বসন্তরাণী—ষোড়শী, সুন্দরী, ফিটফাট, শেমিজশাড়ীপরা, গোলগাল হাত দু'খানিতে গোছাভরা রেশমীচুড়ী, চুলবাঁধা, টিপপরা, সিঁদূরে উজ্জল সীঁথি, পায় আলতা, হাতে বাড়ন—এই বলিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

বুড়ো দাদামশায় কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—"নাত্‌নী, তোরা আজকাল সৌখীন হয়েছিস্—এখন আর তোরা দাঁতে-মিশি দেখনহাসি হ'তে চাস্‌নে, আম্‌লা-মেথীর গন্ধ স'স্‌নে, নাত্‌জামাইরাও এখন হুঁকো-কলকেকে অসভ্যতা মনে করে' নস্যির শিশি ধরেছে। তোরা এখন বদ নেশা বলে' নাক সিঁট্‌কাবি বই কি? তা, তোর যদি ননীর মত নরম হাতে বারে-বারে বাড়ন ধর্‌লে কড়া পড়ে' যায়, এত গোলে কায কি? আমার কাছে অন্তরখানা রেখে যাস্, আমিই ঝাঁটপাট দিয়ে রাখ্‌ব। নাত্‌জামাইএর নস্যি-সিক্‌নি-মাখা

* রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে সান্ধ্য-সম্মেলনে পঠিত।

রুমাল গুলো তিনবেলা সাবান করতে ত কই আলিস্যি করিস্‌নে? বুড়ো দাদা মশায়ই বুঝি বড় বোঝা?”

নাত্‌নী দাদামশায়কে ঢিলটি মারিয়া পাটকেলটি খাইয়া একটু নরম সুরে বলিল,—“তা, দাদামশায়, মন্দ কি বলছি? নেশার বশ হওয়া কি ভাল? আর আমাকে ত বড় খোঁটা দিলেন, দিদি-মা থাকলে কি তাঁর নথনাড়া খেয়ে এমনি মুখের ওপর জবাব দিতে পারতেন? সে যে শক্ত মাটি!”

এবার নরম সুরটা দাদামশায়ের পালা। আজ ত্রিশ বৎসর হইল, গৃহিণী একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া, স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তা পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যে মেয়েটিকে মানুষ করিয়া, একটি দরিদ্র যুবকের সহিত বিবাহ দিয়া মেয়ে-জামাই ঘরে রাখিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মোত্তর কয় বিঘার উপর নির্ভর করিয়া একরকম সুখে-দুঃখে কাল কাটাইতেছিলেন। বিধাতার তাহাও সহিল না। কন্যাটিও একটি শিশু-কন্যা রাখিয়া, আজ পনর বৎসর হইল, মা এর কোলে চলিয়া গিয়াছে। জামাতা বাপাজী চাপরাশ হারাইয়া শ্বশুরগৃহ ছাড়িয়াছেন, ও আবার দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমান্, সুতরাং শিশু-কন্যাটির কখন খোঁজ লন নাই। অকালবৃদ্ধ দাদামশায় নাত্‌নীটিকে মানুষ করিয়া, যথাসময়ে তাহারও একটি দরিদ্র-সন্তানের সঙ্গে বিবাহ দিয়া কাছে রাখিয়াছেন। নাত্‌জামাই কালেজে পড়ে। এখন পূজার ছুটিতে যুগল মিলিয়াছে।

এমন করিয়া দিদি-মার কথা তুলিলে বুড়ার মনটা কেমন হইয়া যাইবে, মুখরা যৌবন-গর্ব্বিতা নাত্‌নী তাহা ভাবে নাই।

দাদামশায় ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—“ছেলেবেলায় গুরুমশায়ের পাঠশালে গুড়ুক টানা অভ্যেস করেছিলাম। গুরুমশায়ের তামাক

সাজ্‌তে গেলে এ অভ্যেস আপনিই হয়ে পড়ে। গুরুমশায়ের দাগা বুলুতে-বুলুতে হাত পাকে নি, কিন্তু তাঁর তামাক সাজ্‌তে-সাজ্‌তে নেশাটা পেকেছে। এর জন্তে বাবার কাছে কত ধমক, কত মার খেয়েছি, তবু এ অভ্যেস ছাড়্‌তে পারি নি। এত লাঞ্ছনায়ও যা'র মায়া ত্যাগ করতে পারি নি, আজ পঞ্চাশ বচ্ছর যা'র মায়ায় বদ্ধ হয়ে রয়েছি, সবাই ছেড়ে গেলেও যে কখনও আমার ওপর বিমুখ হয় নি, সেই ছেলেবেলাকার বন্ধুকে আজ একফোঁটা একটা মেয়ের কথায় ত্যাগ কর্‌ব? আমার জীবনে তোদের দুটির টুক্‌টুকে মুখ, আর এই কলিহুঁকোর কাল কুচ্‌কুচে মুখ ছাড়া আর ভগবান্ কি রেখেছেন?"

একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলিয়া দাদামশায় একটু দম নিলেন। তা'র পর, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধরা-ধরা গলায় বলিতে লাগিলেন,—"আর তোর দিদিমার কথা বল্‌লি? তা' সে ত আর তোদের একালের মত সৌখীন মানুষ ছিল না; তখনকার কালের বৌঝীরা নিজেরাও দোক্তা-তামাক, মিশি-মাজনের মান রাখ্‌ত; আর পুরুষমানুষের গুড়ুক টানার মর্ম্মও বুঝ্‌ত। আহা! সে থাক্‌লে কি আর বুড়ো বয়সে হাত পুড়িয়ে, টিকে ধরিয়ে ফুঁ দিতে-দিতে হাঁফ ধর্‌ত। হায়! আমার কি তেমন বরাত, যে, তা'র সেই শাঁখাপরা হাতের সাজা তামাক আমার কপালে বেশী দিন সইবে?"

এবার দাদামশায়ের দীর্ঘনিশ্বাসটা একটু জোরে-জোরে পড়িল, গলাটাও একেবারে ধরিয়া গেল। তিনি মুখখানি ভার করিয়া তামাক সাজিতে বসিলেন।

বসন্তরাণীও এবার একটু বেশীরকম অপ্রস্তুত হইল। সে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল,—"দাদামশায়, ঘাট হয়েছে। কোন্ কথায় কোন্ কথা এসে পড়্‌বে, জান্‌লে আমি পোড়া ঝাঁটপাটের কথা তুল্‌তাম না। তা'

আপনি দুঃখু কর্‌বেন না, আমি সাত বারের জায়গায় না হয় দিনে দশবার ঝাঁট দেব এখন।”

তা’র পর একটু থামিয়া বুদ্ধিমতী নাত্‌নী বুড়াকে খুশী করিবার জন্য বলিল,—“তা, আমিই না হয় দিদিমার হয়ে একবারটি তামাক সেজে দিচ্ছি, আপনি একটু তাঁর গল্প করুন।”

বুড়াকে আর বেশী অনুরোধ করিতে হইল না। তিনি নিঃশব্দে নাত্‌নীর দিকে তামাক, টিকে, কল্‌কে, দিয়াশলাই সরাইয়া দিলেন, কিন্তু চট্ করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না—অনেকক্ষণ শিবনেত্র হইয়া থাকিলেন।

তা’র পর, তামাক সাজিয়া টিকে ধরাইয়া ফুঁ দিতে দিতে বসন্তরাণী একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—“দাদামশায়, তামাক তৈরি, খাবেন না? দিদিমার ধ্যানে বসেছেন না কি?” দাদামশায় আনমনে হুঁকাটি লইয়া কয়েকটা টান দিয়া একটু যেন প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন মুখ হইতে অনেকটা ধোঁয়া বাহির করিয়া এবং নাক হইতে একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন,—“তোর দিদিমার গল্প শুন্‌বি? তবে ভাল হয়ে বোস্। সে যে অনেক কথা।

“আমার যখন চোদ্দ বছর বয়েস, তখন একটি আট বছরের কনের সঙ্গে আমার বিয়ে হ’ল। কনে বউএর মা ছিল না, তাই বিয়ের পর বছর না ঘুরতেই আমাদের বাড়ীতেই তা’র স্থিতি হ’ল। আমি বিয়ের পরেই পাঠশাল ছেড়ে দিলাম। তখন লায়েক হয়েছি, আর কি পাত-তাড়ি বগলে করে’ পাঠশালে যাওয়া চলে? বাবাও কিছুদিন পরে মারা গেলেন, সুতরাং নিষ্কণ্টক হলাম! দিনের বেলায় বুড়োদের তামাক সেজে ধরিয়ে দেওয়ার ছলে কসে’ দু’টান দিয়ে দিতাম। রাত্রে চারপোয়া সুবিধা হত। নিজে কিছুই করতে হ’ত না। সেই বেচারা বালিকাকে

দিয়েই কাযটা সেরে নিতাম। তা'র মুখে কথা ছিল না, হুকুমমাত্র সব তৈরি। তা'র এই গুণে সেই বয়সেই তা'র উপর ভালবাসা হ'ল। যতদিন বেঁচে ছিল, সে একদিনের তরেও এ কাযে অবহেলা করে নি। তবে দিনের বেলায় অবিশ্যি তা'কে এ কাযে পাওয়া যেত না।

"তুই যে বল্‌ছিলি, তোর দিদিমার ধ্যানে আছি কি না, সে কথা বড় মিথ্যে নয়। এত তন্ময় হয়ে বুড়ো তামাক টানে কেন, মনে করে' তুই হাসিস্‌। কিন্তু আমি যেন হুঁকোয় মুখ দিলেই সেই একখানি মুখ—টিকেয় ফুঁ দিতে-দিতে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে—তাই চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই। আর তাই দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সংসারের সব ধান্ধা ভুলে' যাই, যে দুটো শোক বুকের ওপর পাষাণ হয়ে বসেছে, তাও যেন ভুলে যাই; তখন মনে হয়, কোন শোক-তাপ পাই নি, সংসারের কোন দুঃখ-জ্বালা জানি নি, সেই আধ-বালিকা, আধ-যুবতী, সুশীলা সতীর সেবা পেয়ে সুখের সাগরে ভেসে যাচ্ছি। তাই চক্ষুঃ বুজে আসে; তোরা ভাবিস্‌ বুড়োর বুঝি ঝিমুনি ধরেছে!"

এতখানি বক্তৃতার পর দাদামশায় আবার হুঁকোয় মুখ দিয়া ধীরে-ধীরে টানিতে লাগিলেন, ও ক্রমে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। বসন্তরাণী দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল, এমন সময়ে সান্ধ্য-ভ্রমণের পর প্রত্যাগত স্বামীর কাসীর সাড়া পাইয়া খাস্‌কামরার দিকে পা টিপিয়া-টিপিয়া অগ্রসর হইল—অসময়ে বুড়োর চট্‌কা না ভাঙ্গে।*

---

* 'বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষে'র আমলে নিরবলম্বে একটা গল্প লিখিবার শক্তি না থাকাতে 'বিষবৃক্ষে'র আশ্রয় লইয়াছিলাম। সে দুই বৎসরের কথা। এবার সাহস করিয়া একটা ছোট-গল্প লিখিয়া ফেলিয়াছি। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের তামাক সাজিতেন, তাঁহারাও ওস্তাদ গ্রন্থকার হইয়া উঠিয়াছেন; আর 'বঙ্কিম-চর্চ্চরী' বানাইয়া হাত পাকাইয়াছি, একটা ছোট-গল্প লিখিতে পারিব না?—লেখক।

গাছ্‌ছোলা।

(বিজয়া, ফাল্গুন ১৩২১)

কৈশোরে পল্লীজননীর ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইলেও, পাদশতাব্দী-কাল কলিকাতাবাসী হইয়াছি। প্রথম প্রথম দীর্ঘ অবকাশে পল্লীমাএর কোলে ফিরিয়া যাইতাম; ক্রমে, শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মাতৃস্তন্য-ত্যাগের ন্যায়, সে অভ্যাসও ছাড়িয়াছি। এখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, কলিকাতার ধূমধূলি, কলিকাতার গ্যাস-জল-ড্রেন, কলিকাতার বিকট কর্ম্ম-কোলাহল নির্ব্বিকারচিত্তে উপভোগ করিতেছি। যখন কলিকাতার 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুৎ' নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে, তখন হাঁফ ছাড়িবার জন্য, কখন বা সাহিত্যসেবার নাম করিয়া ভাগলপুর ময়মনসিংহ ঘুরিয়া আসি, আর কখন বা তীর্থযাত্রার ছুতা করিয়া কাশীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসি, কিন্তু পল্লীজননীর 'মলিন মুখচন্দ্রমা' আর কখন নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করি না।

সহরে নূতন নূতন আসিয়া ফেরিওয়ালাদের ডাকে কত কৌতুক, কত কৌতূহল অনুভব করিয়াছি, স্থলবিশেষে বিড়ম্বনাভোগও করিয়াছি! 'জুতাবুরুষ'কে 'খেজুররস'-ভ্রমে ডাকিয়াছি, 'রিপু-কর্ম্ম'কে 'কি কুকর্ম্ম?' মনে করিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়াছি, 'ধামা বাঁধাবে'-কে 'ধামা বাঁধাই না বাঁধাই তুই তাড়া দিবার কে?' বলিয়া ধমকাইয়াছি, অমৃত-ভ্রমে হরেক রকম বিষের লাড়ু গলাধঃকরণ করিয়া স্বহস্তে ভবিষ্যৎ ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার বনিয়াদ গাঁথিয়াছি—সে সব দিন গিয়াছে। এখন আর 'খেজুর চাই—কলসী-খেজুর' ইত্যাকার চীৎকার শুনিলে, উদরে জ্বালা ধরে না, কর্ণজ্বালা উপস্থিত হয়; 'কুসুম ফুলে রং, ডাড়িম ফুলে রং, মাথাঘষা

তেলের মশলা' ডাকিতে শুনিলে আর এখন 'এসোসিয়েশান অভ্ আইডিয়াস্'-এর প্রভাবে মনে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয় না; 'চুড়ি চাই বালা চাই' সুমধুর ডাক শুনিলে আর এখন 'সেই মুখখানি'—শ্রীবিষ্ণুঃ—সেই 'শ্যামলতা-মনোহর' হাতখানির কোমল পরশ স্মৃতিতে জাগিয়া উঠে না। এখন বহুবারশ্রুত এই সব বুলি নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে—

Like a twice-told tale
Vexing the dull ear of a drowsy man.

কিন্তু—একটী ডাক শুনিলে এখনও যেন কেমনধারা হইয়া যাই, গায়ে কাঁটা দেয়, নাড়ী দ্রুত চলে, মনটা উড়ু উড়ু করে, প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠে, চোখের পাতা ভিজা ভিজা হয়! সে ডাকটি আর কিছু নহে—গাছছোলা।

পাঠকগণ হাসিবেন না। কথাটা বুঝাইয়া বলিতেছি। আগেভাগেই লেখককে অশ্বজাতীয় বলিয়া সাব্যস্থ করিবেন না।

গাছছোলা—যে খুব একটা মুখপ্রিয় বা মহামূল্য খাদ্যদ্রব্য, তাহা নহে। কলিকাতার মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারে উপাদেয় রসনাতৃপ্তিকর ভক্ষ্য-ভোজ্যের অভাব নাই। তৎসমুদায়ের তুলনায় গাছছোলা যে নিতান্ত 'তৃণায় মন্যে', তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করি। গাছ হইতে ছিঁড়িয়া কাঁচাই খাই, আর পোড়াইয়া নুনতেল মাখিয়াই খাই, এই তুচ্ছ পদার্থের এমন কোন লোভনীয়তা নাই যে, চল্লিশোর্দ্ধেও ঔদরিক ব্রাহ্মণের 'লালা স্রবতি নিত্যশঃ', অমিতাহারে প্রবৃত্তি হইবে, 'সংযমশিক্ষা'র সকল উপদেশ ব্যর্থ হইবে।

তবে এ নাম শুনিয়া মন কেমন করে কেন?

বাস্তবিক, এই ডাকটি আমার বড় হৃদয়স্পর্শী। "Tis a note of enchantment!' কেন? বলিব?

'চাই গাছছোলা'—ঐ ডাকটি শুনিলে আমাতে আর আমি থাকি না। তাড়াতাড়ি কাকস্নান সারিয়া, নাকেমুখে ভাত গুঁজিয়া, জবরজঙ্গ পোষাক আঁটিয়া, চিনির বলদের মত ইংরেজী কেতাবের বোঝা বহিয়া, কার্য্যস্থানাভিমুখে ছুটিয়াছি,—আর পথে, হয়ত কার্য্যস্থানের দরজার ঠিক সামনে—হঠাৎ ঐ ডাকটি শুনিলাম। আর অমনি ভুলিয়া গেলাম, আমি কে, কোথায়, কি করিতে যাইতেছি? কলিকাতার 'দ্বিতল, ত্রিতল, চৌতল ভবন' কোথায় অদৃশ্য হইল, পাষাণরচিত রাজপথ পদতল হইতে সরিয়া গেল, কলের ঘড়ঘড়ানি, ঘোড়ার গাড়ীর ঝনঝনানি, রেলগাড়ীর বাঁশীর কর্ণজ্বালাকর সঙ্কেতধ্বনি, কোথায় শূন্যে মিশাইয়া গেল; ছাত্র, সমব্যবসায়ী শিক্ষক, বিদ্যালয়ের অধিকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাধিকারী, পরীক্ষা, প্রশ্নপত্র, ভ্রমসংশোধন, অন্বয়, ব্যাখ্যা, হাজিরাবহি—সব ভুলিয়া গেলাম; আমি যে পলিতকেশ প্রৌঢ়, 'কর্ণমূলমাগত্য পলিতচ্ছদ্মনা জরা' আমাকে যে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহাও ভুলিয়া গেলাম। মনে হইল, আবার যেন আমি দশমবর্ষীয় কিশোর (কিশোর-গৌরাঙ্গ নহে, কিশোর-কৃষ্ণাঙ্গ), পার্শ্বে সমবয়স্ক চঞ্চল বালকের দল, সম্মুখে 'পাখাডাকা ছায়ায় ঢাকা' পল্লীবাট।

তখন মনে পড়িল, সেই বিকালবেলা, 'সব সাথী মিলি', খাল পার হইয়া, আমবাগান বাঁয়ে ফেলিয়া, মাঠ ভাঙ্গিয়া, পগার ডিঙ্গাইয়া, বিলের মাঠে চাষের ভুঁই হইতে গাছছোলাসংগ্রহ, (দোহাই নীতিবিৎ, ইহাকে চুরি বলিয়া পীনাল কোডের ৩৭৯ ধারায় ফেলিবেন না, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার রেহাই আছে); সেই উন্মুক্ত আকাশ, সেই বিস্তৃত ময়দান, সেই আর্দ্র মৃত্তিকার মনোরম গন্ধ, সেই ফাল্গুনের হাওয়া, সেই বনফুলের সুবাস, সেই বনবিহগের স্বরলহরী, আর সেই গৃহগামী ধেনুকুলের হাম্বারব। তাহার পর, গ্রামে ফিরিয়া গাছছোলার 'হোড়াপোড়া' করার আনন্দ-

কোলাহল ; যে সব ছোট ছোট বালক ডাংপিটে হইয়া এই আয়াসসাধ্য সংগ্রহ-কার্য্যে যোগ দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ভাগ দেওয়া এবং অবশেষে সকলে মিলিয়া মহাস্ফূর্ত্তিতে, বাল্যসুলভ ক্ষুধার মুখে, অমৃতজ্ঞানে সেই গাছছোলা-ভক্ষণ! ঐ ডাকটি শুনিলে সে সব কথাই যে মনে পড়ে।

তাই বলিতেছিলাম, সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতিবর্ষ কলিকাতাবাসী হইয়াও, পল্লীজননীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়াও, ঐ একটি ডাকে পল্লীজননীর সেই ঘাটবাট তটমাঠ, সেই খালের ধার, সেই বিলের মাঠ, সেই বাঁশঝাড়, সেই পুকুরপাড়, সেই আমকাঁঠালের বাগান, সেই রাংচিত্রের বেড়া, সেই অশ্বত্থবটের ছায়া, সেই শ্যামা-দোয়েল-কোকিল-পাপিয়া-চোকগেল-ফটিকজল-বৌ কথা কও ইত্যাদি বিহগ-কলরব সব মনে পড়ে ; বাল্য-স্মৃতি জাগিয়া উঠে, বাল্যবন্ধু ক্রীড়াসঙ্গীদিগের মুখ চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠে ; সেই উচ্চহাস্য, সেই সরল প্রাণের নির্ম্মল ভালবাসা, সেই একদণ্ডে আড়ি একদণ্ডে ভাব, সেই এক মাএর পেটের ছেলের মত সব কয়টিতে একত্র ভোজন, একত্র ভ্রমণ, একত্র পাঠাভ্যাস, একত্র বিদ্যালয়ে যাতায়াত, একত্র ক্রীড়াকৌতুক, একত্র আমোদপ্রমোদ, সব স্মৃতিই যে হৃদয় মথিত আলোড়িত করে।

আজ তাহারা কোথায়? কেহ বা জনকজননীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া কৈশোর অতীত হইতে না হইতেই মহাপ্রয়াণ করিয়াছে, কেহ বা যৌবনে পত্নীপুত্রের মায়া কাটাইয়া জীবনের পরপারে গিয়াছে, কেহ বা প্রবীণ বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের বালিকাবধূকে অনাথা করিয়া কোন্ অজানা পথে অজানা দেশে প্রথম জীবনের সংসারসঙ্গিনীর সহিত মিলিত হইয়াছে। আর যাহারা 'তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে' জর্জ্জরিত

হইয়াও এখনও প্রাণে প্রাণে আছে, তাহারাই বা কোথায়? আমিই বা কোথায়? বাল্যের সে বিমল প্রণয়ই বা কোথায়?

"কোথা গেল সে প্রণয়, বাল্যকালে মধুময়,
যে সখ্যতা-পাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে?
সহপাঠী কেলিচর অভেদাত্মা হরিহর
এবে তাহাদের সঙ্গে কতবার দেখা রে?
পতঙ্গপালের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অবিরত
স্বকার্য্যসাধনে রত, কে বা ভাবে কাহারে?" *

---

* শেষ কয় পংক্তি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবন-মরীচিকা' হইতে উদ্ধৃত। প্রবন্ধ-পাঠকালে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'The Reverie of Poor Susan' এবং 'The Farmer of Tilsbury Vale' কবিতাদ্বয় অবশ্যই ইংরেজীজ্ঞ পাঠকের মনে পড়িবে।

কাশীবাস।

(বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিন, জুলাই ১৯১৬)

ছুটী! ছুটী! ছুটী! গ্রীষ্মের লম্বা ছুটী! চৈত্রে চড়কের ঢাকের কাঠি পড়িতে আরম্ভ, আর 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' নহে, আষাঢ়স্য অষ্টাদশ দিবসে শেষ,—পূরা আড়াই মাস, ৩২ দিনে পাকি ওজনের মাসের হিসাবেও একদিন বাড়্‌তি থাকিয়া যায়। ছুটী পাইলে ছাত্রদিগের মুক্তির আনন্দ, শিক্ষকদিগেরও মুক্তির আনন্দ,—একেবারে গোজন্ম খালাস না হইলেও, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, আর তিন সকাল কাকস্নান করিয়া, নাকে-মুখে চারিটি ভাত গুঁজিয়া, ধড়াচূড়া বাঁধিয়া, পাততাড়ি বগলে লইয়া, বিদেশী বিদ্যার জাবর কাটাইতে কাটাইতে ঘানি-ঘরের দিকে ছুটিতে হইবে না, ঘানিগাছের চারিধারে কলুর চোখবাঁধা বলদের মত ঘুরিতে হইবে না, কিছুকালের জন্য একটু দম লইতে পারা যাইবে, একটু ধীরে-সুস্থে স্নান পান শয়ন ভোজন আহার বিহার করিতে পারা যাইবে, বিদেশী বিদ্যার বোঝা ঘাড় হইতে নামাইয়া একটু জিরাইতে ও জুড়াইতে পাওয়া যাইবে, ইহা কম লাভের, কম আরামের কথা নহে; বিশেষতঃ, শিক্ষকের জীবনে ইহাই একমাত্র উপরি-পাওনা।

তবে, সেই মুক্তির আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে—হাতের কায পড়িয়া রহিবে, চল্‌তি খাতা বন্ধ হইবে, চেনা মুখ অদর্শন হইবে, পঠিত বিদ্যায় মরিচা ধরিবে, অভ্যস্ত নেশার মৌতাতের সময় বহিয়া যাইবে, সুতরাং সময়কালে গা মাটিমাটি করিবে,—এমন একটা আপশোষের, অসোয়াস্তির ভাবও যে শিক্ষকের (ও ছাত্রের ?) মনে একেবারে হয় না, এ কথাও বলা যায় না। নিয়মিত সময়ে নিয়মিত প্রণালীতে নিয়মিত কার্য্য সম্পন্ন করিবার একটা

নিয়মিত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে ; সেই অভ্যাস হঠাৎ বন্ধ হইলে হৃদয়ে কেমন একটা অভাব-বোধ হয়, দিনটা কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে, মনে হয় যেন Othello's occupation is gone ! জানি না, যেদিন সংসার-পাঠশালা হইতে ছুটী লইতে হইবে, সেদিনও পূরাপূরি মুক্তির আনন্দলাভ করিব, কি—হাতের কায পড়িয়া রহিল বলিয়া অন্তরে একটা অসম্পূর্ণতা, একটা শূন্যতা, একটা বেদনা অনুভব করিব।

যাহা হউক, অত তত্ত্বজ্ঞানের কথা, ভবিষ্যৎ ভাবনার কথা, তুলিবার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ কিছুকালের জন্য অব্যাহতি পাওয়া গেল, ইহাই পরম লাভ। গুরু শ্রমের পর বিশ্রাম-বিরাম, ইহাই প্রকৃতির আদেশ।

ছুটী হইলেই প্রাণ বলে—কোথাও ছুটি ! ইচ্ছা করে, কোথাও গিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত মনটা জুড়াই, রাজধানীর কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে গিয়া একটু আরাম খাই। শারদীয়া পূজার মাসাধিক-ব্যাপী অবকাশকাল ৺বিশ্বেশ্বরের চরণতলে আনন্দে কাটাইয়াছিলাম। (হায় ! তখন জানিতাম না, সেই আনন্দই জীবনের শেষ আনন্দ।) সার্দ্ধদ্বিমাস-ব্যাপী গ্রীষ্মাবকাশেও কি সেই পদছায়া মিলিবে ? পূর্ব্বজন্মের এত সুকৃতি আছে কি ? বহু বর্ষ হইতে মনে বড় সাধ, শুভ বৈশাখ-মাসে কাশীবাস করি, এবং অন্য সব ধর্ম্মকর্ম্ম যত করি না করি, 'শীতলবাহিনী কাশীতলবাহিনী' গঙ্গায় নিত্য-স্নান করিয়া শরীর-মন জুড়াই। কিন্তু সংসারের ঝঞ্ঝাটে ফাঁক পাওয়া কঠিন। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে এই অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু নানা ধাক্কায় পড়িয়া দেখিতে দেখিতে বৈশাখ মাস উদ্‌যোগপর্ব্বেই কাটিয়া গিয়াছিল, শেষে জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে কাশীযাত্রা ঘটিয়াছিল—কিন্তু তাহাও একা। সুতরাং মন স্থির করিয়া তথায় অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারি নাই, একপক্ষকাল কাশীবাস করিয়াই

ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলাম এবং আবার গৃহকোণে 'পুনর্মূষিক' হইয়াছিলাম। বাঁধা গরু দড়াদড়ি ছিঁড়িয়া ছাড়া পাইলে শীঘ্র গোহালে ফিরিতে চাহে না, এই চিরন্তন সত্য এক্ষেত্রে খাটে নাই।(১)

কিন্তু এবার স্বতন্ত্র কথা। নিদারুণ শোকে হৃদয় শূন্য, শরীর-মন অবসন্ন। 'উপযুক্ত পুত্র গেছে আঁধারি ভুবন।' গৃহের পরিজনবর্গের সকলেরই এক দশা। তাই 'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই ?'—পুনঃপুনঃ এই প্রশ্নের কষাঘাতে পুণ্যধাম কাশীধামে যাওয়ার কথা স্বতঃই মনে আসিল। সে যে আনন্দ-কানন, সেই পূতরজঃপ্রভাবেও কি 'মনোনিবৃত্তিঃ হৃদয়োপশান্তিঃ' মিলিবে না ? বিশ্বেশ্বরের কৃপায় কি হৃদয়ের ভার লঘু হইবে না, তাপদগ্ধ প্রাণে কি শান্তির শীতল ছায়া পড়িবে না ?

সপরিবারে যাত্রার সঙ্কল্প স্থির হইল। তথাপি গোছগাছ করিতে শুভ বৈশাখের এক সপ্তাহ নষ্ট না করিয়া আর বাহির হওয়া গেল না। হায় ! এখনও যে বন্ধন কাটিয়াও কাটিল না, সংসার-মোহ ঘুচিয়াও ঘুচিল না, মায়ার খেলা সাঙ্গ হইয়াও সাঙ্গ হইল না। এই দারুণ গ্রীষ্মে ঐ প্রদেশে অবস্থিতি করিবার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন এবং এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মনে মনে বলিলাম, হৃদয়ে যে অনির্ব্বাণ চিতাগ্নি জ্বলিতেছে তাহা অপেক্ষাও কি গ্রীষ্মের উত্তাপ অধিকতর অসহ্য হইবে ?

যাহা হউক, মতিস্থির রাখিয়া যথাসময়ে যাত্রা করিলাম। ট্রেনের গর্ভযন্ত্রণার বিবরণ দিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহি না। কাশীবাসীর নিত্যযাত্রার কথা, বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা, কেদারনাথ-বটুকনাথ, কামাখ্যা-বৈদ্যনাথ, নৃসিংহ-জগন্নাথ, ঢুণ্ঢিরাজ-কালভৈরব, বিশালাক্ষী-আশাকালী, সঙ্কটা-দুর্গাদেবী প্রভৃতি দেবদেবীদর্শনের প্রসঙ্গ তুলিয়াও

(১) সেই সময়েই প্রবন্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের খসড়া করিয়াছিলাম।

প্রবন্ধ অনর্থক ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। সে সব মামুলি কথা পাঠক অনেকবার শুনিয়াছেন, সেই একঘেয়ে বর্ণনা ধর্ম্মপিপাসু ভিন্ন অন্ত কাহারও ভাল লাগিবে না। এই সুদীর্ঘ অবকাশকাল কিরূপে ৺কাশী-ধামে কাটাইলাম, তাহারই বিবরণ দিয়া পাঠকের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শনের বিবরণ দিয়া পাঠকের ধৈর্য্যপরীক্ষা করিব না। দেবস্থান ছাড়া আর দুইটি স্থান আমার বড় প্রিয়;—যখনই আসি, অন্ততঃ একবার করিয়া সেই দুইটি স্থান না দেখিলে স্বস্তি হয় না। একটি—সুদৃশ্য কুইন্‌স্ কলেজ ও অপরটি—বিশালদেহ সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ। জানি, পাঠক এ কথা শুনিয়া, 'এ যে নাড়ীর টান,' 'চোরের মন বোঁচকার দিকে,' 'স্বভাব যায় না ম'লে,' ইত্যাদি প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া শিক্ষা-ব্যবসায়ী লেখককে টিটকারী দিবেন; তথাপি, সব কথা যখন বলিতে বসিয়াছি, তখন এ কথাটাও বলিয়া ফেলিলাম। বাস্তবিক, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম পশ্চাতে ফেলিয়া; বালিকা-বিদ্যালয়, জ্ঞানগেহ, শান্তিকুঞ্জ, সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ ও স্কুল এবং তৎসংক্রান্ত ছাত্রাবাস পুস্তকাগার বিজ্ঞানশালা প্রভৃতি সমস্ত মুলুক জুড়িয়া যে অট্টালিকা-শ্রেণী আছে, তাহা যখনই দেখি, তখনই মন ভক্তি-পুলকে পরিপূর্ণ হয়। যে জাতিকে আমরা 'অবলা' বলিয়া নির্দ্দেশ করি, সেই জাতির একজনমাত্র ব্যক্তির চেষ্টায় এই বিরাট্ ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে, এ কথা যখনই স্মরণ করি, তখনই হৃদয় বিস্ময়ে, আনন্দে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, কৃতজ্ঞতায়, আপনাআপনি অবনত হইয়া পড়ে। সত্য বটে, ভারত-মাতার বহু ধনী মানী জ্ঞানী সুসন্তানের সমবেত চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম, উৎসাহের ফলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদিগের উদ্দীপনার

মূলে একজন বিদেশীয়া নারী। যাক্, এ বিষয়ে লম্বা লেক্‌চার দিয়া পাঠকদিগকে আর বিরক্ত করিব না। এবারে এই দুইটি স্থান ছাড়া বাণীর আর একটি আয়তন দর্শন করিয়া চক্ষুঃ সার্থক করিয়া আসিয়াছি, সেটি নাগোয়ায় হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিভূমি। জানি না, কতদিনে এই বিরাট্ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়া আধুনিক ভারতবাসীর অদ্বিতীয় গৌরবস্থল হইবে।

যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পাদশতাব্দীর অধিককাল অতিবাহিত করিলাম, তাহার খাতিরে প্রাতর্ভ্রমণের অভ্যাস কখনও ঘটিতে পায় নাই। কেন না, চিরদিনই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ার মত প্রভাতে উঠিয়া পাঠাভ্যাস করিতে হইয়াছে। এখানে সে পাঠের তাড়া ছিল না বটে, কিন্তু সারাজীবনের অভ্যাস যাইবে কোথা? 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'—সুতরাং পুণ্যধামে আসিয়াও প্রাতঃস্নানাদি কার্য্যে পুণ্যসঞ্চয়ের চেষ্টা না করিয়া কোন দিন একটু লেখা, কোন দিন একটু পড়া, কোন দিন বা দুইই, এইরূপ করিয়া প্রাতঃকালটা কাটাইয়াছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের বেগার দেওয়ার অভ্যাস অনেকদিন হইতেই হইয়াছে। এখন অকুতোভয়ে ইংরেজীসাহিত্যচর্চ্চায় জলাঞ্জলি দিয়া এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম। বাঙ্গালা-রচনার খাতিরে যদি ইংরেজী পুস্তক দেখিবার প্রয়োজন হইত তবেই দেখিতাম, নতুবা নহে।

এই বাঁধা কাযটুকু সারিয়া, রৌদ্র প্রখর হইবার পূর্ব্বেই গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শনের কার্য্য সমাধা করিতাম। তাহার পর, চিঠি লেখা, বই পড়া, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথালাপে খানিকটা সময় কাটাইতাম। মধ্যাহ্নভোজনের পর নিদ্রা—যেদিন গ্রীষ্মাতিশয্য হইত, সেদিন আইঢাই করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়টা কাটাইতে হইত। তাহার পর বেলা পড়িলে শান্তির সন্ধানে বাহির হইয়া পুরাণপাঠ, কথকতা, রামরসায়ন,

হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া রাত্রি সাতটা আটটা পর্য্যন্ত কাটাইতাম। ইহাতেই শোকতাপদগ্ধ হৃদয়ে ক্ষণিকের জন্য যাহা কিছু শান্তিবারি সেচন করিত। কুচবিহারের কালীবাড়ীতে পুরাণপাঠ ও রাঙ্গামাটির সত্রে কথকতা উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ, কথক-মহাশয়ের বাগ্‌বিন্যাস-কৌশলে বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘ কাশীবাসের শেষ অবস্থায় তাঁহার কথকতার সংবাদ পাইয়াছিলাম। সুতরাং বেশীদিন এই তৃপ্তি-লাভের সুযোগ ঘটে নাই। কথক-ঠাকুরের একটি কথা প্রাণে বড় লাগিয়াছে। 'শিকারীরা বানর ধরিবার জন্য ভাঁড়ের ভিতর ছোলাভাজা রাখিয়া ভাঁড়টি বানরের সম্মুখে ধরিয়া দেয়। বানর ছোলাভাজা সংগ্রহ করিয়া মুঠা বাঁধে, আর কিছুতেই মুঠা ভাঁড় হইতে বাহির করিতে পারে না; মুঠা খুলিলেই যে হাত বাহির হয়, এ বুদ্ধি তাহার ঘটে আসে না। হয়ত বাক্‌শক্তি থাকিলে, বোকা জামাইএর মত, আমার হাত ভাঁড়ে গিলেছে বলিয়া একটা সোরগোল করিত। আমাদেরও ঠিক এই দশা। আমরা সংসারের ভোগসুখ এমন আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি যে কিছুতেই বন্ধনমুক্ত হইতে পারি না।' শুনিলাম, দৃষ্টান্তটি কথক-ঠাকুরের বানান নহে, শাস্ত্রে আছে। কিন্তু আমরা যে কার্লাইলের Baphometic fire-baptism লইয়া ব্যস্ত, শাস্ত্রপাঠ করিব কখন্?

এবার কাশীতে আসিয়া একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিলাম—দশাশ্বমেধঘাটে সঙ্কীর্ত্তন শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা। কোথাও পুরুষে কোথাও স্ত্রীলোকে কীর্ত্তন গায়িতেছে, কোথাও বাবাজীরা হরিনাম বা শ্যামাবিষয় গায়িতেছে, কোথাও বা দলবল লইয়া মূলগায়েন রামরসায়ন গায়িতেছে। এই নূতন ব্যবস্থা দেখিয়া বড় সন্তোষলাভ করিয়াছি। অবশ্য ইহারা পেশাদার, দু'পয়সা পাইবার প্রত্যাশায় এইরূপ

করে। কিন্তু ইহারা শ্রোতাদিগকে যে বিমল আনন্দটুকু দেয়, তাহার বিনিময়ে প্রত্যেকে একটা করিয়া পয়সা দিলে ধনবিজ্ঞানের অবমাননা হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেকে এই একটি পয়সাও দেয় না। বহু স্ত্রীপুরুষ এই ঘাটে বৈকালে সমবেত হয়েন—কেহ গঙ্গাদর্শন ও সায়ংসন্ধ্যা করিতে আসেন, কেহ কেবল সময় কাটাইতে আসেন। সুতরাং এই নূতন ব্যবস্থায় শেষোক্ত শ্রেণীর সমূহ উপকার হইয়াছে। তবে 'না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' এমন লোকও আছে। তাহারা দেখিলাম এই নূতন ব্যবস্থায় বড় বিরক্ত। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। একজন সংসারী (পেন্‌শন্‌ভোগী ?) বৃদ্ধকে বলিতেও শুনিলাম, 'ঘাট যেন হাট হইয়া দাঁড়াইয়াছে'! (মনে করিলাম, তিনি মাঠে গেলেই পারেন!)

রামরসায়ন, হরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্যামাবিষয়,—যে আসরে ইচ্ছা বসিতাম, তবে দুইজন বাবাজীর হরিনামগান ও শ্যামাসঙ্গীতই বেশীর ভাগ শুনিতাম। একদিন আবার বাবাজীদিগের পার্শ্বে এক মাতাজীর আবির্ভাব হইল। তিনিও অবশ্য সঙ্গীতে যোগ দিলেন। কিন্তু তাঁহার যেরূপ ভাবগতিক দেখিলাম, তাহাতে তিনি যে একদিন দর্শন দিয়াই অদর্শন হইলেন সেজন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। দিনকতক মুরশীদাবাদ অঞ্চলের কয়েকজন বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দেহতত্ত্বের গান গায়িয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল। ইহারা বৃন্দাবনের পথে কয়েকদিন কাশীবাস করিয়া গেল। বৈষ্ণবীদ্বয়ের গলা বড় মধুর অথচ তাহারা সরল-প্রকৃতি গ্রাম্যনারী, পূর্ব্বকথিতা 'মাতাজী'র মত তাহাদিগের কোন হাবভাব ছিল না। যাহা হউক, তাহাদিগের অন্তর্দ্ধানের পর আবার পূর্ব্বপরিচিত বাবাজীদের আসরেই স্থান লইলাম। বাবাজীদের গলা যে খুব মিষ্ট, সঙ্গীত-শিক্ষা যে খুব নির্দ্দোষ তাহা নহে, (অবশ্য লেখকের তুলনায় তাহারা এক একটি তানসেন) কিন্তু বিষয়-মাহাত্ম্যে তাহাদের

সে সঙ্গীত অত ভাল লাগিত। একটি গান অনেকবার শুনিয়াছি, কতদিন অনুরোধ করিয়া গাওয়াইয়াছি, গানটি শুনিয়া-শুনিয়া খেদ মিটে নাই। গান-শ্রবণে হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহি না। গানটি এই—

এ মায়া-প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চমাঝে,
রঙ্গের নট নটবর হরি যারে যা সাজান তাই সাজে ॥
রঙ্গক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সবে গাঁথা,
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভার্য্যা, কেহ ভ্রাতা,
কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা,
কত রঙ্গের অভিনেতা, এসেছে সেজে কত সাজে ॥
যার যখন হতেছে সাঙ্গ রঙ্গভূমির অভিনয়,
'কা কস্য পরিবেদনা', আর ত তখন সে কারও নয়,
ভাই রে কোথায় রয় প্রেয়সীপ্রণয়,
পুত্রকন্যার কাতর বিনয়,
তা'রা শুনে না কারও অনুনয়,
চলে যায় সাজ-সজ্জা ত্যেজে ॥
মাতৃসাজে সেজেছ মা করিতে স্নেহের অভিনয়,
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মসূত্রে আমি ত সেজেছি তনয়,
এ নাটকের অঙ্কে, পেয়েছি স্থান তোর অঙ্কে,
হয় ত যাব পর-অঙ্কে, পর-অঙ্কে পুত্র সেজে।
না হইল কর্ম্মশেষ কত যাব কত আসিব,
সং সেজে সংসারমাঝে কত হাসিব কাঁদিব,
অহিভূষণ বলে কবে যাব, এ জ্বালা কবে নাশিব,
মহাযোগে কবে বসিব, মিশিব হরির পদরজে ॥

শুনিলাম, এটি যাত্রার পালা-রচয়িতা ৺অহিভূষণ ভট্টাচার্য্যের 'সুরথ-উদ্ধার' পালার একটি গান। রচয়িতা বিএ-এমএ পাশ-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মাওয়ালা 'উচ্চশিক্ষিত' নহেন, কিন্তু এই গানে কি গভীর ভাব-সমাবেশ, কি সুন্দর শব্দচয়ন! আমরা শেক্‌স্‌পীয়ারের The Seven Ages of Man ও 'We are such stuff as dreams are made on' লইয়া একেবারে ভাবে গদ্‌গদ হইয়া পড়ি, কিন্তু এই অল্পশিক্ষিত(২) যাত্রাওয়ালার গানটির কাছে ওগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে কি? হায়! কবে আমরা ঘরের রত্নের আদর করিতে শিখিব? বহুশতাব্দী ধরিয়া চর্চ্চার ফলে কর্ম্মবাদ জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি যে সকল সংস্কার হিন্দুর মজ্জাগত হইয়াছে, হিন্দুর প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার ফলে আমাদের সমাজের একজন সামান্য লোকও যে তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিবে, তাহা শুনিলে ইউরোপ-খণ্ডের জ্ঞানী লোকও স্তম্ভিত হইবে। অথচ আমরা উপনিষদ্ বেদান্ত যোগবাশিষ্ঠ না পড়িয়া ক্যাণ্ট হেগেল ডয়সেনের পায়ে মাথা কুটাকুটি করিতেছি।

আবার অভ্যাস-দোষে লেক্‌চার আরম্ভ করিলাম। এই উচ্ছ্বাসের বেগ সংবরণ করিয়া উপসংহার করি।

যে শান্তির আশায়, তাপিত হৃদয় জুড়াইবার জন্য, শান্তিনিকেতন আনন্দ-কানন কাশীধামে আসিয়াছিলাম, তাহা মিলিয়াছে কি? চিতাগ্নির অনির্ব্বাণ জ্বালা নিভিয়াছে কি? না, রহিয়া রহিয়া অর্জ্জুনের সেই আকুল বাণী—

কিং করোমি জগন্নাথ শোকেন দহ্যতে মনঃ।
পুত্রস্য গুণকর্ম্মাণি রূপঞ্চ স্মরতো মম॥ (শান্তিগীতা ২।৩৪)

---

(২) শেক্‌স্‌পীয়ারও বোধ হয় খুব বড় বিদ্বান্ ছিলেন না, আর তিনিও থিয়েটার-ওয়ালা ছিলেন।

এবং সাধকের সেই গীত,

শ্মশান ভালবাসিস্ বলে' শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি বলে নিরবধি॥

হৃদয়ের বেদনা আরও তীব্র করিয়া তুলিতেছে ?

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য তে কস্য বা ভবান্॥

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

ইত্যাদি তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুকের মত আবৃত্তি করিয়া কোন ফলোদয় হইতেছে না।

'কাশী আনন্দকানন, আবার কাশী মহাশ্মশান।' এবার কাশীবাস করিয়া এই সত্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছি। এই পুণ্যক্ষেত্রের মণিকর্ণিকায় পূজ্যপাদ মাতুল ও মাতুলানীর নশ্বর দেহ ভস্মসাৎ হইয়াছে, যে জ্ঞাতি-ঠাকুরদাদা মহাশয়ের সস্নেহ আহ্বানে প্রথম তীর্থদর্শনের সৌভাগ্য ঘটে, তাঁহার নশ্বর দেহও ভস্মসাৎ হইয়াছে, আবার তাঁহার স্নেহপুত্তলী একাধিক পৌত্রেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। তাহার পর, পূজাবকাশে কাশীবাসকালে যাঁহার সহিত সরস রঙ্গব্যঙ্গে সুখে কাল কাটাইতাম, সেই ভগিনীপতি দীননাথ অন্যত্র গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি এই পুণ্যধামের সহিত জড়িত। গত পূজাবকাশে কাশীবাসকালে যাঁহার সরস কথাবার্তায় আনন্দলাভ করিয়াছি, সেই প্রিয়দর্শন সদালাপী মিষ্টভাষী ৺শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী সেদিন ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারও স্মৃতি এই পুণ্যধামের সহিত জড়িত। আর শাস্ত্রী

মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে যখন বলিয়াছিলেন, 'আমার যে পুত্রটি কাশী আসার সময় আমাকে যত্ন করিয়া ট্রেনে তুলিয়া দিত, সে নাই, তাই কাশী আসিতে আর ভাল লাগে না,'—তখন জানিতাম না বৎসর না ঘুরিতেই আমারও সেই দশা হইবে।(৩) সেই পূজাবকাশের প্রারম্ভে যে প্রিয়পুত্র আমাকেও ঐরূপ যত্নে, উৎসাহে, ট্রেনে উঠাইয়া দিয়াছে, আবার ফিরিবার দিন ট্রেন হইতে বাটী লইয়া গিয়াছে, যাহার উপর সংসারের ভার দিয়া আমি বিশ্রামলাভের জন্য প্রবাসযাত্রা করিয়াছিলাম, কাশীতে ছুটী কাটাইতে যাহার আনন্দ আমার আনন্দের অপেক্ষাও অধিক ছিল, সে আজ কোথায়? আর আমি কোন্ প্রাণে তাহাকে হারাইয়া আবার সেই কাশীবাসসুখের প্রার্থী হইয়াছি?

আর এ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অপরের গোচর করিয়া, শোকক্ষোভে প্রলাপ বকিয়া, জ্বালার উপশমের ব্যর্থ প্রয়াস করিব না। কর্ত্তব্যের আহ্বানে পুণ্যক্ষেত্র ছাড়িয়া আবার কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিতে হইল। শ্রীভগবানের বাণী—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' শোকদীর্ণ হৃদয়ের একমাত্র সম্বল।

দীর্ঘ ছুটী কাশীবাসে কাটিল। যেদিন এই জীবনের দীর্ঘতম ছুটীর দিন আসিবে, সে দিনও কি কাশীবাসের এইরূপ সৌভাগ্য ঘুটিবে? 'বারাণস্যাং জলে স্থলে' কি ঘটের নাশ ঘটিবে? যিনি এই ঘটের নির্ম্মাতা, তিনি ভিন্ন আর এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে?

সমাপ্ত

---

(৩) শাস্ত্রী মহাশয় চারি বৎসরকাল পুত্রবিয়োগ-শোক সহ্য করিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। আমার অদৃষ্টে কি আছে, ভাগ্যবিধাতা ভিন্ন আর কে জানে?